প্রকাশক :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৬/১ রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ—১লা মার্চ, ১৯৫৫

দাম : ষোল টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

উৎসর্গ

'ম্লা—ম্বা'

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদবরেষু।

পটুয়া নিবারণ

আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। লোকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ—কিন্তু তাঁর ছবি-টবি কেউ কিছু বুঝতো না। সেই অর্থে পট-টট কখনো আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরন ধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ—সব কিছুই ছিল সেই পুরোনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মত স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে—বাঘের পাকস্থলীর ওপর তার মাথা, বাঘের হৃৎপিণ্ডের ওপর তার পা, বিরাট ঢাউস পেটটা বাঘের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ফুলে আছে, আর মেয়েটির সেই পেটের প্রায় স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর দিয়ে কোষবদ্ধ প্রায়-পরিণত ভ্রূণটিকেও দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুই জনের মুখেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তার গোঁফ ঝুলে গেছে, অকালবার্দ্ধক্যে তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাশূন্য। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন মজা?'

'পাপের পরিণাম' সিরিজে যে কখানা ছবি এঁকেছিলেন নিবারণ কর্মকার, বাঘের ছবিটা ছিল তার দ্বিতীয় ছবি। সবগুলো ছবি আমি দেখিনি, কিন্তু যে কয়েকটা দেখেছি তার প্রতিটিই ছিল খানিকটা হিংস্র প্রকৃতির ছবি। যেমন মনে পড়ে একটি ছবিতে একটি অতিকায় বানর একটি কুমারী কন্যার সতীত্ব হরণ করছে—এমনি একটা বিষয়বস্তু এঁকেছিলেন পটুয়া নিবারণ। নীচে লেখা 'সূক্ষ্মদেহীর প্রত্যাবর্তন ও নির্বিকার কাম-অভ্যাস।'

আমাদের মিশিদারোগার মেয়ে শেফালীর একবার অসুখ হ'ল। শক্ত ব্যামো। হরি ডাক্তার এসে বলে গেল 'সর্বনাশ! এ মেয়ে বাঁচলে হয়!

অসুখ শরীরে যতটা, মনেও ততটা। মন ভাল রাখা চাই। ওকে কখনো কোনো অভাব দুঃখ কষ্টের কথা বলা বারণ, কোনো মৃত্যুর খবর দেওয়া বারণ। আর ও যা চায় ওকে তাই দিন।'

তাই হ'ল। শেফালীর ঘর থেকে ধুলো ময়লা, কালো ঝুল, পিকদানী, ইঁদুর আরশোলা দূর করে দেওয়া হ'ল, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল কালো বেড়ালটাকে। তারপর ডাক পড়ল পটুয়া নিবারণের। মন ভাল থাকে এমন ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিতে হবে ঘরের দেয়ালে।

পট এঁকেছিলেন নিবারণ। খুব পরিশ্রম করেই এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে ছিল নদীর তীরে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুণ্ড খেলাচ্ছলে কেড়ে নিয়ে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; কারো মুণ্ডই যথাস্থানে নেই, এর মুণ্ড ওর হাতে, ওর মুণ্ড এর হাতে রয়েছে; আর সেই কবন্ধ ছেলেমেয়েদের দেহগুলি নিরানন্দ ও কঙ্কালসার। ছবির নাম দেওয়া ছিল 'একের মুণ্ড অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার পরিণাম।' 'রাক্ষসীর প্রসব' নামে আর একটা ছবিতে ছিল এক বিকট দর্শন রাক্ষসী তার সদ্যজাত সন্তানকে বৃক্ষচ্যুত ফলের মতো স্বহস্তে ধারণ করছে, আশে পাশে ইতস্তত: কয়েকটা রাক্ষস-শিশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় রাক্ষসী ইতিপূর্বে তার পূর্বজাত সন্তানদের ভক্ষণ করেছে এবং আশু সন্তান-ভক্ষণের আনন্দে তার মুখ লোল, চোখ উজ্জ্বল।

এই সব ছবি দেখার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক হরি ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে নিশি দারোগার মেয়ে শেফালী একদিন টুক্‌ করে মরে গেল। যতদূর জানা যায় বিকট ছবি এঁকে দারোগার মেয়ের মনে ভীতি উৎপাদনের অপরাধে গোপনে নিবারণের ওপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল।

তাইতেই মনমরা হয়ে গেলেন পটুয়া নিবারণ। কেননা ছবি-আঁকা ছিল তাঁর প্রাণ। ছবিতেই কথা বলতে চাইতেন নিবারণ, সংসারের নানারকম মারকে ছবি দিয়েই ঠেকাতে চাইতেন। ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি তিনি। নিশি দারোগা তাঁর সেই ছবি-আঁকা প্রায় বন্ধ করে দেবার জোগাড় করলেন। কেননা কথা ছিল শেফালীর ঘরে গাছপালা, লতা, ফুল, পাখীর ছবি এঁকে দেবেন নিবারণ, যাতে ঘরে বসেও শেফালীর মনে হবে যে তার চারিদিকে গাছপালা লতা ফুল পাখী মেঘ ও বাতাস রয়েছে—প্রকৃতি-

টকৃতির ভিতরেই রয়েছে সে—এবং এইভাবে এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় কিছুকাল প্রকৃতি-ভক্ষণ করলে শেফালীর রোগের উপশম হতে পারত। অন্তত হরি ডাক্তারের এই রকমই ধারণা ছিল।

এদিকে নিবারণের বয়স হয়ে এসেছিল। ছবির দিকেও ভাঁটা পড়ছিল। কেননা জনশ্রুতি শোনা গেল পটুয়া নিবারণের যাবতীয় শিল্পকর্ম তাঁকেই আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ভয়ে তিনি ঘরে ঢুকতে পারেন না। স্বপ্নের ভিতরেও তিনি স্বচ্ছ পেটওয়ালা বাঘ, মুণ্ডহীন ছেলেমেয়ে ও দারোগার কঙ্কাল-ভক্ষণ দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল একদিন এরা সবাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং রুগ্ন অশক্ত ও বৃদ্ধ অবস্থার কোনো সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কয়েকদিন তিনি সুন্দর ও স্বাভাবিক কিছু আঁকবার চেষ্টা করে দেখলেন—ছবি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও যা তাঁর খুব বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই আঁকতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি শক্ত সমর্থ একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর ছবি-আঁকা ভুলবার জন্য তিনি অন্যদিকে মন দিলেন। কখনো দেখা যেতে লাগল নিবারণ উঠোনের মাটি কোপাচ্ছেন, নয়ত ছাঁচতলা থেকে কণ্টিকারির ঝোপ টেনে তুলে সাফ করছেন। যদিও বিয়ে করেননি, তবু মনে হচ্ছিল, সংসারে মন দিয়েছেন পটুয়া নিবারণ। এইবার হয়ত বিয়ে করবেন।

করলেনও।

মিস্ কে. নন্দীর নামডাক আজকাল আর শোনা যায় না। শোনবার কথাও নয়। তিনি যে সব খেলা দেখাতেন, আজকাল আর তা চলে না। কিন্তু আমাদের আমলে সেই সব খেলা দেখিয়েই দারুণ নাম হয়েছিল মিস্ কে. নন্দীর। 'প্রবর্তক সার্কাস' যখন নানা জায়গায় ঘুরছিল তখনই মুখে মুখে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন সর্বভুক মহিলা মিস্ কে. নন্দীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মিস্ কে. নন্দীর জন্য প্রবর্তক সার্কাসে একটা আলাদা তাঁবু ছিল—যার চারদিকে সারাদিন ভিড় লেগে থাকত। সার্কাসের খেলা আরম্ভ হ'লে এই তাঁবু থেকেই একটা চাকাওয়ালা খাঁচায় মিস্ কে. নন্দীকে নিয়ে আসা হ'ত রিংয়ের পাশে। হৈ হৈ পড়ে যেত চারদিকে। কিন্তু মিস্ কে.

নন্দীকে দেখা যেত না—খাঁচার চারপাশে কালো পর্দা ফেলা। ওর ভিতরে বাস্তবিক কে. নন্দী আছেন কিনা বা থাকলেও কি করছেন কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। এদিকে ক্রমে ট্রাপিজের খেলা, দড়ির ওপর নাচ, ভৌতিক চক্ষু এবং বাঘ সিংহের খেলা শেষ হয়ে আসত। তারপর একজন স্যুট টাই পরা লোক পর্দা সরিয়ে একটা গোপন দরজা দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যেত। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলত 'অলরাইট'। দু-তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিত। হাততালিতে কানপাতা দায় হ'ত তখন। আর তখন দেখা যেত মিস্ কে. নন্দীকে। প্রকাণ্ড নয়, বরং রোগাই বলা যায় কে. নন্দীকে। রং কালো। পরণে গোলাপী রঙের সাটিনের হাফ্ প্যান্ট, বুকে কাঁচুলি -সেও গোলাপী রঙের সাটিনের। মাথায় চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপষ্টিক, পায়ে গোলাপী মোজা, গোলাপী জুতো। কাঠের একখানা ঝকঝকে চেয়ারে নিশ্চল বসে থাকতেন মিস্ কে. নন্দী—আধবোঁজা চোখ, মুখে একটু হাসি। হঠাৎ মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন, নয়ত' সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে তাঁকে। একটা মুর্গীকে সেই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত খাঁচার ভিতরে—কোক্কর কোঁ করে সেটা ডাকতে থাকত। আর, সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা মিস্ কে নন্দীকে ডাকতে থাকত, উত্তেজিত করত, হাতের লম্বা সরু লাঠিটা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারত কে. নন্দীর পেটে, কোমরে। অবশেষে হঠাৎ কে. নন্দী রক্তবর্ণ একজোড়া চোখ খুলতেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেন। আর একবার হাততালি পড়ত। সম্ভবত ঐ শব্দেই ক্ষেপে যেতেন মিস্ কে. নন্দী। মুর্গীটার সঙ্গে তার প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়ে যেত—সেই প্রাণান্তকর পাখ ঝাপটানোর শব্দ, মুর্গীর অস্ফুট ডাক, আর কে. নন্দার দাঁত কড়মড় করবার শব্দে আমাদের গায়ের রোমকূপ শিউরে উঠত। মুর্গাটা ধরা পড়ত অবশেষে ততক্ষণে মিস্ কে. নন্দীর কৌশলে-বাঁধা চুল খুলে পিঠময় মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রথমেই দুহাতে টেনে মুর্গীর মুণ্ডুটাকে ছিঁড়তেন কে. নন্দী—মুর্গীটার গলা থেকে হঠাৎ হঠাৎ শ্বাস নির্গত হ'তে থাকা বলে তখনো তার অস্ফুট ডাক শোনা যেত। পট্ করে ছিঁড়ে যেত গলাটা-- মুণ্ডুটা ছুঁড়ে ফেলে কে নন্দী ধড়টাকে দু'হাতে ধরতেন—কাটা গলাটা মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাওয়ার ভঙ্গীতে রক্তপান করতেন মিস্ কে. নন্দী। তখন কষ বেয়ে, গোলাপী কাঁচুলি বেয়ে, তলপেট থেকে চুঁইয়ে গোলাপী জুতো

পর্যন্ত নেমে আসত রক্তের কয়েকটা ধারা। তারপর মুর্গীটাকে খেতে শুরু করতেন –দু'হাতে পালক ছাড়াচ্ছেন আর ভিতরের মাংসের জঙ্গলে কামড় বসাচ্ছেন – এ দৃশ্যের কোথাও শিল্প ছিল কিনা বলতে পারি না।

মুর্গী খাওয়া হয়ে গেলে রক্তমাখা দেহে মুর্গীর পালক, নাড়ীভুঁড়ি ইত্যাদি ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতেন মিস্ কে. নন্দী। তখনো তাঁর অভিনয় কেউ ধরতে পারত না। এই সময়ে একটা সাপের ঝাঁপি সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। স্যুট পরা ম্যানেজার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন 'লেডী গণপতি দেখু-উ-উ-ন্-ন্—'। তার অবাঙালি টানের কথাটা পিটুকেল শোনাত। দেখা যেত ঝাঁপির চারধারে কে. নন্দী লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন আর ম্যানেজার হাতের সরু সাদা লাঠিটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ছিটকে উঠত সাপ। পেখমের মতো ফণা মেলে দিয়ে কে. নন্দীর দিকে তাকাত। প্রথমটায় ভয় পাওয়ার ভাণ করতেন তিনি— কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেন সাপের দিকে। সাপ ততক্ষণে ঝাঁপি ছেড়ে খানিকটা নেমে এসেছে – ছোবল দিতেই হাত সরিয়ে নিতেন কে. নন্দী। সারা তাঁবুতে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেত তখন। দ্বিতীয় ছোবলের মুখেই সাপের গলাটা চেপে ধরতেন— আর সারা হাত জুড়ে লিক্ লিক্ করে উঠত সাপ, কিল্‌বিল্ করে জড়িয়ে ধরত তাঁর হাত। অনেকক্ষণ সময় নিতেন কে. নন্দী। খুব আস্তে আস্তে হাতটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসতেন—যেন সাপের ঠোঁটে চুমু খাবেন তিনি। এই সময়ে তাঁর শিল্পকর্ম বোঝা যেত—ভঙ্গীতে পেলবতা ফুটিয়ে তুলতেন, তাঁর চোখেমুখে বন্য হরিণের সরল কৌতূহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর রক্তাক্ত মুখাভ্যন্তর দেখে বাচ্চা ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করে উঠত, আমরা চোখ বুজে ফেলতাম। ঐটুকুই ছিল কৌশল। হয়ত' চোখ চেয়ে ঠিক মতো দেখলে দেখা যেতো বাস্তবিক সাপের মুণ্ডুটাকে খাচ্ছেন না তিনি। পরমুহূর্তেই চোখ চেয়ে দেখা যেত মুণ্ডহীন সাপের দেহ একখণ্ড দড়ির মতো ঝুলছে, আর সাপের মুড়োটা আরামে চিবোচ্ছেন মিস্ কে. নন্দী।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, কিন্তু কে জানে, হয়ত' ঐ জীবন মিস্ কে. নন্দীর আর ভাল লাগছিল না। তাঁর খেলার মধ্যে অনেকটাই অভিনয় ছিল সত্য, কিন্তু কেন যেন সন্দেহ হ'ত ম্যানেজারের লাঠির খোঁচাটাওর মধ্যেই ছিল খাঁটি। কেননা যখন চেয়ারে এলিয়ে না ঘুম না-সম্মোহনের ভিতর থাকতেন

কে. নন্দী তখন মনে হ'ত তিনি বড়ই ক্লান্ত। মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করতে না পারায় সেই ক্লান্তিকে দূর করতে যখন কে. নন্দীকে ম্যানেজার সেই সরু লাঠির ডগায় খোঁচা দিতেন, তখন মিস্ কে. নন্দীর জন্য আমি আমার যৌবনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

মিস্ কে. নন্দীর নামডাক এখন আর থাকবার কথা নয়। কেননা সময় পাল্টে যাচ্ছিল। মানুষ আর পুরোনো ধরনের খেলা পছন্দ করছিল না। ধীরে ধীরে প্রবর্তক সার্কাসের অবস্থাও খারাপ হয়ে এল।

অবশেষে একদিন সব গোলমাল করে দিলেন মিস্ কে. নন্দী। ম্যানেজারের ডাক, অনুনয়, লাঠির খোঁচা নিঃশব্দে হজম করে তিনি আধখোলা চোখে নিশ্চল বসে রইলেন। মুর্গীটা খাঁচার ভিতরে দাপিয়ে বেড়াল। উপায় না দেখে ম্যানেজার সাপের ঝাঁপিটাও ঢুকিয়ে দিলেন খাঁচার মধ্যে। ঢাকনাটাও খুলে দেওয়া হল। সাপটা ফণা মেলে লাফিয়ে উঠল, মুর্গীটা খাঁচার ছাদে পা আটকে রেখে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। আর ঠিক এই সময়ে তাঁবু ভর্তি লোককে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন কে. নন্দী। খেলা ভেঙে গেল।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যই। তারপর থেকে মিস্ কে. নন্দী আবার খেলা দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু ঐ একদিনেই তাঁর বাজার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লোকে ধরে ফেলেছিল মিস্ কে. নন্দীকে। আর ভিড় জমল না। কে. নন্দীর খেলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁবু ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সার্কাস থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে এল।

আমাদের পটুয়া নিবারণ এই সময়েই একজন মজবুত সঙ্গী খুঁজছিলেন—যে তাঁকে তাঁর শিল্পের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রবর্তক সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে একদিন দরবার করলেন নিবারণ, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কে. নন্দীকে ছাড়িয়ে আনলেন, তারপর একবারে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

এই সময়ে আমি একদিন নিবারণ কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। একখানা ছবির সামনে নিবারণ কর্মকার বসেছিলেন। আমাকে দেখে সম্ভবত বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখী চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বলার ছিল না। নিবারণ তাঁর ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে কিছু লক্ষ্য করছিলেন। মনে হ'ল তিনি তাঁর ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা মিলিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন 'আমার দুটো আঙুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কিছু না বুঝে প্রশ্ন করলাম 'কোন আঙুল!

উনি ওঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী আমায় দেখালেন 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

আমি বললাম 'না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। কিন্তু আঙুল দুটো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে।'

আমি আঙুল দুটো দেখলাম। স্বাভাবিক বলেই মনে হ'ল। রোগটা ওঁর মানসিক সন্দেহ করে আমি বললাম 'শুনেছিলাম আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আঁকছেন না!'

'ছেড়ে দিইনি। তবে দেব।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ 'আঙুল দুটোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনি নিজেই বললেন 'এখন থেকে খেত-খামারের কাজ করব ভাবছি।'

আমি ওঁর সামনের সদ্য-আঁকা ছবিটা দেখছিলাম। পালঙ্কের ওপর মিথুনবদ্ধ নগ্ন নর-নারীর ছবি এঁকেছেন তিনি; আর দেখা যাচ্ছে একটা সাপ পালঙ্কের শিয়রে ফণা তুলে পুরুষটিকে দংশন করতে উদ্যত; মেয়েটি সাপটাকে দেখছে—অথচ কিছুই করছে না; তার চোখ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিংবা এও হতে পারে যে মিথুন তখন এমন পর্যায়ে যে বাধা দিলে তার মাধুর্য নষ্ট হয়—তাই মেয়েটি যা অমোঘ, যা নিয়তি তাকে মেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ খুক্ খুক্ করে হাসলেন নিবারণ। আমি উঠে পড়লাম।

চলে আসবার সময় কে. নন্দীকে দেখা গেল—ঘোমটা মাথায় সারা বাড়ী ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। মনে হ'ল সম্মোহন কেটে গেছে—সেই আধোঘুম ও অর্ধস্বপ্ন থেকে ম্যানেজারের লাঠির খোঁচায় জেগে উঠেই অমানুষিক খাদ্যবস্তুর সম্মুখীন হ'তে হ'চ্ছে না বলে তিনি বোধ হয় সুখী। কিংবা কে জানে—আমার দেখার ভিতরে ভুলও থাকতে পারে।

গ্রামে জনশ্রুতি ছিল, নানা রকম গল্প প্রচলিত হচ্ছিল। কিন্তু সার্কাসের সর্বভুক মহিলার সঙ্গে পটুয়ার যৌথ জীবন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেননা, নিবারণ আমাদের আর ডাকতেন না, গেলে বিরক্ত হতেন। কে. নন্দীও পাঁচজনের সামনে কদাচিৎ বের হতেন। ক্রমশ

বাইরের জগৎ থেকে দু'জনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এক রকম ভাবে তাঁরা আর পাঁচজনের মনোযোগ থেকে আত্মরক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘদিন পর আমাকে আর একবার ডেকে পাঠালেন নিবারণ। গিয়ে দেখি আঁকবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন 'আমার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?'

থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম 'ঠিক কি বলছেন বুঝতে পারছি না। তবে মিস্ কে. নন্দীকে আমরা অনেকেই দেখেছি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে উনি ডাকিনী কিংবা পিশাচ-সিদ্ধ?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কি?'

খুব চিন্তিত দেখাল নিবারণকে। কুঞ্চিত কপালে ছোট চোখে উনি ওঁর চারদিকে স্তূপাকৃতি পটগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সেই চেয়ে-দেখার ভিতর খানিকটা ভয়ের ভাব ছিল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে উনি বললেন 'কুসুম সার্কাসে যা করত তাকে লোকে কি বলে! সেটা কি শিল্প, না খেলা?'

'কে কুসুম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কুসুম মানে—' হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন নিবারণ—'আমার স্ত্রী।'

'কে. নন্দী?'

'হ্যা।' মাথা নাড়লেন নিবারণ 'আমার সন্দেহ ছিল কাঁচা মুর্গী ও সাপের মাথা খাওয়ার ভিতর কোনো শিল্প নেই; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন আমার মনে হয় ধারণাটা ভুল।'

আমি কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বললেন 'সার্কাসে আপনারা কুসুমকে দেখেছেন, আমি দেখিনি। আমি ওর কথা শুনেছিলাম, ওকে বলা হত পিশাচ-মহিলা।' আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন নিবারণ 'কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ। আর কোনো কথা বললেন না। দেখলাম উনি স্থির দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন 'আমি কুসুমকে বুঝবার চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন 'হয়ত একটা জীবন সময় অনেক কিছুর জন্তই যথেষ্ট নয়।'

নিবারণ কর্মকার সামান্য পটুয়া—তাঁর চিন্তায় কিছু উদ্ভট ব্যাপার ছিল—এইটুকুই আমরা জানতাম। সব মিলিয়ে মানুষটা আমাদের কাছে ছিল মজার। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ হ'ল—নিবারণের গলার স্বরে, চোখের চাউনীতে অন্যরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ উঠে গেলেন নিবারণ, দরজার বাইরে মুখ বার করে কি দেখে নিলেন, ফিরে এসে নিজের ডান হাতের দিকে পূর্ববৎ চেয়ে থেকে নীচু গলায় বললেন 'কিছুদিন আগে এক দুপুরবেলা দেখি কুসুম ছাঁচবেড়ার ওপর এসে বসা একটা মোরগের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আপনার কি মনে হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম—জানি না।

নিবারণ বললেন 'আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষ যা খায়—তা খেয়ে কুসুমের তৃপ্তি হয় না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম—না। আমার গা শিউরে উঠছিল।

নিবারণ বললেন 'একদিন আমি ওর খেলা দেখতে চাইলাম। ও প্রথমে রাজী হ'ল না। বলল—সার্কাসে যা দেখাত তার সবটাই ছিল কৌশল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল। অবশেষে একদিন আমার সাধ্য সাধনায় রাজী হ'ল। গভীর রাত্রে আমার সামনে একটা মুর্গী কাঁচা খেল ও। সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর।' বললেন নিবারণ কর্মকার—তাঁর মুখচোখে ভয় ফুটে উঠছিল—যেন চোখের সামনে গভীর রাত্রে একা এক পিশাচ-মহিলার সামনে বসে থাকার সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এখনো তাড়া করছে। একটু দম নিয়ে বললেন 'কল্পনা করুন ঘরের বৌ যাকে খুব চিনি জানি বলে মনে হয়—হঠাৎ গভীর রাতে তার চেহারা ও স্বভাব বদলে যেতে দেখলে কি মনে হয়!'

আমার কিছুই বলার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বলল 'কিন্তু ভেবে দেখলে এ ব্যাপারে বোধহয় ভয়ঙ্কর কিছু নেই।' বলেই খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন নিবারণ, তারপর প্রায় আপন মনে বললেন 'ছবি আঁকার সঙ্গে এর তফাৎ কী? আমি ভেবে দেখছি—অভ্যাস না কৌশল না অসুখ—কোনটা?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন নিবারণ, আবার নিজের ডানহাতের সন্দেহজনক দুটো আঙুলের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ বললেন 'আপনার কি মনে হয় না যে এ ব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই?'

'কি রকম?' আমি প্রশ্ন করি।

হাসলেন নিবারণ কর্মকার 'যেমন ছবির ব্যাপারে আমার কিছুই করবার ছিল না। নিশি দারোগার মেয়ের ঘটনাটা ভেবে দেখুন।'

'দেখব।' বললাম। কেমন সন্দেহ হ'ল নিবারণের মাথায় কোনো অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হঠাৎ এক সময়ে বললেন 'আমার আঙুলগুলো ত' নষ্টই হয়ে যাচ্ছে'—একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন 'কুসুমকে বলে দেখব, যদি ও আমার ছবি-আঁকার আঙুল দুটো খেয়ে ফেলতে পারে।' বলেই পুরোনো ধরনের খিক্ খিক্ হাসি হাসলেন নিবারণ। হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন 'আপনারা কুসুমকে ভয় করেন, না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। পাগল আর কাকে বলে! যখন চলে আসি তখনো নিবারণ বিড়বিড় করে যা বলছিলেন তার অর্থ—ওঁর ছবি-আঁকার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম মিস্ কে. নন্দী দেবীচৌধুরানীর মতো প্রফুল্লে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কোথাও কোনো গোলমাল থেকে গেল।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা কে. নন্দী কিংবা নিবারণ কারুরই এই গাঁয়ে থাকা পছন্দ করছিল না। তারা বলে বেড়াচ্ছিল কে. নন্দী এবার তাঁর শেষ খেলা দেখাবেন। তিনি বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না মহিলা—সাপ মুর্গীর পর এবার তিনি আরো বড় কিছুর জন্য হাঁ করেছেন। নিবারণের বিপদ ঘনিয়ে এল বলে। মনে হচ্ছিল কে. নন্দীর সেই শেষ খেলাটা দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে।

ছবি-আঁকা ছেড়েই দিলেন নিবারণ। ঘর থেকে বড় একটা বেরোতেন না। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে একদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গাজনের বাজনা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন তিনি। ডেকে উঠলেন—হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করলেন এবং এই সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত রক্তাক্ত শরীরে অবশেষে বুড়ো শিবতলার বটগাছের নীচে লুটিয়ে পড়লেন। কে. নন্দীর সেবা-যত্নে তাঁর শরীর ক্রমশ সুস্থ হ'ল, কিন্তু রোখ কমল না। পথে পথে ঘুরে বেড়ান আর বুড়ো বাচ্চা সকলকেই ডেকে তাঁর ডানহাতটা দেখান 'ত্যাখো তো, আমার আঙুলগুলো, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?'

এই সময়ে একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কষ্টে চিনতে পারলেন আমায়। বললেন 'শুনেছেন কিছু? নিশি দারোগা বলে পাঠিয়েছে যে কুসুমকে ত্যাগ করতে হবে। আশ্চর্য!'

আমি কিছু বললাম না। নিবারণের পিঠে হাত রাখলাম। নিবারণ নিজেই বলে চললেন 'কুসুম চলে গেলে আমার আঁকার কি হবে!'

'আপনি আবার আঁকছেন?'

'না।' মাথা নাড়লেন নিবারণ, 'আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন 'কিন্তু কুসুমকে আপনারা ভয় পান কেন? আমি তো দেখছি কুসুম সার্কাসে যা করত তাও একটা খেলা। ছবি আঁকা যেমন খেলা, ঠিক তেমনি। কিন্তু মুস্কিল—আমরা কেউই অভ্যাস ছাড়তে পারছি না।' বলেই হঠাৎ হা হা করে হাসলেন নিবারণ 'কয়েকদিন আগে আমি একটা পায়রা মারলাম। তারপর ঘাড় মটকে সেটার গলার নলীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন 'মুখ দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না। কিন্তু দেখবেন, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।'

কয়েকদিন পর নিবারণকে বাস্তবিক দেখা গেল বনডুবির মাঠে—একপাল ছেলেপুলে ঘিরে ধরেছে তাঁকে, আর মাঝখানে নিবারণ একটা আধমরা কবুতরের পালক দু'হাতে পট্‌পট্ করে ছিঁড়ছেন, কাঁচা মাংসের জঙ্গলে ব্যগ্র কামড় বসাচ্ছেন। তাঁর মুখের বিস্বাদ, বমনোদ্রেক সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

এরপর প্রায় সব কিছুই ভক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন নিবারণ। মাঝে মাঝে জ্যান্ত পাঁঠা-ছাগল কামড়ে ধরেন, কুকুরকে তাড়া করে ফেরেন। দু'বার গাঁয়ের লোক তাঁকে বাঁশ পেটা করে আধমরা করল। লোকে নিবারণের নামের আগে 'পাগলা' কথাটা জুড়ে দিল।

আমার মনে হয় নিবারণ ঠিক পাগল হয়ে যাননি। কে. নন্দী সার্কাসে যখন মুর্গী এবং সাপ ভক্ষণ করতেন—তখন কেউ তাঁকে পাগল বলেনি, বরং অনেকদূর থেকে পয়সা খরচ করে দেখতে গেছে। নিবারণ সম্পর্কে আমার এই মনে হয় যে তিনি তাঁর শিল্পের অভ্যাস পরিবর্তিত করতে চাইছিলেন মাত্র। মনে হয়েছিল ছবি ছেড়ে বাস্তবিক তাঁর শিল্পগুলি এইবার তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। তাই শিল্পান্তরে যেতে চাইছিলেন মাত্র।

এর কিছুদিন পর একদল বেদে এল আমাদের গাঁয়ে। নানারকম খেলা দেখাল, ওষুধপত্র শিকড়বাকড় বিক্রী করল। তারপর একদিন ছাউনী গুটিয়ে চলে গেল।

দু'একদিন পর নিবারণ আমার কাছে এসে বললেন 'আমার স্ত্রী কুসুমকে আপনি চিনতেন?'

আমি মাথা নাড়ালাম—হ্যাঁ।

হঠাৎ খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলেন নিবারণ, বললেন 'কুসুমের সার্কাসের খেলাগুলো কিন্তু তেমন সাজ্ঘাতিক কিছু ছিল না। ওর চেয়ে সাজ্ঘাতিক খেলা আমিই আপনাকে দেখাতে পারি।'

আমি নিবারণকে দেখছিলাম—আগেকার মতোই আছেন নিবারণ। লক্ষ্য করলাম তিনি আর তাঁর ডানহাতের দিকে চাইছেন না এবং তাঁর বগলে মোড়কের মধ্যে কয়েকটা ছবি রয়েছে বলে মনে হ'ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কি ব্যাপার?'

খিক্ খিক্ করে হাসলেন নিবারণ 'কুসুমের সেই খেলাটার কথা বলছিলাম। সেই খেলাগুলো আমিই কুসুমকে দেখাতে শুরু করলাম। কুসুম কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। খেলা দেখাতো কুসুম, কিন্তু ঐ খেলা নিজে কখনো দেখেনি সে।' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আমার মতোই অবস্থা হ'ল কুসুমের। তার শিল্পও তাকে আক্রমণ শুরু করল।'

আমি চেয়ে ছিলাম। খানিকটা আন্দাজ করে বিস্মিত না হ'য়ে আমি প্রশ্ন করলাম 'কে. নন্দী কোথায়?'

'ঠিক জানি না। একদল বেদে এসেছিল লক্ষ্য করেছেন?' আমি বুঝলাম। চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম 'আপনার আঙুল?'

নিবারণ উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে ছবিগুলোর মোড়ক খুলে আমার সামনে পেতে দিলেন। প্রথম ছবিটাতেই ছিল দুটো ভয়ঙ্কর কালসাপ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি আর ছবিগুলো দেখলাম না। দেখবার দরকারও ছিল না।

বুঝলাম, পটুয়া নিবারণকে এবার ঠেকান মুশকিল হবে। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর অস্তিত্বের অপরাংশ তাঁর শিল্পকর্মের বিদ্রোহী যাবতীয় ভয়ংকরতা ও হিংস্রতাকে ভক্ষণ করতে সক্ষম।

সাদা ঘুড়ি

ঐ যে কালো ঘুড়িটা লাট খেয়ে বেড়ে আসছে, তার মানে হচ্ছে ওটা লড়বে। কালো রঙের মাঝেখানে একটা লালচে ছোপ- তাতে ঘুড়িটাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। আমার ছাদে রেলিঙ নেই। বাড়িটা এখনো শেষ হয়নি— এটার নানা জায়গায় বহু কাজ বাকী রয়ে গেছে। অফিস থেকে ধার তুলে একটু একটু করে করছি। যতই করছি ততই কেবল মনে হয়, একটা বাড়ি আসলে কখনোই শেষ হয় না—যতই করা যায় ততই বাকী থেকে যায়। অনন্তকাল লেগে যায়। ঐ রেলিঙহীন ছাদে আমার একগুঁয়ে ছোটো ছেলেটা—হাবু—তার সাদা ঘুড়ি বহু দূরে বাড়িয়ে লাটাই ঘোরাচ্ছে। লড়বে। হাবুর ঘুড়ির দিকে ছোঁ মেরে মেরে সরে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর কালো ফাইটার ঘুড়িটা। রেলিঙহীন ছাদে দাঁড়িয়ে হাবু পিছু হাঁটছে।

বেশীক্ষণ দেখার সময় নেই। ছাদে রেলিঙ নেই—ভগবান হাবুকে দেখবেন বোধহয়। আমি গরীব মানুষ, ছাদে রেলিঙ দিতে পারিনি এখনো। ভগবান গরীবকে দেখবেন। এখন আমার সময় নেই, সারা রাত শীতে কষ্ট পেয়েছে আমার দুটো গরু। মশা রক্ত খেয়েছে কত! বাছুরটার পায়ে বাত, পেছনের ঠ্যাঙ দুটো একটার সঙ্গে আর একটা লেগে থাকে। আমার দুটো গরুই হারামী। সাদাটার বিয়োনোর বালাই নেই, সারাবছর খড় খোলের শ্রাদ্ধ করছে। এবছর ভাবছি আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ অভয়গ্রামে পাঠিয়ে দেবো। আমার কালোটা প্রায় বছর-বিয়ানী। তার বাঁকা শিঙ, বাঁকা মেজাজ। মাসখানেক আগে আমাকে মাটিতে ফেলে হিঁচড়ে দশ গজ রাস্তা নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে আমাকে টিটেনাসের ইঞ্জেকশন নিতে হয়। কোমরে সেই থেকে একটা ব্যথা বোধহয় পাকাপাকি বাসা নিয়েছে। বুড়ো বয়সের চোট তো! আমার কালোটা প্রায়ই খোঁটা উপড়ে পালাতে চায়। কোথায় পালাতে চায় কে জানে!

সাঁই করে কালো ঘুড়িটা নেমে এল ঐ। হাবু সিঁড়িঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। খুব জোর সুতো গোটাচ্ছে, ওর ঘুড়িটা সূর্যের আলোর মধ্যে,

তাই ঠিক দেখতে পেলাম না। কালোটা অনেক বেড়ে এসেছে, হাবুর ঘুড়ি পালাচ্ছে। ছাদে রেলিঙ নেই। ভগবান হাবুকে দেখবেন।

বীণাপাণি ক্লাবের পশ্চিম কোণে একটা ভাঙা টিউবওয়েল। এই কলটার সঙ্গে আমি রোজ সাদাটাকে বেঁধে রাখি। একটু মাঠ মতন আছে, কিন্তু রাতে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয় বলে ঘাস মরে মাটি বেরিয়ে গেছে। ছচারখানা ঘাসের মরা ডগা দাঁতের আগায় সারাদিন খোঁটে গরুটা। কালোটাকে বাঁধি দত্তদের জমিতে। জমিটা ছাড়া পড়ে আছে বহুকাল। বাড়ির ভিত গাঁথা হয়েছিল বহুদিন আগে। চারটে ঘর, একটা বারান্দা, পিছন দিকে একটা কুয়া—এই হচ্ছে বাড়িটার ছক। ভিত সেইভাবেই গাঁথা আছে, তার ওপর বাড়িটা আর হ'য়ে ওঠেনি। কুয়োটা মজে এল—রাজ্যের কুটোকাটা শ্যাওলা আর ব্যাঙের আস্তানা। বাড়ির ভিতর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। বছরে একবার দত্তবাবু এসে দূরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত চোখে দৃশ্যটা দেখে চলে যান দূর এক স্টিমারঘাটায় তাঁর কেরানীগিরিতে। আমার কালো গরুটা এইখানে চরে। এখানে গাছগাছালির ছায়ায় কিছু ঘাস জন্মায়। গরুটা সারাদিন খায় আর খায় আর খায়। গরুদের কখনো পেট ভরে না।

এবার শীতটা পড়েছে খুব। আলুক্ষেতের মাটি উস্কে দিয়ে বেগুন চারাগুলোর কাছে এসে বসি। বেগুনের বাড় নেই এ বছর। পোকা লেগেছে। ফুলকপির ফুলগুলোও কেন জানি ছড়িয়ে গেছে, দুধের মতো সাদা হয়ে জমাট বাঁধেনি। কলার ঝাড়ে কেঁচো লেগেছে। বাগান থেকে আকাশ স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু গাছপাতার ফাঁকে একঝলক একটা সাদা ঘুড়ি দেখতে পাই। যাক বাবা এখনো কাটেনি হাবুরটা। কালো ঘুড়িটা কি এখনো চোঁ মারছে? কে জানে!

কতকাল ধরে পৃথিবীর রস শুষছে গাছপালা। শুষতে শুষতে মাটি ছিবড়ে হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যেমন স্বাদ পেতাম তরিতরকারিতে, এখন আর তেমন স্বাদ পাই না। আমার নাকের দোষ কিনা কে জানে, আজকাল শাক-পাতায় কেমিক্যাল সারের গন্ধ পাই। পায় আমার গিন্নিও। কেবল ছেলে-পুলেরা কিছু টের পায় না।

সামনে ছায়া পড়তেই চোখ তুলে দেখি, দু'জন মানুষ বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে।

—কাকে চাইছেন ?

—শ্যামাপদ ঘোষালের বাড়ি কি এটা ?

—আজ্ঞে, আমিই।

তারা বিনীতভাবে নমস্কার করে। তাদের মধ্যে লম্বা জন বলে—আমরা কলকাতা থেকে আসছি, এ বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে শুনলাম।

—আছে। দেখবেন ?

—দেখি একটু।

চাবি আনতে যেতে যেতে একবার মুখ তুলি। হাবু একবারে রেলিঙহীন ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে। যদি বে-খেয়ালে এক পা পিছু হটে! হাবু-উ, সরে যা, সরে যা, মরে যাবি…পড়ে যাবি! কিন্তু আমি কিছুই বলি না। বললেও হাবু কখনো শোনে না। থাক, যা করবার করুক। ভগবান ওকে দেখবেন।

—ঘরটা তো ছোটোই দেখছি। দক্ষিণটা একেবারে বন্ধ। ভিতরের বারান্দা তো কমন, না ?

—হ্যাঁ, বাথরুমও তাই।

—ইস। রান্নাঘর উঠোনের ওপাশে। জল বলতে পাতকো—না ? উঠোনে তো রোদ আসে না, মনে হয়—জামাকাপড় শুকোবে কোথায় ? আর পায়খানা… ?

—দুটো। একটা আপনাদের ছেড়ে দেবো।

—ভাড়া বলেছেন পঞ্চাশ টাকা! কলকাতা থেকে দশ কিলোমিটার দূর, রেল স্টেশন থেকে সাত আট মিনিটের হাঁটাপথ—তবু পঞ্চাশ টাকা! ওর মধ্যে কি ইলেকট্রিক চার্জ ধরা আছে ?

—না ইলেকট্রিক আলাদা। মাসে দশ টাকা ফিকসড।

—দশ টাকা। মাত্র চারটে পয়েন্টের জন্য দশ টাকা।

—গরমকালে পাখা চলবে তো!

—আমাদের পাখাটাখা নেই।

—তা হলেও কোলকাতার চেয়ে এখানকার ইউনিটের দর দ্বিগুণ।

লোক দু'জন বিতৃষ্ণ চোখে ঘরটা দেখে। পছন্দ হয় না বোধ হয়। গত এক বছর ধরে এরকম বহু লোক এসে ফিরে গেছে। আমি নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে থাকি।

লম্বা লোকটা বলে—আমি এখন যে বাড়িতে আছি—সন্তোষপুরে—সেটার ভাড়া পঁয়তাল্লিশ, তুখানা ঘর সামনে পিছনে বারান্দা. দক্ষিণের হাওয়া আসে হুড়হুড় করে। তার ওপর সেটা কলকাতা—এরকম গ্রামগঞ্জ নয়--

—ছেড়ে দিচ্ছেন কেন ?

—আমার সামনের বারান্দায় বসে পাড়ার ছোকরারা বোম বাঁধে মশাই।

অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটি লম্বা লোকটির শালা। খুব বিনীত হাসি তার মুখে। সসঙ্কোচে বলে—এ ঘরটায় কে থাকে? চৌকীতে বিছানা দেখছি। আঠার শিশি, পোস্টারের কাগজ তুলি রাজনীতির বই—এসব কী ব্যাপার !

—আমার মেজো ছেলে পটল।

—পলিটিকস করে ?

—না, পলিটিকসের বোঝে কী ? এ সি ই পাশ করে বেকার বসে আছে। ঐসব করে সময় কাটায়। ওটা একটা শখ।

লম্বা লোকটাকে চিন্তিত দেখায় ! —এসব এলাকা কেমন ? ঝঞ্ঝাট-টঞ্ঝাট আছে কিছু ?

—আজ্ঞে না, খুব নিরিবিলি।

—কিন্তু খবরের কাগজে যেন দেখেছি এই এলাকাতেও—

—ও, সে ঐ অভয়নগর—বেলাবাগান রিফিউজী এলাকায়। এদিকটার কিছু নেই।

লোক তু'জনকে তবু চিন্তিত দেখায়।

আমি তাদের কিছুদূরে এগিয়ে দিই। বুঝতে পারি, তারা আর আসবে না।

গত এক বছর ঘরটা ভাড়া হচ্ছে না। আগের ভাড়াটেরা তিরিশ টাকা দিত, ইলেকট্রিক চার্জ দিত তিন টাকা। তারা ছাড়ার পর আমি ভাড়া বাড়িয়েছি। টাকাটা জমিয়ে বাড়িটাতেই লাগাবো। ভাড়া হচ্ছে না বটে, কিন্তু হবে। কলকাতার গণ্ডগোলটা যদি জোর লেগে যায়। লম্বা লোকটার সামনের বারান্দায় যদি ছোকরাদের বাঁধা বোমা একটাও একদিন ফাটে—

হাবু এখন ছাদের মাঝখানে আবার সুতো ছেড়েছে। কালো ঘুড়িটা কোথায় ? কেটে গেছে নাকি ! না সুতো গুটিয়ে একটু সরেছে পুবদিকে। কিন্তু লড়বে। এগোচ্ছে। হাবু ছাদের মাঝখানে দাঁতে ঠোঁট টিপে হাসছে।

বাছুরটা রোদে গা এলিয়ে শুয়ে। পায়ে বাত, ল্যাজের দিকটায় পাতলা গোবরে মাখামাখি। মাথার কাছে একটা কাক বসে মন দিয়ে ওর মুখ দেখছে।

কুয়োর পাড়ে হাত পা ধুচ্ছি, রান্নাঘর থেকে হাবুর মা চেঁচিয়ে বলে—ওরা কী বলে গেল ?

—নেবে না বোধ হয়। ভাড়া বেশী।

—না নিক। তুমি কমিও না। কলকাতা থেকে লোক চলে আসছে এখন। ধরদের বাড়ি কুষ্ঠরোগীর বাড়ি বলে ভাড়া হচ্ছিল না, গত শুক্রবারে সেটাও আশি টাকায় ভাড়া হয়েছে। তুমি চেপে বসে থাকো।

রোদে দেওয়া তোষক বালিশের ওপর তপুর বেড়ালটা ডন মারছে। বেড়ালটাকে তাড়িয়ে রোদে একটু বসি। একটা সিগারেট টানি। আকাশে সাদা কালো দুটো ঘুড়িই সমান সমান বেড়েছে। এইবার লাগবে, ছাদে হাবুর পা দাপানোর শব্দ হচ্ছে। ঘুড়ির লড়াইটা কি দেখে যাবো ? থাকগে। এখন আব সে বয়স নেই। সপ্তাহে এই একটাই তো মাত্র ছুটির দিন! সময় নষ্ট করা ঠিক না।

উঠোনটায় গতবারে বর্ষা থেকে জল জমছে। আগে জমত না। পশ্চিমে একটা মজা পুকুর ছিল, সেখানে নাবালে গড়িয়ে নেমে যেতো। গত বছর থেকে এক বড়লোক পুকুরটা কিনে উঁচু করে মাটি ফেলেছে। উঁচু ভিতের বাড়ি গাঁথছে, জলটা এখন উল্টোবাগে গড়িয়ে আসে। গরীবের উঠোন ভেসে যায়। কী করব ভেবে পাই না। চিন্তিতভাবে ঘরে আসি। পরশুদিন সন্ধেবেলা কারেন্ট ছিল না, অসাবধানে মোমবাতি জ্বেলে ছিল তপু। দেয়ালে কালো দাগ। সাবান জলে সেই দাগ তুলি। ক্যালেণ্ডারের পেরেক পুঁততে গিয়ে দেয়ালের চালটা উঠিয়েছে পটল। ভ্রূ কুঁচকে দৃশ্যটি একটু দেখি। দোতলা উঠবে, সেই আশায় সিঁড়িঘরটা পোক্ত করে করা হয়নি, বর্ষার জল সেইখান দিয়ে চুঁইয়ে এসে নষ্ট করছে ইলেট্রিকের তার। দাঁড়িয়ে সমস্যাটা একটু ভাবি। ছাদের ওপর জমানো আছে লোহার শিক—তাতে জং পড়ছে, বাইরে এক গাড়ি বালি ক্রমে মাটি হয়ে যাচ্ছে, পাথরকুঁচিগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে নষ্ট করছে পাড়ার ছেলেরা। সারা বাড়ি ঘুরে আমি এই সব দেখি। বাড়িটা শেষ হতে অনন্তকাল লেগে যাবে মনে হয়। কুয়োতলায় মাথায় সাবান দিতে বসেছে তপু—আমার কালো মেয়েটা। গত জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ পার হয়ে গেল। তপুর বিয়ে হলে আমার তিনটে মেয়েই পার হ'ত। কিন্তু কালো বলে তপুই কেমন আটকে গেছে। গতকাল জি টি রোডে তিনটে মড়া পড়েছিল। পটল চারদিন বাড়ি নেই। আমার বেতো বাছুরটা কি বাঁচবে ? ফুলকপিগুলো

জমাট বাঁধল না, বেগুনে পোকা। ঐ লম্বা লোকটা আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না। এক বছর একটা ফালতু ঘর পড়ে আছে। কোমরের ব্যথাটা আঁট হয়ে বসেছে। আমার দুটো গরুই হারামী। ভগবান কি সত্যিই হাবুকে দেখবেন? দেখবেন হয়তো। কিন্তু ঐ কালো ঘুড়িটা নিশ্চয়ই হাবুর সাদা ঘুড়িটাকে ভোকাট্টা করে দেবে।

যদি দোতলাটা তুলতে পারতাম তবে পুরো একতলা ভাড়া দিতাম। দেড় দুশো টাকা নিশ্চিন্ত আয়। দক্ষিণ দিকে দোতলায় আমার একটা নিজস্ব ছোট্ট বারান্দা করতাম। রেলিঙ ঘেঁষে বসাতাম মোরগফুলের টব। ঝোলাতাম অর্কিড। ছেলেবেলায় সাহেববাড়িতে ওরকম বারান্দা দেখে আমার বড় শখ রয়ে গেছে। চাকরির আর মাত্র আট মাস বাকি। তারপর অখণ্ড অবসর, দক্ষিণের বারান্দায় বসতাম ইজিচেয়ারে, হাতে খবরের কাগজ, মাঝে মাঝে এক পেয়ালা চা, পায়ের কাছে পড়ে-থাকা রোদ···এইসব খুব একটা বেশী কিছু নয়। যে কেউ এইসব চাইতে পারে।

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে খবর দেয়—মেসোমশাই, আপনাদের কেলে গরু খোঁটা উপড়েছে দেখুনগে···

সত্যিই তাই। হারামী গরুটা ছাড়া জমি পার হয়ে রেলরাস্তার ঢালু বেয়ে উঠছে। চীৎকার করে ডাকি। গলা শুনে একবার পিছনে ফিরে দেখে তারপর জোর কদমে ভারী শরীর টেনে উঠে পড়ে রেলরাস্তায়। পাথরে কাঠের খোঁটার খটখট শব্দটা হয়। আপ-ডাউন দুটো লাইন পাশাপাশি। আপ লাইনটা পার হওয়ার চেষ্টা করছে আমার কালো গরু। এইখানে রেল লাইনে একটা গভীর বাঁক। গাড়ি এলে দূর থেকে ড্রাইভার গরুটাকে দেখতেও পাবে না···

—হারামীর বাচ্চা। আমি ছুটতে থাকি। গরুটা টের পায়। লাইনটা আর পার হওয়ার চেষ্টা না করে লাইন ধরে ছোটে। আমার কোমর ভেঙে আসে। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ছুরির ফলা লক্ লক্ করে চমকে ওঠে। ঢাল বেয়ে উঠতে আমার দম বেরিয়ে যায়। পাথর, খোয়া, রেলের স্লীপারে হোঁচট খাই। গরুটা 'বা-হা' বলে ডাক দেয়, ছুটতে থাকে। রেল লাইনের গভীর বাঁক এখানে—আমার অবোধ দুধেল গাইটা বুঝতেও পারে না।

চনচনে রোদে, খালি পায়ে কোমরের সেই ব্যথা নিয়ে আমি প্রাণপণে খানিকটা তাড়া করি। তারপর দাঁড়াই, হঠাৎ মনে হলো ভগবান ওকে দেখবেন।

অবাধ্য গরুটাকে যেতে দিয়ে রেলরাস্তা থেকে নামবার আগে আমি সংসারের দৃশ্যটা ভাল করে দেখি। পিছনে বহুদূরে ঐ জি টি রোড যেখানে কাল তিনটে মৃতদেহ পড়ে ছিল। পটল চারদিন বাড়িতে নেই। ডানধারে রেল লাইনের গভীর বাঁকে ধরে হেঁটে যাচ্ছে আমার দুধেল গাই। কোথায় সে যাবে কে জানে! সামনে কলাঝোপের আড়ালে দেখা যাচ্ছে আমার পলেস্তারাহীন অসম্পূর্ণ বাড়িটা। ওটা কোনোদিনই শেষ হবে না। রেলিঙহীন ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তারপর দ্রুত সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে হাবু। ঐ অনেকটা সুতো নিয়ে তার সাদা কাটা ঘুড়ি টাল খেয়ে খেয়ে ভেসে যাচ্ছে। আনন্দে গোত্তা খেয়ে ওপরে উঠে ঘুরপাক খাচ্ছে কালো ঘুড়িটা।

কয়েক পলক স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে আমি সংসারের অসম্পূর্ণতাকে দেখে নিই, অনুভব করি ব্যর্থতাগুলি। সাদা কাটা ঘুড়িটা আমার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায়।

হঠাৎ তড়িৎস্পর্শের মতো আমার হাত ছোঁয় সুতোর হাল্কা স্পর্শ, মাঞ্জার কড়া ধার। আমি সংসারের দৃশ্য থেকে মুখ ফেরাতেই নীল আকাশে সাদা হাসিটির মতো দোল খাওয়া ঘুড়িটাকে দেখি। সুতোটা আমার হাত ছুঁয়ে আবার সরে যাচ্ছে। আমার পিছনে রাজ্যের ছেলের পায়ের শব্দ আর চীৎকার শুনি। তারা ঘুড়িটার দিকে ছুটে আসছে।

সুতোটা আমার মাথার একটু ওপরে দোল খায়। আমি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আনন্দে হাসি। লাফ দিয়ে উঠি। সুতোটা সরে যায়। অল্প দূরেই আবার স্থির হয়ে বাতাসে দোল খায়। আমি এগোই। সুতোটা সরে যায়। সুতোটা সরে যায়। আমি এগোই। আমি এগোতে থাকি। ক্রমে সংসারের কোলাহল দূরে যায়। নিস্তব্ধ হয়ে যায় পৃথিবী। ঘুড়িটা টলতে টলতে এগোয়। সুতোটা আমার হাতের নাগালে নাগালে থাকে। ধরা দেয় না।

ক্রমে আমরা আশ্চর্য এক অচেনা পৃথিবীতে চলে যেতে থাকি।

উড়োজাহাজ

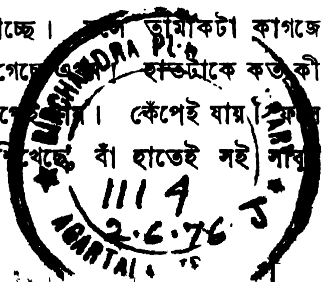
অনেক ওপর দিয়ে মন্থর এক এরোপ্লেন উড়ে যায়। পুরোনো আমলের উড়োজাহাজ, ঘুমপাড়ানী গানের মতো তার শব্দ, সেই শব্দে আকাশ পেরোনোর ক্লান্তি। অনেক সময় নিয়ে সে তার অনন্ত পথ অতিক্রম করতে থাকে। কুয়াশার আকাশে তার আবছায়া চিহ্নটি একবার দেখা গিয়েছিল। তারপর মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার শব্দটা আসতে থাকল। আসতেই থাকল।

উড়োজাহাজ দেখার মধ্যে আর মজা নেই। এখন কাকপক্ষীর মতো কত উড়ে যায় আকাশ দিয়ে, নির্গুণহরি চোখ তুলে দেখে না। কিন্তু এটা দেখার চেষ্টা করল সে। কারণ, শব্দ শুনে মনে হয়েছিল, এ হচ্ছে বুড়ো হুড়ো এক এরোপ্লেন। আকাশের গরুর গাড়ির মতো ধীরে চলা উড়োজাহাজ, তার যৌবন সময়ে যে শব্দ পেয়ে ছেলেবুড়ো ঘর ছেড়ে মাঠে ঘাটে দৌড়ে আকাশ-মুখো চোখ তুলে হাতের পাতায় রোদ আড়াল করে চেয়ে থাকত।

নির্গুণহরি আবছা প্লেনটাকে একবার দেখল। দেখা গেল না ঠিক। কাক তাড়ুয়ার মতো দু'দিকে ছড়ানো দুই সটান হাত, আর কেলেহাঁড়ির মতো মাথা, একটা লম্বা শুঁটকো শরীর—এই রকম একটা ভূতুড়ে ছায়া কুয়াশা থেকে কুয়াশায় ডুবে গেল। একটা চোখে ছানি কাটা আর একটায় আসছে। পৃথিবীতে দেখারও আর বেশী কিছু নেই। সংসারে শান্তি না থাকলে···

বাঁ হাতে সিগারেটের তামাক জল কাগজে পাক খাওয়াবে নির্গুণহরি, সেই সময়ে উড়োজাহাজটা গেল। চোখ নামিয়ে আবার সিগারেটটা পাকানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। বিড় বিড় ক'রে বলল—সংসারে শান্তি না থাকলে··· শুয়োরের বাচ্চা···

ডানহাতটা একবার সুমুখে তুলে ধরে দেখে সে। হাতটা কাঁপে। অনবরতই গত চার পাঁচ বছর ধরে কেঁপেই যাচ্ছে। [illegible] তামাকটা কাগজে পাক খাওয়ানোর ব্যাপারটা কত জটিল হয়ে গেছে এখন। হাতটাকে কত কী গালমন্দ দেয় সে, কিন্তু শালা নিজের মতো কেঁপেই যায়। কেঁপেই যায়। [illegible] এখন নির্গুণহরি বাঁ হাতেই দেশলাই জ্বালা শিখেছে, বাঁ হাতেই সই সাবু[illegible]



করে, টিপ ছাপ দেয়, বাঁ হাতেই হেঁসে ধরে গরুর ঘাস নিড়িয়ে আনে, কুয়োর বালতি টেনে তোলে। অভ্যেস। সংসার নানা অশান্তি, তার ওপর এই ডানহাতটা……

হাতটাকে ফের আর একবার শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দেয় নির্গুণহরি। তারপর সিগারেট পাকানোর মতো সহজ বহুদিনের অভ্যস্ত কাজটা আর একবার চেষ্টা করতে থাকে। কেনা সিগারেটের তামাক নরম, নইলে কবে এই সিগারেট পাকানোর নেশা ছেড়ে দিত সে। সিগারেটের প্যাকেট কিনে ফস্ ফস্ একটার পর একটা ধরাত। কিন্তু সিগারেটটাই তো নয়, তামাকটা কাগজে পাক খাওয়ানোটাও একটা নেশা। আগে নির্গুণহরি চমৎকার নিটোল পাকানো সিগারেট তৈরী করত। একধারটা মোটা, একধারটা সরু। তামাকটা এমন মিহি করে ডলে নিত যে আগুন ধরালে সহজে নিবত না। সরু ধারটা ঠোঁটে ধরে টানলে নিরেট ধোঁয়া বেরিয়ে আসত। বহুদিনের অভ্যেস!

অনেক কষ্টে সিগারেটটা পাক খেল। থ্যাবড়া দেখতে হল। জিব বুলিয়ে আঠা জুড়ে চেয়ে দেখল নির্গুণহরি। থুথুটা বেশী লেগে জ্যাবড়া হয়ে গেছে। ভেজা ভেজা। এর চেয়ে ভাল এখন আর ভাবা যায় না। শালার ডানহাতটা…

সিগারেট ধরিয়ে উঠল নির্গুণহরি। উঁচু বাঁধের মতো কর্ড লাইন পড়ে আছে, নিস্তেজ আলোয় দু-ফলা ইস্পাত ঝিকোচ্ছে। খাটালের দুটো মোষ নির্ভয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে লাইন। ওপাশে জলা, সেইখানে ডুবে থাকবে। ভাবতেই শীত করে ওঠে। নির্গুণহরি মাথার উলের টুপিটা টেনে নামায়, সতর্ক হাতে গলায় ফাঁস দেওয়া কম্ফটারটা দেখে নেয়। গায়ে কোট, পায়ে মোজা। তবু শীতটা ঠিকই শরীরে ঢুকে পড়ে। এই হচ্ছে বুড়ো বয়েস।

নির্গুণহরি দাঁড়িয়ে কোন-ধারটায় যাবে তা একটু চিন্তা করে নেয়, ছেলেটা যে কোথায় কোন রাস্তায় পড়ে আছে তা বলা মুশকিল। কিন্তু কাছে-পিঠেই আছে কোথাও। কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। কিন্তু তার জন্য দুশ্চিন্তা নেই তার। বাড়ি না ফিরলেও বেঁচেই আছে। প্রায়দিনই নেশা করে। তবু ছেলের মা সারা রাত ঘুমোতে দেয় না, রাত না পোয়াতেই ঠেলে বের করে দেয়, ছেলে খুঁজে আনো আগে, তারপর অন্য কথা। ছেলে না পেলে আমি কুরুক্ষেত্র করব…

ছেলে প্রতি রবিবারই পাওয়া যায়। রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকে। নির্গুণহরি দেখতে পায়, কিন্তু কুড়িয়ে নেয় না শুধু নজর রাখে। সতুয়ার চায়ের দোকানে

বসে ভাঁড়ে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ দেখে। হিন্দি কাগজ, নির্গুণহরি ভাষাটা জানে না। তবু পড়বার চেষ্টা করে। ফাঁকে ফাঁকে নজর রাখে, উঠে গিয়ে ছেলের আশে পাশে ঘুরে আসে, কুকুর টুকুর কাছে পিঠে থাকলে তাড়িয়ে দেয়। মুখের কাছে প্রায়দিনই বমির স্তূপ দেখা যায়, তার ওপর নীল মাছির ভিড়। সেগুলোও ঝাপটা মেরে উড়িয়ে দিয়ে আবার সতুয়ার দোকানে এসে বসে। চা খায়, দুর্বোধ্য হিন্দি কাগজটা চোখের সামনে তুলে চেয়ে থাকে। তখনো তার ডানহাতটা কাঁপে। কখনো চা চলকে পড়ে ছ্যাঁকা লাগে। নির্গুণহরি গাল দেয়—শুয়োরের বাচ্চা…

হাতটাকে দেয়। ছেলেটাকে দেয়। জগৎ সংসারকে দেয়।

উড়োজাহাজটা এতক্ষণে কত দূর চলে গেছে? তবু শব্দটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে ঠিক। মুছে যাচ্ছে না। হাঁপিয়ে গেছে বুড়ো উড়োজাহাজটা। আকাশটা তো কম বড় নয়। সেটা পেরোতে আরো কত সময় চলে যাবে।

নির্গুণহরি নিশ্চিন্দার রাস্তা ধরে এগোলো। মুখের শ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়ার মতো ভাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। সিগারেটের গোড়াটা মুখের লালায় ভিজে নেতিয়ে গেছে। কটু স্বাদ পায় সে। তামাকের আঁশ জিব্ থেকে থুঃ করে ছিটকে ফেলে ধ্যাব্ড়া সিগারেটটার দিকে তাকায়। নিবে গেছে বাঞ্চোৎ। আবার ধরায়। কাশে, হাঁটে।

সতুয়ার দোকানে পশ্চিমা কুলি কামিনদের মেলা বসে গেছে। ভাঁড়ের চা সাত পয়সা। গুড় দেওয়া। আর তিন পয়সা বেশী দিলে কাপে চিনি-দেওয়া চা পাওয়া যাবে। স্বাদ একই, আট টাকা কিলো দরের চা আর শুকনো পেয়ারা পাতায় কোনো তফাৎ নেই।

নগেনের ডিস্‌পেন্‌সারী পেরিয়ে মাকালতলার রাস্তায় পা দিতেই ছেলের দেখা পেয়ে গেল নির্গুণহরি। গায়ে লাল সাদা ডোরাওলা শার্টটা বাহার দিয়েছে। এক ঠ্যাং সোজা পড়ে আছে, অন্য ঠ্যাংটা শোয়ানো, ঠ্যাঙের ওপর ভাঁজ করা। উপুড় হয়ে হাতের খাঁজে মাথা রেখে শুয়ে আছে ছেলেটা। মাথা ঘিরে মাছি। ধুলোর মধ্যে মুখ। মরেনি। শ্বাস বইছে, ওঠানামা করছে পিঠ। আশ পাশ দিয়ে বাজারমুখো রাস্তায় লোকজন যাচ্ছে, আসছে, গা করছে না। পরিচিত দৃশ্য। নির্গুণহরি এগোলো। কাছাকাছি এসে একটু ঝুঁয়ে দেখল। কালো রোগাটে চেহারা, চোয়াল ভাঙা, মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় জড়িয়ে একবার কানের ওপরটা ফেঁসে গিয়েছিল। সেই দাগটা দেখা যাচ্ছে।

ছেলেটা তারই। মমতাভরে একটু চেয়ে থাকে নিগুর্ণহরি। নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে করে। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। রাতের হিমে শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

কিন্তু ছুঁল না। উঠে দাঁড়াল। উড়োজাহাজটা এখনো যাচ্ছে। আশ্চর্য। শব্দটা কোন দিগন্ত থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে এখনো?

ফিরে এসে মোড় ঘুরে সতুয়ার দোকানে ঢুকল নিগুর্ণহরি। পশ্চিমাদের ভিড়ের এক পাশে বসল। খবরের কাগজটা ভাগ ভাগ হয়ে গেছে হাতে হাতে। একটা পাতা পড়েছিল। নিগুর্ণহরি তুলে নিল পাতাটা। ভারী দুর্বোধ্য ভাষা। তবু অক্ষর চিনে চিনে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। অ্যালুমিনিয়মের বড় মগে চামচে নেড়ে চায়ের কাথ গুড় আর দুধে মেশাচ্ছে সতুয়া। শীতের সকালে চায়ের লিকারের গন্ধটি বড় ভাল লাগে। নিগুর্ণহরি নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে থাকে।

পশ্চিমাদের ভিড়ের পিছনে নগেনের কম্পাউণ্ডার বনবিহারী তার টাকটি র‍্যাপারে ঢেকে কুঁজো হয়ে বসে ছিল। মুখখানা তুলে বলল—দাদা যে?

নিগুর্ণহরি চিনতে পেরে হাসল—বনবিহারী? অনেককাল দেখি না?

—কোথায় বেরিয়েছেন সকালে? ছেলে খুঁজতে?

—হু

—পেলেন?

—পেয়েছি। তোমার কোলে চাদরে ঢাকা ওটি কে? বাচ্চা নাকি?

বনবিহারী হেসে ফেলে—না, বাচ্চা নয়, বাচ্চার ফুড। আজকাল পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে যোগাড় হ'ল নিয়ে যাচ্ছি।

কৌটোটা চাদরের তলা থেকে বের করে দেখায় বনবিহারী। নিগুর্ণহরি দেখে ভ্রূ কোঁচকায়—মায়েদের বুকে আজকাল দুধ হয় না কেন হে? সব আমড়া-আঁটি হয়ে যাচ্ছে!

—কী জানি দাদা। সেটাই ভাবি। আমরা তো মায়ের দুধ খেয়েই…

—খুব অবাক কাণ্ড! কারো বুকে দুধ নেই, এ কী করে হয় ভেবেছো?

—ভাবছি।

—ভাবো, খুব ভাবো। ভেবে বের করে ফেল। এ ভাল কথা নয়।

বোধহয় ভাবনার জন্যই বনবিহারী র‍্যাপারের ভিতরে আবার টাকটি ঢেকে কুঁজো হয়ে বসে। হাতে সাত পয়সার ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে চোখ

মিটমিট করে। শিশুর মতো আদরে পরিপাটি আঁকড়ে ধরে কোলের বেবীফুডের কৌটো।

নির্গুণহরি হিন্দী কাগজটার পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশ থেকে এখনো একটা এরোপ্লেনের গুন্ গুন্ শব্দ ঝরে পড়ছে। কেউ না শুনুক নির্গুণহরি ঠিক শুনতে পায়।

বুকে কফের ঘড়ঘড় শব্দের মতো আওয়াজ তুলে উঁচু দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যায়।

ধুলো থেকে চোখ তুলে চেতন দেখল, আকাশময় এক সাদা আলোর বল। এরোপ্লেনটা দেখতে পায় না চেতন। আলোটা ফটাস্ করে চোখে কামড়ায়, মাথা তুলতেই ঝিন্‌ন করে একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে তাকে। মাথার ভিতরে ফেটে পড়ে একটা রঙের বোমা। নানা রঙের ঢেউ মাথাটা ভাসিয়ে নেয়। আবার ধুলোয় মাথাটা রেখে দেয় চেতন। চারদিকটা এখনো স্পষ্ট নয় তার কাছে। সেই আবছা চেতনায় একটা বুড়ো উড়োজাহাজের আকাশ পেরোনোর দূর শব্দ আসতে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল চেতন। চোখ বুজে থাকলেও তার সাড ফিরে আসছে। বুকের নীচে মাকালতলার কাঁচা রাস্তা, শরীর ঘেঁষে লোক-জনের পা যায় আসে। রবিবারই হবে আজ, কাল যখন শনিবার ছিল, কাল রাতে রিকশাওয়ালাটা তাকে ঢেলে দিয়ে গেছে এইখানে। রিকশাওয়ালাটার তেমন দোষ নেই, নয়া আদমী, চেতনের বাড়ি তার চিনবার কথা নয়, তবু অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে খুঁজেছে, তারপর ঢেলে দিয়েছে রাস্তায়। চেতনের মনে পড়ে উঁচু রিকশা থেকে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গেল শক্ত মাটির ওপর। কিন্তু লাগেনি। ভেসে ভেসে পড়েছিল।

চোখ মিট্ মিট্ করে নিজেকে একটু দেখল সে। পায়ের চপ্পলজোড়া ঠিক আছে, টেরিকটনের ওলিভ গ্রীন প্যাণ্টটা কেউ খুলে নেয়নি, পায়ে লালমোজা, ডোরাওলা জামা, জামার নীচে সোয়েটার—সবই ঠিক আছে। গায়ে ধুলো লেগেছে খুব। মুখের একফুট দূরে তার বমির ওপর মাছি জমাট বেঁধে আছে। সাড় ফিরে আসতেই কম্প দিয়ে একটু শীত করে তার। কুয়াশার জন্য রোদ এখনো তেমন তেজালো নয়। সারা রাতের হিমে শরীরটা ভিজে

আছে। উঠে পড়ল চেতন। ঠিক ওঠা নয়, নিজেকে দাঁড় করানো। ভারী কসরতের ব্যাপার এসব সময়ে। হাত কাঁপে, পা ঠিক থাকে না, মাথাটাকে দু'হাতে ঘটের মতো ধরে জায়গামতো রাখতে হয়। পেচ্ছাপে তলপেটটা ভারী। মাকালতলার রাস্তার ধুলো এক পোঁচ জিবে উঠে এসেছে। থুথু ফেললে কাদাগোলা রং দেখা গেল।

নগেন ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর দেওয়ালে বিচিত্র একটা নকশা কেটে পেচ্ছাপ করল চেতন, এক হাত বাড়িয়ে দেওয়ালটায় ভর রেখে। তলপেটটা কেমন টন টন করে এখনো। শরীরটা আরো একটু দুর্বল লাগে।

চেতন জানে, তার বাপটা বসে আছে সতুয়ার দোকানে। বাপের এই বসে থাকাটা ভারী বিরক্তিকর। এ সব সময়ে বাপটাপ কাছে এলে এক রকমের অসোয়াস্তি হতে থাকে। বাপ আছো তো আছো, বাপগিরি পাঁচজনকে দেখানোর কী? প্রেস্টিজ নেই?

দেয়ালটা ধরে ধরেই চেতন মোড় পর্যন্ত আসে। রিক্শা স্ট্যাণ্ডের দিকে হাত তুলে ইশারা করে। একটা রিকশা এগিয়ে আসে। গাছে চড়ার মতো কষ্টে রিকশার সীট পর্যন্ত উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল কে যেন তার বাঁ হাতের কনুয়ের ওপর ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, নির্গুণহরি—তার বাপ।

- আঃ, তুমি আবার ধরছো কেন? আমিই পারব। যাও—

নির্গুণহরি পিছিয়ে যায়।

—সোজা বাড়ি যাস, বুঝলি? নির্গুণহরি চেঁচিয়ে বলে দিল।

ফালতু কথা। আর কোন চুলোয় যাওয়ার আছে! কথা না বলেই মুখটা ফিরিয়ে নেয় চেতন। বাপটাপগুলো হচ্ছে এক একটা গেরো।

রিকশটা দু'কদম এগোতেই কাঁচা রাস্তার গর্তে ঝকাং করে ঝাঁকুনি খেল। মাথার ভিতরে আর একটা রঙের বোমা ফেটে রামধনুর রং ছড়াল। নিজের পকেটগুলো একবার হাতিয়ে দেখে নেয় চেতন। ফর্সা। রাতে রিকশা-ওয়ালাটা কিংবা অন্য কেউ হিস্যা নিয়ে গেছে, অনেকেরই গত-জন্মের বিস্তর পাওনা আছে চেতনের কাছে। সবাই নেয়। নিক। বেশী যায়নি। সত্যিকারের মাতাল কখনো বেশী পয়সা পকেটে নিয়ে বেরোয় না। বাড়ি ফিরলে রিকশার ভাড়ার জন্য চিন্তা নেই। মা মিছরি ভিজিয়ে রেখেছে। দাদামশাইয়ের একসেরী কাঁসার গ্লাস ভরে দেবে। চেতনা চোখ বুজে রইল।

পাতকোটায় পোকা হয়েছে। সাদাটে পোকার খোলায় বিজবিজ করে বালি ওঠে। দশটা কই মাছ ছাড়া হয়েছে, চুন আর পটাস দেওয়া হয়েছে। কিছু হয়নি। খাওয়ার জল বাইরে থেকে আনতে হয়।

পাথরবাটিতে মিছরি ভেজানো আছে। দাদাশ্বশুরের দিয়ে যাওয়া একসেরী কাঁসার গ্লাসটা মেজে ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে। টাটকা জল আনলে সরবৎ হবে।

—বউ, গেলি? শাশুড়ি চেঁচাচ্ছে ভাঁড়ার ঘর থেকে।

—যাই। মিনতি পূবের জানালার ধারে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়। হাতে পাউডারের পাফ্। মোছা-মোছা করে একটু দিয়ে নেবে মুখে। চুল আঁচড়ে নিয়েছে। ধোঁয়াটে আয়নাটার ওপর ঝুঁকে মুখখানা দেখছিল মিনতি। কালো কুচ্ছিৎই বলা যায় তাকে. চিরকালই সবাই তাই বলেছে। ইদানীং কি একটু জেল্লা লেগেছে তার? চোখের কোল আর তেমন বসা লাগে না তো! রঙটা মাজা মাজা হয়েছে যেন একটু! ভ্রূর মাঝখানে একটা কুমকুমের টিপ বসিয়ে নেয় সে।

—কখন থেকে তো যাই যাই করছিস। ছেলেটা হ-ক্লান্ত হয়ে এসে পড়বে এখখুনি। বাসি জল মেটে কলসীতে পাথর হয়ে আছে, মুখে দিলে দাঁত নড়ে যায়। পা চালিয়ে যা—

—যাই। উত্তর দেয় মিনতি। তবু তার তাড়া নেই। সামনের চুলগুলো হাতের তেলোয় চেপে কপালটা একটু ঢাকবার চেষ্টা করে সে। উঁচু কপাল তার, সহজে ঢাকা পড়ে না। কী ভেবে কাজললতা খুলে চোখের কোলে একটু টেনে দেয়। খুব বেশী সাজগোজ হয়ে গেল নাকি? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখখানা দেখে। মণ্ডলদের বাড়ির কলে জল আনতে গেলে আজকাল মেস-বাড়ির মোটা পুলিসটা তার সঙ্গে যেচে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে। ভাবতেই একটা আনন্দের গুড়গুড়ুনি ওঠে বুকে। সে খুব কুচ্ছিৎ হলে কি হত এরকম?

সে সাজগোজ করলে শাশুড়ী রাগ করে না, বরঞ্চ খুশী হয়। ভাবে ছেলেকে মজাতে বউ সাজছে। ক্ষয়ে গেছে মিনতির। চেতন দেখে নাকি

মিনতিকে? কোনোদিন দেখেছে? বিয়ের আগে মিনতি তার কেপ্পন দাদার সংসার আগলাত। গোটা দশেক গরু, পাঁচ সাত বিঘে ধানজমির মালিক তার দাদা পয়সা খরচের ভয়ে বোনের বিয়ের নামও করত না। সেসময়েই এক দোলের দিনে দাদার সিদ্ধি-গেলা একপাল বন্ধু গিয়ে তাকে রঙ মাখিয়েছিল। চেতনের হাতে ছিল রুপোলী তেলরঙ, লঙ্কা বাট মেশানো। সেই রং মুখে চোখে ডলে দিয়েছিল খুব। কী কান্না মিনতির! সেই দেখে নেশার ঝোঁকে তাকে ভালবেসে ফেলেছিল চেতন। ওর বাপ মা রাজী হয়নি বিয়েতে। চেতন তখন আর একদিন গভীর নেশা করে পুরুত আর জনকয় বাজনদার আর এক পাল বন্ধু নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে আনল তাকে। দাদার এক পয়সা খরচ হয়নি। বিয়ের পর মিনতি শ্বশুরবাড়ি রওনা হ'ল—সামনে হ্যাজাক উঁচু করে ধরে একজন হাঁটছে তার পেছনে রোগা রোগা কয়েকজন বাজনদার ট্যাং ট্যাং করে বাজনা বাজাতে বাজাতে চলেছে, পিছনে রিকশায় মাতাল চেতনের পাশে কাঠ হয়ে বসে মিনতি। শ্বশুরবাড়িতে কেউ নতুন বউ বরণ করেনি, বরঞ্চ কান্নার রোল উঠেছিল। হিন্দ মোটরের হাতুড়ে চেতন বিড়বিড় করে বলছিল—মালটা যখন এনেই ফেলেছি তখন তুলেই নাও না। বিয়ে তো করতুমই…

ওকে বিয়ে বলে না। সঠিক বিয়ে মিনতির আজও হয়নি। তবু তার শ্বশুরবাড়ি আছে। শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর আছে—এ বড় আশ্চর্য!

বালতি আর কলসী নিয়ে বেরোনোর সময়ে খুড়ীশাশুড়ির উঁচু গলা শুনতে পায় মিনতি।

—দেখে যাও, নড়া ব্যথা করে সাত সকালে বারান্দা মুছেছি, কাদা মেখে নোংরা করে দিয়ে গেল, শত্তুরের বারান্দা যে……

বাড়িটা ভাগ ভাগ হয়ে গেছে। তিনটে ভিটে জুড়ে ব্যারাকবাড়ির মতো, উঠোন একটা, কূয়ো পায়খানাও একটা করে। হাঁড়ি আলাদা। লেগে যায় প্রায়ই।

দেওর রতন বারান্দায় মাদুর পেতে পড়তে বসেছিল। মাদুরটা তেমনি পড়ে আছে, বই খোলা। সে নেই, একটু আগে বড়-বাইরে সেরে এসে কূয়ো পাড়ে হাত-মুখ ধুচ্ছিল, দেখেছে মিনতি। বোধ হয় কাটা ঘুড়ি ধরতে ওই অবস্থায় ছুটে গেছে খুড়ীর বারান্দা দিয়ে ভিজেপায়ে। উঠোনের ধুলোর ছাপ ফেলে গেছে।

শাশুড়ি কুয়োপাড় থেকে ডাল ধুয়ে গামলা হাতে বারান্দায় উঠছিল, তাকে দেখে থমকে বলল—এতক্ষণে সময় হ'ল? ছেলেটা সারা রাত বাইরে, চিন্তায় মরি, তোদের প্রাণ ফুর্তি দেখলে মরে যাই! হাঁদানে ছেলেটা এসে পড়বে… বলতে বলতে গলা নামিয়ে বলে—কে উঠেছিল রে ও বারান্দায়?

—রতন বোধহয়।

—আন্দাজে বলিস না, বলি দেখেছেটা কে? বলেই গলা চালায় শাশুড়ি—বলি কার পা সারা বারান্দায় ছাপ ফেলেছে তা কি কেউ গজ ফিতে নিয়ে মেপে দেখেছে নাকি…

গোলমাল থেকে নিঃশব্দে বেড়িয়ে এল মিনতি। একটু হাঁটলে দুর্গাপুরের সদর রাস্তা। সেটা পেরিয়ে মণ্ডলদের বিশাল বাড়ি, সতেরো ভাড়াটের হাট। এ অঞ্চলের জল ভাল না। লোহার গন্ধ, ঘোলা, তার মধ্যে মণ্ডলদের বাড়িতেই যা ভাল জল ওঠে। কুয়া দুটো, টিউবওয়েলে পাড়াপড়শি অনেকেই জল নেয়।

নীচের তলায় পুলিসদের মেস। আসল পুলিস নয়, এরা হচ্ছে কর্ডনিংয়ের পুলিস, চোর ধরে না। মোটা পুলিসটার নাম বিজয় সোরেণ। ভুঁড়ির নীচে বেল্ট বাঁধে, গোঁফের ডগায় মোম লাগায়। অবিকল পশ্চিমা মনে হয়। কথাও বলে ওই রকম টানে—বুঝলে হে চেতনের বউ, এবার যখন চেতনকে তুলে নিব, আর ছাড়ব না, মাতালটাকে বুঝিয়ে দিও। রোজ রাতে শালাদের ডানা গজায়। জায়গাটা মাতালের হাট বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা আটকাতে পার না?

পুলিসের পোশাক পরলে ভাবী চমৎকার দেখায় বিজয় সোরেণকে। লুঙ্গি আর গেঞ্জী পরা থাকলে নিরীহ ভালমানুষ মনে হয়। দেখা হতেই হাসল মিনতি।

বিজয় সোরেণ চোখে নাচিয়ে বলে—চেতনটা কোথায়? ফিরেছে?

—তার খবর কে রাখে?

বিজয় সোরেণ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আবার ফিক করে হেসে বলে—কাল বাদলপাড়া থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল, কুমোরপট্টির ভাঁটিখানায় দেখি একটা মাতাল আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। সবজিওয়ালা নিধে, জিজ্ঞেস করলাম করছো কি? বলে, চেতন এইমাত্র আকাশে উড়ে গেল এইবার নেমে আসবে।

খুব হাসল বিজয় সোরেণ।

পুরুষমানুষের সামনে টিউবওয়েল পাম্প করতে লজ্জা করে। শরীরটা লকড়-পকড় করে তো। কিন্তু বিজয় সোরেণ ওই যে মোড়া পেতে বারান্দায় বসেছে, আর নড়বে না। মিনতি জল নিয়ে গেলে উঠবে, ভাবতে একটু রাগ মেশানো শিহরণ বোধ করে মিনতি। তেমন কুচ্ছিৎ সে এখন আর নয়!

শাড়িটা শক্ত করে জড়িয়ে সে টিউবওয়েলের হাতলটা ধরল। বড় শক্ত হাতল। কষ্টে পাম্প দিতে থাকল। কপালের ওপর চুল উড়ে আসছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বিজয় সোরেণকে, একটু চোখাচোখি, একটু আধটু হাসির ছিটে। বড় ভাল লাগে মিনতির।

—এবার যখন ধরব চেতনকে, ছাড়ব না, বলে দিও।

মিনতি ঠোঁট উল্টে বলে—ইস্! চাল ধরা পুলিসের ক্ষমতা জানা আছে।

বিজয় সোরেণ হাসে—ক্ষমতাটা দেখবে একদিন, দেখবে।

—আচ্ছা, জানা আছে।

বাঁ কাঁখে কলসী, ডান হাতে বালতি। জল চল্‌কে পড়ছে ছপ ছপ! মিনতি তুলকি পায়ে সদর রাস্তা পার হয়ে চক্রবর্তীদের ভাঙা মন্দিরের চাতালে পড়ল। বালতিটা নামিয়ে দম নিল একটু। কাঁখ বদলাবে। ঠিক সেই সময়ে এরোপ্লেনটা এল। অনেক উঁচু দিয়ে কুয়াশার ভিতর একটা ছায়া ধীরে উড়ে যাচ্ছে।

মিনতি কপালের চুল সরিয়ে ঘাড়ের ওপর মাথা ফেলে মুখখানা সম্পূর্ণ আকাশে তুলে দেখল। ধীর, গম্ভীর শব্দ। মিনতি চেয়েই থাকে। ভাবে, একজন কালো চশমা পরা লোক এরোপ্লেনটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় টুপি, ফর্সা রং, খুব অহঙ্কারী চেহারা। তার ঘর-সংসার নেই, খাওয়া পরার ভাবনা নেই। কেবল দিন রাত সে তার উড়োজাহাজ নিয়ে উড়ে যায়। উড়ে যায়।

আকাশ থেকে মুখ নামায় মিনতি। কলসটি কাঁখ বদলে নেয়। আবার হাঁটে। জল চল্‌কে পড়ে ছপ্ ছপ্। শাড়িটা পায়ের কাছে ভিজে যায়। শীত করে।

শাশুড়ি মাঝে মাঝে তার দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে—কুড়ির বুড়ি তবু বাচ্চা হয় না কেন রে? বাঁজা নোস তো?

মিনতি ঠোঁট ওল্টায়। কে জানে! ধামার মতো পেট নিয়ে ঘুরে বেড়ানো! মাগো! এই বেশ আছে মিনতি। চ্যাপ্টা শরীর। আর একটু চর্বি হ'লে চমৎকার গড়ন হবে তার। বাচ্চা কাচ্চার দরকার নেই। সে বড় ঝামেলা। একদিন সে উড়ে যাবে। বিজয় সোরেণ কিংবা গগ্‌লস-পরা উড়োজাহাজের লোকটা কেউ না কেউ একদিন লুটে নিয়ে যাবে ঠিক।

ডাক্তাররা বলে বটে মাঝে মাঝে জোলাপ নিতে। কিন্তু সেটা কোনো কাজের কথা নয়। নির্গুণহরি জানে, বয়সে মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ।

দুপুরে জল সরতে গিয়ে বেগ চাপল। কঠিন কোষ্ঠের মানুষ নির্গুণহরির কাছে ভারী আনন্দের ব্যাপার সেটা। কদিন বুকটা পেটটা চাপ ধরে আছে। প্রেশারটাও ভাল না।

গামছা পরে, বালতিতে জল নিয়ে গিয়ে দেখে পায়খানার দরজা বন্ধ।

বারান্দায় এসে ঐ অবস্থায় বসে রইল নির্গুণহরি। দরজাটা খুলল না। ভিতরে থেকে থুথু ফেলার আওয়াজ আসছে। ছোটো বউ টউ কেউ গিয়ে থাকবে। শ্বশুর, ভাসুর যাবে টের পেয়েছে, তাই ইচ্ছে করে বেরোচ্ছে না।

সংসারে শান্তি নেই। কাঁপা ডানহাতে অতি কষ্টে সিগারেটটা পাকিয়েছিল। জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেল সেটা।

নিজেদের আলাদা ব্যবস্থা করার কথা প্রায়ই ভাবে নির্গুণহরি, কিন্তু ব্যবস্থা কি সোজা কথা! সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক ফ্যাঙ্ক বসাতে গুচ্ছের টাকা। ছেলেটা শুঁড়ির হাতে মাস মাইনের অর্দ্ধেক তুলে দিয়ে আসে। অন্য বদখেয়ালও আছে। পাত্তিখেলার জো এসেছে গঞ্জে। সেদিকেও কিছু ঢালে নিশ্চয়ই।

বেগটা চলে গেল। আবার লুঙ্গি পরে ঘরে ফিরে আসে নির্গুণহরি। দক্ষিণের জানালার ধারে বসে। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে চেতনের মা। গালে পানের ঢিবি। নির্গুণহরি ডানহাতটা তুলে ধরে চেয়ে থাকে। বিশ্বসংসারে সবাই বিশ্রাম নেয়, ঘুমোয় কিংবা চুপ করে থাকে। কেবল এই শুয়োরের বাচ্চারই বিশ্রাম নেই, ঘুম বা চুপ করে থাকা নেই। শালা নড়ছে তো নড়ছেই।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতে বালিশটা খাটের বাজুতে খাড়া করে উঁচু হ'য়ে শুয়ে ছিল চেতন। হাতে সিগারেট। পূর্বের জানালার কাছে ধোঁয়াটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজছে মিনতি। খুব মন দিয়ে সাজছে।

একপলক সেদিকে চেয়ে থাকে চেতন। খুব নেশার ঘোরেই বিয়েটা করেছিল সে, সন্দেহ নেই।

আল্গা গলায় জিজ্ঞেস করল—অত সাজগোজ কিসের?

মিনতি ফিরে তাকালও না। বলল—কিসের আবার! এমনিই।

—এমনিই কেউ সাজে নাকি?

—মেয়েরা সাজে।

—কেন?

—ভাল লাগে।

—দূর ঢ্যাম্না, এমনি সেজে কী হয়? শুচ্ছের পাউডার স্নো নষ্ট।

মিনতি ফুঁসে উঠে বলে—আমারটা নষ্ট হচ্ছে হোক। তোমার কী?

—বাপের বাড়ি থেকে ক'বাক্স রূপটান এনেছিলে? বড় বড় কথা।

মিনতি একটুও মিইয়ে যায় না। সমান তালে বলে—আর কী দাও শুনি? কেবল তো একটু স্নো, পাউডার।

চেতনের শরীরটা এ সময়ে বড় টিস্ মিস্ করে। ঝগড়া কাজিয়া ভাল লাগে না। হাই তোলে। দু' চারটে কথা কাটাকাটি হলেই মেয়ে বসবে, থাকগে।

—চা করো তো।

—মা করছে।

—কই, শব্দ পাচ্ছি না তো। মা উঠলে শব্দ পেতাম।

—উঠেছে। আমি দেখেছি।

—অ! বলে চুপ করে চেয়ে মিনতির সাজ দেখে সে। হতে পারে যে মিনতি আগের মতো রুক্ষ নেই। গা একটু মোলায়েম মনে হচ্ছে! একটু ভারভারিকও হয়েছে বোধহয়। কিন্তু তবু তেমন ছুঁতে ঘাঁটতে ইচ্ছে করে না। কার জন্য সাজে মাগীটা? কাউকে যদি পটাতে পারে তো খুশীই হবে চেতন। উড়ে যা পাখি, উড়ে যা। পিছু নেবে না কেউ, উড়ে যেতে দেবে। সংসারে

যত টান কমে তত ভাল। সতুয়ার দোকানে গিয়ে বাপটা বসে থাকে তার খোঁয়াড়ি ভাঙার সময়ে। মা মিছরি ভিজিয়ে রাখে। বউটা সাজে, এসব একদম ভাল লাগে না। চেতনের কোথাও একটু নিশ্চিন্তে নিজের মতো গড়িয়ে থাকার উপায় নেই। বাড়ি সুদ্ধ লোক তোমার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। তার চেয়ে উড়ে যা পাখি, উড়ে পুড়ে যা সব। যে যেখানে খুশী চলে যা। চেতন একাই থাকবে।

—বউ, চা নিয়ে যা। মা ডাকছে। মিনতি উঠে গেল।

উড়ে বেরিয়ে গেল ছুটির একটা দিন। কাল থেকে হপ্তা পড়ে যাচ্ছে, ছুটির দিনটা কেমন কুয়াশার মধ্যে কেটে যায়। ছুটি কেমন তা বুঝতে পারে না। যেমন বুঝতে পারে না বউ কেমন, বাবা কেমন, মা কেমন, কিংবা এই বাড়িটা কেমনধারা, বুঝতে না পেরে ভালই আছে চেতন।

আয়না দিয়ে একপলক দেখেছিল মিনতি। সাজতে সাজতে, দেখল অন্যমনস্ক চেতন তাকে গো-গ্রাসে দেখছে। চেতন দেখছে! ভারী অবাক হ'ল মিনতি। তবে কি সে সত্যিই সুন্দর হয়েছে আগের চেয়ে? ভাবতেই বুক গুরু গুরু করে উঠল তার। বিয়ের রাতে যেমনটা করেছিল।

চা আনতে উঠে গিয়েও মিনতি উত্তেজনাটা সামলাতে পারছিল না। তিন বছরের বিয়ে তাদের। তার মধ্যে শেষ আড়াই বছর চেতনকে নেশার মধ্যে ছাড়া কখনো দেখেনি মিনতি। নেশার মধ্যে কখনো সখনো তাকে ঘেঁটেছে চেতন। জ্ঞান হলে তাকিয়ে দুপলক দেখেনি। এই প্রথম দেখল, ঐরকমভাবে।

একটা আনন্দ খিমচে ধরে তার বুক। যদি সে সত্যিই সুন্দর হয়ে থাকে, আর চেতনের যদি চোখ পড়ে যায় তবে হয়তো কী একটা কাণ্ড হবে! ভাবতেই ভাল লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না।

শাশুড়ি বড় যত্নে পরিষ্কার কাপ প্লেটে চা করে দেয়। কাপের ধারে দুটি চিঁড়ের মোয়া।

চা হাতে সাবধানে ঘরে এসে ঢোকে মিনতি। উত্তেজনায় চা একটু চল্‌কে যায় বুঝি! সাবধানে হাঁটে মিনতি। এক-পা, এক-পা করে বিছানার কাছে আসে। এসে নববধূর মতো মাথা নত করে দাঁড়ায়।

এসব সময়ে কী করতে হয় তা তো সে জানে না। কিছু একটা হবে, প্রত্যাশা করে।

—চা নাও। কাঁপা গলায় বলে।

হাত বাড়িয়ে নেয় চেতন, উঠে বসে চা খায়।

মিনতি একটু দাঁড়িয়ে থাকে কাছে। তারপর ধীর পায়ে ফিরে যায় জানালাটার ধারে। সেখানে ধোঁয়াটে আয়না, তার সামনে সস্তা স্নো পাউডার।

মিনতি ঝুঁকে নির্লজ্জের মতো মুখখানা দেখে। সুন্দর কিনা তা বুঝতে পারে না।

চেতন উঠে পোশাক পরছে। নেশা করতে যাবে। রোজ অবশ্য বেশী নেশা করে না, ঝুম্‌ঝুমে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে। বেশী নেশা করে ছুটির আগের দিন। সেদিন প্রায়ই ফেরে না। না ফিরুক, মিনতিও তাই চায়।

চেতন জুতো পরে বেরিয়ে গেল।

বাইরে শাশুড়ির গলা শোনা গেল—চেতন, বেরোচ্ছিস ?

—হ্যাঁ।

—রাতে ফিরবি তো ? বলে যা নইলে ভাত নষ্ট।

—ফিরবো।

চেতনের পায়ের শব্দ উঠোন পেরিয়ে গেল।

জানালার ধারের আয়নার সামনে বসে আছে মিনতি। বিজয় সোরেণের কথা ভাবছে। কিংবা ভাবছে উড়োজাহাজের সেই কালো চশমা পরা যুবকটির কথা।

কীট

একদিন নীলা চলে গেল।

একদিন না একদিন চলে যাওয়ার কথাই ছিল নীলার। তাই না যাওয়া এবং যাওয়ার মধ্যে খুব একটা তফাৎ হল না। সুবোধ নিজেই গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে নীলাকে গাড়ীতে তুলে দিতে। বিদায়-মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর যেমন কথা হয় তেমন কিছুই হল না। রুমাল উড়ল না, চোখের জল পড়ল না, এমন কি গাড়ি যখন ছেড়ে যাচ্ছে তখন জানালায় নীলার উৎসুক মুখও দেখা গেল না।

নীলা গেল তার বাপের বাড়ি মধুপুরে। সেখানেই থাকবে, না আর কোথাও যাবে তার কিছুই জানল না সুবোধ শুধু জানল নীলার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই; অনেকদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরকমটাই হবে। খুব শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল ব্যাপারটা।

খুব যে খারাপ লাগল সুবোধের—তা নয়। ভালও লাগল না অবশ্য। তার সম্মানের পক্ষে, পৌরুষের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়। কত লোকের কত জিজ্ঞাসাই যে এখন তার ঘরে উঁকি মারবে তা ভাবতেও ভয় লাগা উচিত। তবু সব ভেবেও সুবোধের মন শান্তই রইল। খুবই শান্ত। বাসে জানালার ধারের বসবার জায়গায় গঙ্গার সুন্দর হাওয়া এসে লাগছিল। এখন বসন্তকাল। কলকাতায় চোরা-গরম শুরু হয়ে গেছে। বাতাসটুকু বড় ভাল লাগল সুবোধের। লোহার প্রকাণ্ড জালের মধ্য দিয়ে সে উৎসুখ চোখে গঙ্গার ঘোলা রূপ, নৌকো, জাহাজের মাস্তুল আর কলকাতার প্রকৃতিশূন্য আকাশরেখায় প্রকাণ্ড বাড়িগুলোর জ্যামিতিক শীর্ষগুলি দেখল। মনোযোগ দিয়ে দেখল, দেখায় কোনো অন্যমনস্কতা এল না। ভালই লাগল তার। এমন অলস ভাবে আয়েসের সঙ্গে অনেককাল কিছু দেখেনি সে। বিয়ের পর থেকেই তার মন ব্যস্ত ছিল, গত দশ বছর ধরে সেই ব্যস্ততা, সেই উৎকণ্ঠা আর বিষণ্ণতা নিয়েই সে সবকিছু দেখেছে। আজ দশ বছর পর সেই ব্যস্ততা হঠাৎ কেটে গেছে। বড় স্বাভাবিক লাগছে সবকিছু। বহুকালের চেনা পুরোনো কলকাতার হারানো চেহারাটি হঠাৎ তার চোখে আবার ফিরে এসেছে আজ।

অনেকক্ষণ ধরে চলল বাস। ট্র্যাফিকের লাল বাতি, মন্থরগতি ট্রাম, রাস্তা-পেরোনো মানুষের বাধা। সময় লাগল, কিন্তু অস্থির হল না সুবোধ। কোনোখানে পৌঁছোনোর কোনো তাড়া নেই বলে জানলার বাইরে তাকিয়ে ঘিঞ্জি ফুটপাথ, দোকানের সাইনবোর্ড, দোতলা বাড়ির জানালায় কোনো দৃশ্য —কত কি দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে রইল।

সন্ধ্যের মুখে ঘরে এসে তালা খুলল সে। বাতি জ্বালল, জামাকাপড় ছাড়ল, হাতমুখ ধুল, চুল আঁচড়াল, তারপর একখানা চেয়ার টেনে জানালার পাশে বসে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে দেখার কিছু নেই। ঢাকুরিয়া বড় ম্যাড়ম্যাড়ে জায়গা. প্রায় আট বছরের টানা বসবাসে এ জায়গার সব রহস্য নষ্ট হয়ে গেছে। চেনাশুনোও বেড়েছে অনেক। এবার জায়গাটা ছাড়া দরকার। দু এক মাসের মধ্যেই। যতদিন নীলার বাপের বাড়ির থাকাটা লোকের চোখে স্বাভাবিক দেখায় ততদিনই নিরুদ্বেগে থাকতে পারে সুবোধ। তারপর অচেনা একটা পাড়ায় তাকে উঠে যেতে হবে।

ঘরের দিকে চেয়ে দেখল সুবোধ। জিনিসপত্র বেশী কিছু নিয়ে যায়নি নীলা, কেবল তার নিজস্ব জিনিসগুলি ছাড়া। তাই ঘরটা যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। কেবল আলনায় নীলার শাড়িগুলোর রঙের বাহার দেখা যাচ্ছে না, আয়নার টেবিলে রূপটানের শিশি-কৌটোগুলোও নেই। তাই তফাৎটা খুব চোখে পড়ে না। যেমন নীলার থাকা এবং না থাকার মধ্যে নিজের মনের তফাৎটাও সে ধরতে পারছে না।

না, ব্যাপারটা মোটেই ভাল হল না। গভীরভাবে ভাবলে এর মধ্যে লজ্জার-ঘেন্নার অনেক কিছু খুঁটিনাটি তার লক্ষ্যে পড়বে। মন-খারাপ হওয়ার মতো অনেক স্মৃতি। তবু কি এক রহস্যময় কারণে মনটা হাল্কাই লাগছিল সুবোধের। জানালার কাছে বসে রইল, সিগারেট খেল। নীলা থাকলে এখানে বসেই এক কাপ চা পাওয়া যেত। সেটাই কেবল হচ্ছে না। ব.ন এক কাপ চায়ের তফাৎ। তবে চা করার একটা লোক রাখলেই তো তফা সেই বুজে যায়। ভেবে একটু হাসল সুবোধ। হাতঘড়িতে প্রায় আটটা স একা তাদের রান্নার লোক নেই, নীলাই রাঁধত। সুবোধ ভেবেছিল হোটেলে বাড়ি আসবে। তারপর ভাবল হোটেলে খেতে গেলে তফাৎটুকু আরো বেশী -দুই পড়বে। তাই সে ঠিক করল রান্নার চেষ্টা করলেই হয়।

রান্নাঘরে একটা প্রেসার কুকার ছিল। কেরোসিনের স্টোভে সেইটেতে

ভাতে ভাত রান্না করে খেল সুবোধ। দেখল এই সামান্য রান্নাটুকুতেই সমস্ত রান্নাঘরটা সে ওলট পালট করে দিয়েছে। আবার সেই তফাৎ! সুবোধ আপনমনে হাসল। তারপর বিছানা ঝাড়ল, মশারি টাঙাল, বাতি নেভাল— এই সব কাজই ছিল নীলার। শুয়ে শুয়ে সে অনেকক্ষণ মশারির মধ্যে সিগারেট খেল সাবধানে। ঘুম এল না। নীলা মাঝরাতে পৌছোবে আসানসোলে। সেখানে ওর জামাইবাবুকে খবর দেওয়া আছে, ওকে নামিয়ে নেবে। কয়েকদিন পরে যাবে মধুপুরে। নীলার এখন বোধহয় সুখের সময়। ঘুরে ঘুরে বেড়াবে খুব। এখন এই রাত এগারোটায় নীলা কোথায়! কী করছে নীলা! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। কাল থেকে তার ঝরঝরে একার জীবন শুরু হবে। মাত্র ছত্রিশ বছর তার বয়স, এখনো নতুন করে সবকিছুই শুরু করা যায়। সময় আছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে তার মনে পড়ল সারারাত সে অস্বস্তিকর সব স্বপ্ন দেখেছে। অধিকাংশ স্বপ্নেই নীলা ছিল। একটা স্বপ্নে সে দেখল—সে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। এসে দেখছে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে দরজার কড়া না নেড়ে দরজার গায়ে কান পাতল। ভিতরে নীলা আর একজন পুরুষ কথা বলছে। মৃদু স্বরে কথা, সে ভাল বুঝতে পারছে না, প্রাণপণে শোনার চেষ্টা করল সে। বুঝল কথাবার্তার ধরন খুবই অন্তরঙ্গ। ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সুবোধ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার হাত এত দুর্বল লাগছিল যে মোটেই শব্দ হল না। ভিতরে কথাবার্তা তেমনিই চলতে লাগল, সে চীৎকার করে নীলাকে ডাকল—দরজা খোলো। বলতে গিয়ে সে টের পেল, সে মোটেই চীৎকার করতে পারছে না। 'দরজা খোলো' বলতে গিয়ে সে ফিস ফিস করে বলছে 'জোরে কথা বলো।' এরকম বারবার লাগল। এত হতাশ লাগল তার যে ইচ্ছে করছিল দরজার সামনেই আত্মহত্যা করে। ভাবতে ভাবতে সে একই সঙ্গে চীৎকার করে দরজায় দিচ্ছিল। অবশেষে দরজায় মৃদু শব্দ হল, থেমে গেল ভিতরের অন্তরঙ্গ তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল। বিশাল শরীরওলা একজন পুরুষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল। চমকে উঠল সুবোধ। চেনা লোক— মনোমোহন। তার অনেকদিন আগেরকার বন্ধু। হায় ঈশ্বর! মনোমোহন কোথা থেকে কি করে যে এল। রাগে দুঃখে ঘেন্নায় লাফিয়ে ওঠে মনোমোহনের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল সুবোধ। কিন্তু পারল না। পা

আটকে যাচ্ছিল, যেন এক হাঁটু জল ভেঙে সে দৌড়োবার চেষ্টা করছে। মনোমোহন দু'তিন লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে পিছু ফিরে দেখল, নীলা অসম্বৃত শাড়ী পরে দরজায় দাঁড়িয়ে নিস্পৃহ মুখে তার খোলা চুলের ভিতরে আঙুল দিয়ে জট ছাড়াচ্ছে। কাকে যে আক্রমণ করবে সুবোধ, তা সে নিজে বুঝতে পারছিল না। রাগ দুঃখ ঘেন্নার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র একটা আনন্দকেও সে টের পাচ্ছিল। পাওয়া গেছে, নীলাকে এতদিনে সুবিধেমতো পাওয়া গেছে। এইরকম স্বপ্ন আরো দেখেছে সে রাতে। কখনো নীলাকে অন্য পুরুষের সাথে দেখা গেল, কখনো বা দেখা গেল নীলা এরোপ্লেনে বা নৌকোয় দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে।

সকালের উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে সুবোধ স্বপ্নগুলোর কথা ভেবে সামান্য জ্বালা অনুভব করল বুকে। বস্তুতঃ নীলার সঙ্গে কারো প্রেম ছিল এটা এখনো পর্যন্ত প্রমাণসাপেক্ষ। মনোমোহনের স্বপ্নটা একেবারেই বাজে। কারণ নীলার সঙ্গে তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয়। মনোমোহনের সঙ্গে আর দেখা হয় না সুবোধের। মনোমোহন বোধহয় এখন পুলিশে চাকরি করে—তার ঘর সংসার আছে, সে নিরীহ মানুষ। স্বপ্নে যে কত অঘটন ঘটে!

তবু বুকে মনে কোথাও একটু জ্বালার ভাব ছিলই সুবোধের। স্টোভ জেলে সে চা করল। চা-টা তেমন জমল না, লিকার পাতলা হয়েছে, চিনি বেশী। সেই চা খেয়ে সকাল বেলাটা কাটাল সে। ঝি এসে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে গেছে, তবু নিজে আজ আর রান্না করবে না সুবোধ। আজ ছুটির দিন—রবিবার। দুপুরে গিয়ে কোনো হোটেলে খেয়ে আসবে। সকাল বেলাটায় সে ঘরের কোথায় কি আছে তা ঘুরে ঘুরে দেখল। এখন সবকিছু তাকেই দেখতে হবে। নিজেকে নিজেই চালাতে হবে তার। ব্যাপারটা যে খুব সুবিধেজনক হবে না—তা বোঝা যাচ্ছিল। বিয়ের আগে সে ছিল মা বোন বৌদিদের ওপর নির্ভরশীল। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই গড়পাড়ের সেই যৌথ সংসার ছেড়ে চলে এল ঢাকুরিয়ায় নীলাকে নিয়ে। কখনো সে একা থাকেনি বিশেষ। যে কয়েকবার নীলা একটু বেশীদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে সে কয়েকবারই মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সুবোধ। কাজেই এখন একা একা সংসারের মতো কিছু চালানো তার পক্ষে মুশকিল। মাকেও আর আনা যায় না—বাতে অথর্ব এই বুড়োবয়সে মা বড় জবুথবু হয়ে গেছে।

তা ছাড়া মাকে আনলেও স্থায়ীভাবে আনা যায় না, গড়পাড়ের সংসার ছেড়ে মা এখানে থাকতেও চাইবে না বেশীদিন। এর ওপর আছে মায়ের অনুসন্ধানী চোখ—এক লহমায় বুঝে নেবে যে নীলা আর আসবে না।

নীলা আর আসবে না ভাবতেই সকাল বেলায় একটু কষ্ট হল সুবোধের। কষ্টটা নিতান্তই অভ্যাসজনিত। দশ বছর একসঙ্গে বসবাস করার অভ্যাসের ফল। নীলা না থাকলে হরেকরকমের অসুবিধে। সেই অসুবিধেটুকু বাদ দিলে মনটা বেশ তাজা লাগল তার। বেলা বাড়লে রাতের স্বপ্নগুলোর মধ্যে একমাত্র মনোমোহনের স্বপ্নটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্নই তার মনে থাকল না। মনোমোহনের সঙ্গে নীলার কিছুই ছিল না—সুবোধ জানে। তবু স্বপ্নটার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু আছে বলেই তার মনে হচ্ছিল। হয়তো এই ঘরে, তার এই সংসারের মধ্যে থেকেও নীলা কখনো ঠিক পুরোপুরি সুবোধের ছিল না। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই সুবোধের এইরকম ধারণা শুরু হয়। গড়পাড়ের বাড়িতে বাচ্চা ছেলেমেয়ের অভাব ছিল না। দুই দাদার গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি তেমন পাকেনি তাদের কাছে সে প্রায়ই গোপনে জিজ্ঞেস করত, সে অফিসে চলে গেলে নীলা কি কি করে, বিকেলে ছাদে যায় কিনা, নীলার নামে কোনো চিঠি এসেছিল কিনা। বস্তুতঃ কেন যে সেসব জিজ্ঞাসা করত সুবোধ তা স্পষ্টভাবে নিজে আজও জানে না। বাপের বাড়ির কোনো লোক এসে নীলার খোঁজ করলে সে বিরক্ত হত। কখনো কখনো ঠাট্টার ছলে সে নীলাকে জিজ্ঞেসও করেছে বিয়ের আগে নীলার জীবনে কে কে পুরুষ এসেছে। সুবোধের মনের গতি তখনো ধরতে পারেনি নীলা, তাই ঠাট্টা করেই উত্তর দিত—ছিল তো, সে তোমার চেয়ে অনেক ভাল। ঠাট্টা জেনেও মনে মনে ম্লান হয়ে যেত সুবোধ। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই বাড়িতে একটা গণ্ডগোল শুরু হল মেজদাকে নিয়ে। মেজদার কারখানায় গণ্ডগোল হয়ে লক-আউট হয়ে গেল। ছ মাস পরে কারখানাটা হাত বদল হয়ে গেল। মেজদা পুরোপুরি বেকার তখন। লোকটা ছিল বরাবরই একটু বন্ধ ধরনের, হৈ-চৈ করা মাথা-মোটা গোঁয়ার মানুষ। চাকরি গেলে এ সব লোকের সচরাচর যা হয় তাই হল। বাংলা মদ খেয়ে রাত করে বাসায় ফিরত। গোলমাল বা চেঁচামেচি করত না, কিন্তু মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করত অনেক রাত পর্যন্ত। তিন ঘরের ছোট্ট বাসাটায় ঠাসাঠাসি লোকজনের

মধ্যে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। মেজদার মদ খাওয়ার স্বভাব ছিলই, কিন্তু আগে মাত্রা রেখে খেতো, পুজো পার্বণ বা অন্য উপলক্ষে বেশী খাওয়া হয়ে গেলে বাসায় ফিরত না। কিন্তু চাকরি যাওয়ার পর লোকটাকে রোজই মাত্রার বেশীই খেতে হত, আর বাসা ছাড়া অন্য জায়গাও ছিল না তার। প্রতি রাত্রেই মেজদাকে গালাগাল করত সবাই, মা বলত—ওকে রাতে ঘরে ঢুকতে দিস না। বৌদি সামলাতো বটে, কিন্তু কিছুদিন পর বৌদিরও ধৈর্য থাকল না। কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে গেল বৌদি। সে সময়ে সত্যিই মুস্কিল হল মেজদাকে নিয়ে। তাকে সামলানোর লোক কেউ রইল না। মাঝে মাঝে সদরের বাইরেই সারা রাত শুয়ে থাকত মেজদা। দরজা খুলত না কেউই। সে সময়ে এক বৃষ্টির রাতে নীলা উঠে গিয়ে মেজদাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। সুবোধ জেগে থাকলে নীলাকে এ কাজ করতে দিত না। যখন জাগল তখন নীলা উঠে গিয়ে দরজা খুলছে। রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে নীলাকে ধরল সুবোধ—কোথায় গিয়েছিলে? নীলা দুর্বল গলায় উত্তর দিল—মেজদাকে দরজা খুলে দিতে। ভীষণ রেগে গিয়ে সুবোধ চেঁচিয়ে বলল—কি দরকার তোমার? মাতাল, লোফার, লুম্পেন ঐ ছোটোলোকটার কাছাকাছি তুমি কেন গিয়েছিলে? সে কেন তোমার গায়ে হাত দিল? নীলা এবার অবাক হয়ে বলল—গায়ে হাত দিল! কই, না তো! সুবোধ তবু চেঁচিয়ে বলল—আমি নিজে দেখেছি সে তোমার হাত ধরে আছে। অন্ধকারে নীলার মুখের রঙ দেখা গেল না, নীলা একটু চুপ করে থেকে বলল—চেঁচিও না। বিছানায় চল। বলে দরজায় খিল দিল নীলা। সুবোধের সমস্ত শরীর জলে গেল। সে বলল—কেন গিয়েছিলে? তোমাকে আমি বারণ করিনি ওই লোফারটার কাছাকাছি কখনো যাবে না? নীলা সামান্য হাঁফ ধরা গলায় বলল—দরজা খুলে না দিলে উনি সারারাত বৃষ্টিতে ভিজতেন। সুবোধ ছিটকে উঠল—তাতে কী হত। মাতালের সর্দি লাগে না। কিন্তু তাকে তুমি প্রশ্রয় দাও কেন? এ বাসায় তার আপনজন কেউ নেই? লোফারটা তোমার হাত……। সামান্য কঠিন হল এবার নীলার গলা—তুমি নিজে দেখেছো? বাস্তবিক সুবোধ কিছুই দেখেনি, সে উঠে দেখেছে নীলা ঘরে ফিরে আসছে, তবু কেন যেন তার মনে হয়েছিল ওরকম কিছু একটা হয়েছে। তাই সে গলায় তেজ বজায় রেখে বলল—হ্যাঁ, দেখেছি। নীলা আস্তে আস্তে বলল—উনি

মাতাল অবস্থাতেও চিনতে পেরে আমায় বললেন—তোমাকে কষ্ট দিলাম বৌমা। আমার হাতে ওঁর হাত লাগেওনি। সত্যিই কি তুমি নিজে দেখেছো। সুবোধের আর তেমন কিছু বলার ছিল না, তবু সে খানিকক্ষণ গোঁ গোঁ করল। সারারাত ঘুমের মধ্যেও ছটফট করল। জ্বালা যন্ত্রণা হিংস্রতায় এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। হাতের কাছেই নীলা, তবু কেন নীলাকে দূরের বলে মনে হচ্ছে কে জানে! পরদিন থেকে ব্যাপারটা অন্য চেহারা নিল। রাতে সুবোধের চীৎকার সবাই শুনেছিল। সম্ভবত হাত ধরার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিয়েই মা আর বড়দা কিছু বলেছিল মেজদাকে। মেজদার সম্বন্ধে তখন ওরকম কোনো ব্যাপারই অবিশ্বাস্য ছিল না। সুস্থ অবস্থায় সম্ভবতঃ মেজদাও বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল কিনা। তাই পরদিন থেকেই মেজদা কেমন মিইয়ে গেল। দিনের বেলাতে আর বাসায় থাকতই না। নীলা সুবোধকে এ ব্যাপারে সরাসরি দায়ী করেনি, কিন্তু তখন থেকেই আলাদা বাসা করার জন্য সুবোধকে বলতে শুরু করে নীলা। তাই বিয়ের দু বছরের মাথায় সুবোধ আলাদা হয়ে এল।

তবু শান্তি ছিল না সুবোধের। যাতায়াতের পথে দেখত রকে বসে পাড়ার ছেলেরা মেয়েদের টিটকিরি দিচ্ছে, পথে ঘাটে দেখত সুন্দর পোশাক পরে সুপুরুষ মানুষেরা যাচ্ছে, কখনো বা বন্ধুদের কাছে শুনত চরিত্রহীনতার নানা রঙদার গল্প। সঙ্গে সঙ্গেই নীলার কথা মনে পড়ত সুবোধের। পৃথিবীতে এত পুরুষ মানুষের ভীড় তার পছন্দ হত না। তার ইচ্ছে হত নীলাকে সে সম্পূর্ণ পুরুষশূন্য কোনো এলাকায় নিয়ে গিয়ে বসবাস করে। অফিসে বেরিয়ে বোধহয় সে অনেকবার মাঝপথে বাস থেকে নেমে পড়েছে। মনে বিষের যন্ত্রণা। একটু এদিক ওদিক ঘুরে চুপি চুপি ফিরে এসেছে বাসায়। নিঃসাড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছে দোতলায়, দরজায় কান পেতে ভিতরে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে কিনা শুনতে চেষ্টা করেছে। তারপর আস্তে আস্তে দরজায় কড়া নেড়েছে। প্রায়ই দরজা খুলে নীলা অবাক হত—এ কী, তুমি! খুব চালাকের মতো হাসত সুবোধ, বলত—দূর রোজ অফিস করতে ভাল লাগে? চলো আজ একটা ম্যাটিনি দেখে আসি। শেষের দিকে নীলা হয়তো কিছু টের পেয়েছিল। আর তাকে দেখে অবাক হত না। শক্ত মুখ আর ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে একদিন বলেছিল—চৌকির তলাটলাগুলো ভাল করে দেখে নাও।

ধরা পড়ে মনে মনে রেগে যেত সুবোধ। নিজের সঙ্গে নিজেই বিজনে ঝগড়া করত—কিছু একটা না হলে আমার মনে এরকম সন্দেহ আসছে কেন! আমার মন বলছে কিছু একটা আছেই। বাইরে থেকে আর কতটুকু বোঝা যায়।

তবু নীলা চোখের জল ফেলেনি কোনোদিন। ঝগড়া করেনি। কেবল দিনে দিনে আরো গম্ভীর, শীতল, কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সুবোধের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই চলে যাচ্ছিল নীলা। বছর চারেক আগে পেটে বাচ্চা এল তার। তখন আরো রুক্ষ আরো কঠিন দেখাল নীলাকে। হাসপাতালে যাওয়ার কয়েকদিন আগে সে খুব শান্ত গলায় একদিন সুবোধকে বলেছিল—শুনেছি মেয়ের মুখে বাপের ছাপ থাকে। আমার যেন মেয়ে হয়। সুবোধ অবাক হয়ে বলল—কেন? নীলা মৃদু হেসে বলল—তাহলে প্রমাণ থাকবে যে সে ঠিক বাপের মেয়ে। মুখের আদল তো চুরি করা যায় না। মেয়েটা বাঁচেনি। বড় রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে জন্মেছিল। আটদিন পর মারা গেল। মুখের আদল তখনো স্পষ্ট হয়নি। কোথায় যেন একটা কাঁটা এখনো খচ্ করে বেঁধে সুবোধের। নীলা কথাটা যে কেন বলেছিল!

তারপর থেকেই সুবোধ জানত যে নীলা চলে যাবে। আজ কিংবা কাল। আজ কাল করে করেও বছর তিনেক কেটে গেল। খুব অশান্তি কিংবা ঝগড়াঝাটি কিছুই হয়নি তাদের মধ্যে। বাইরে শান্তই ছিল তারা। ভিতরে ভিতরে বাঁধ তুলে দিল কেবল। অবশেষে নীলা চলে গেল কাল।

সারা সকাল কাটল নির্জনতায়, ঘরের মধ্যে! একরকম ভালই লাগছিল সুবোধের। দশ বছরের উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, রাগ—এখন আর তেমন অনুভব করা যায় না। কোনো দুঃখও বোধ করে না সে! সন্দেহ হয় নীলাকে সে কোনদিন ভালবেসেছিল কিনা। সে বুঝতে পারে না ভাল না বেসে থাকলে নীলার প্রতি ওরকম অদ্ভুত আগ্রহই বা তার কেন ছিল! গত দশবছরে নীলার কথা সে যত ভেবেছে তত আর কারো কথা নয়।

দুপুরের দিকে ঘরে তালা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বিয়ের আগে যেমন হঠকারি দায়িত্বহীন সুন্দর সময় সে কাটিয়েছে সে-রকমই সুন্দর সময় আবার ফিরে এসেছে আজ। বাধাবন্ধনহীন। মনটা ফুরফুরে রঙীন একটি রুমালের মতো উড়ছে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়স তার, সামনে এখনো দীর্ঘ জীবন—দায়দায়িত্বহীন। তার চাকরিটা মাঝারি গোছের। উঁচু থাকের কেরানী।

তাদের দুজনের মোটামুটি চলে যেত। এবার একা তার ভালই চলবে। নীলা টাকা চাইবে না বলেই মনে হয়। চাইলেও দিয়ে দেওয়া যাবে। মোটামুটি নীলার ভাবনা থেকে মুক্তিই পেয়েছে সে। এবার পুরোনো আড্ডাগুলোয় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। এবার গ্রীষ্মে প্রতিটি ফুটবল খেলাই দেখবে সে। রাতের শোয়ে দেখবে সিনেমা। ছুটি পেলেই পাড়ি দেবে কাশ্মীর কিংবা হরিদ্বারে, দক্ষিণ ভারত দেখে আসবে। এবার থেকে সে মাঝেমধ্যে একটু মদ খাবে। খারাপ মেয়েমানুষদের কাছে যায়নি কোনোদিন, এবার একবার যাবে। আর দেখে আসবে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মুক্তি—মুক্তি—তার মন নেচে উঠল।

হোটেলে খেয়ে আর ঘরে ফিরল না সুবোধ। সিনেমায় গেল। দামী টিকিটে বাজে বই দেখে বেরিয়ে গেল কলেজ স্ট্রীটে। ঘিঞ্জি পুরোনো একটা চায়ের দোকানে আট নয় বছর আগেও তাদের জমজমাটি আড্ডা ছিল। সেখানে পর পর কয়েক কাপ চা খেয়ে সন্ধ্যে কাটিয়ে দিল সুবোধ। পুরোনো বন্ধুদের কারোই দেখা পেল না। বেরিয়ে পড়ল আবার।

সন্ধ্যে সাতটা। কোথায় যাওয়া যায়!

অনেকদিন আগে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে শখ করে মদ খেয়েছে সুবোধ। সঙ্গীছাড়া কোনোদিন খায়নি। মদের দোকানগুলোকে সে ভয় পায়। তবু আজ একটু খেতে ইচ্ছে করছিল তার। উত্তেজনার বড় অভাব বোধ করছিল সে।

বাসে ট্রামে ভীড় ছিল বলে সে হেঁটে হেঁটে এসপ্ল্যানেডে এল। অনেক মদের দোকানের আশে পাশে ঘুরে দেখল। বেশী বাতি, বেশী লোকজন, হৈ-চৈ তার পছন্দ নয়। অনেকগুলো দেখে সে গলি-ঘুঁজির মধ্যে একটা ছোট্ট দোকান পছন্দ করে ঢুকল। ভিতরে আলো কম, দুচারজন লোক বসে আছে এদিক ওদিক। কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে—আবছা আলোয় তাদের মুখ বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েগুলোর দিকে বেশি তাকাল না সুবোধ। ফাঁকা একটা টেবিলে দেয়াল ঘেঁষে বসল। বেয়ারা এলে একসঙ্গে তিন পেগ হুইস্কির হুকুম করল সে।

বেশীক্ষণ লাগল না। অনভ্যাসের মদ তার মাথায় ঠেলা মারতে থাকে। আস্তে আস্তে গুলিয়ে যায় চিন্তা ভাবনা, শরীরের মধ্যে একটা অবোধ কষ্ট হতে থাকে, পা দুটো ভারী হয়ে ঝিন্ ঝিন্ করে। এই তো বেশ নেশা

হচ্ছে—ভেবে সুবোধ কাউন্টারের কাছে দাঁড়ানো একটি মেয়ের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি পরিচিতার মতো হাসে। সুবোধ হেসে তার উত্তর দেয়। পরমুহূর্তেই গ্লাসে চুমুক দিয়ে চোখ তুলে সে দেখে মেয়েটি তার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছে। মেয়েটি কালো, মোটা থলথলে বয়স ত্রিশের এদিক ওদিক। মেয়েটি বলে—বাব্বাঃ তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু খাওয়াও তো।

কোনো কোনো বন্ধুর কাছে এদের কথা শুনেছে সুবোধ। তাই অবাক হয় না। মেয়েটির জন্যও এক পেগের হুকুম দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে—তোমার ঘর কোথায়?

—কাছেই। যাবে?

—মন্দ কী?

—তবে আরো দু পেগের কথা বলে দাও। তাড়াতাড়ি বলো। এরপর বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবোধ আরো দু পেগের কথা বলে দিয়ে হাসল—মদ খাও কেন?

—তুমি খাও কেন?

—আমার বউ চলে গেছে?

—আমারও স্বামী চলে গেছে। বলেই মেয়েটি ভ্রু কুঁচকে বলে—শোনো ঘরে যেতে কিন্তু ট্যাক্সি করতে হবে। হেঁটে যেতে নেশা থাকে না।

—ট্যাক্সি! হাঃ হাঃ। বলে হাসল সুবোধ। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। বলল—আমার বৌয়ের গল্প তোমাকে শোনাবো আজ—

—খুব ছেনাল ছিল?

—না না। ছেনাল নয় তবে অন্যরকম—

—চলে গেল কেন?

—সেটাই তো গল্প।

—ওরকম আকছার হচ্ছে। তোমার বৌয়ের দুঃখ আমি ভুলিয়ে দেবো।

—দুঃখ! বড় অবাক হল সুবোধ। দুঃখের কোনো ব্যাপারই তো নয় নীলার চলে-যাওয়াটা! তবু নেশার ঘোরে এখন তার মনটা হু-হু করে উঠল। দুঃখিত মনে সে মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ খুব দুঃখের গল্প—

—কেটে যাবে। বিলটা মিটিয়ে দাও।

বিল মেটাল সুবোধ। তারপরও গোটা ত্রিশেক টাকা রইল ব্যাগে। মেয়েটা আড়চোখে দেখে বলল—তুমি কি আমার ঘরে সারা রাত থাকবে?

—মন্দ কী ? সুবোধ হাসল।

—ত্রিশ টাকায় হবে না কিন্তু।

—হবে না ?

—হুম। বলো না, এই বাজারে···ত্রিশ টাকায় ঘণ্টা দুই, তার বেশী না।

—না। ত্রিশ টাকায় সারারাত।

—পাগল !

—তবে কেটে পড়ো। আমি কেরানীর বেশী কিছু না।

দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। গ্লাস নিঃশেষ করে আঁচলে মুখ মুছল। বলল—মদ খাওয়ালে, ভালবাসলে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

—কেটে পড়ো।

—ঠিক আছে। চলো। ত্রিশটাকাতেই হবে। আহা, তোমার বৌ চলে গেছে—না ? ঠিক আছে, চলো তো দেখি তোমার বৌ ভাল না আমি ভাল। বলতে বলতে সুবোধকে হাত ধরে টেনে তুলল মেয়েটা।

ট্যাক্সিতে সুবোধ মেয়েটির কাঁধে মাথা রেখেছিল। সস্তা প্রসাধন আর তেলের মিশ্রী গন্ধ। তবু মুখ সরিয়ে নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। মেয়েটি ট্যাক্সিওয়ালাকে নানা জটিল পথে নিয়ে যেতে বলছে। কথা আর কথায় বুক ভরে আসছিল সুবোধের। সে অনর্গল কথা বলছিল—নীলার কথা, কাল রাতের স্বপ্নের কথা, মেজদার কথা, মরা মেয়েটার কথা। কখনো সে বলছিল সে এবার বেড়াতে যাবে হরিদ্বারে, যাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, ফুটবল ম্যাচ দেখবে। একা একাই থাকবে সে। মেয়েটি কোনো কথাতেই কান দিল না। শুধু মাঝে মাঝে বলল—শুয়ে পোড়ো না বাপু গায়ের ওপর। পুরুষ মানুষগুলো যা ন্যাতানো হয়, একটু দুঃখটুঃখ হলেই গড়িয়ে পড়ে। কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না সুবোধ ! দুঃখ ! দুঃখ কিসের ! মেয়েটি জানেই না তার মন রঙীন একখানা রুমালের মতো উড়ছে।

ট্যাক্সি যেখানে থামল যে জায়গাটা সুবোধ চিনল না। শুধু টের পেল গোলকধাঁধার মতো খুব জটিল প্রকাণ্ড একটা বাড়ির মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছে। অনেক সিঁড়ি, সরু বারান্দা, আবার সিঁড়ি—বিচিত্র অচেনা লোকজন, মাতাল, বেশ্যা, ফড়ের গা ঘেঁষে মেয়েটি তাকে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে নীলার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। অথচ, জানে না দুঃখই নেই আসলে। ভেবে সে হাসল—ভাল জায়গায় থাকো তুমি—কি যেন নাম তোমার !

মেয়েটি বলল—অনিলা।

হাসল সুবোধ—চালাকী হচ্ছে?

—কেন?

—আমার বৌয়ের নাম তো নীলা।

—ওমা! তাই নাকি! বলোনি ত!

—বলিনি?

—না। মাইরী……

চালাকী হচ্ছে? অ্যাঁ।

মেয়েটি হাসে—সত্যিই আমি অনিলা। তোমার বৌয়ের উল্টো। দেখো প্রমাণ পাবে। খুব সুন্দরী ছিল তোমার বৌ? ফর্সা?

—না। কালোই। মন্দ না।

—খুব কালো?

—না। শ্যামবর্ণ। এই আমার গায়ের রঙ।

—ওমা। তুমি তো ফর্সাই!

—যাঃ—হাসল সুবোধ। লজ্জায়।

ঘরখানা ভালোই। ছিমছাম। বসতে ঘেন্না হয় না। পরিষ্কার বিছানাটাই আগে চোখে পড়ল সুবোধের। ভারী মাথা নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল—মদ খেয়ে কিছু হয় না। উত্তেজনা লাগছে না।

—আর খাবে।

—না। পয়সা নেই।

—পয়সা না থাক, ঘড়ি আংটি আছে। জমা রেখে খেতে পারো পরে পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে।

—না। আর খেলে ঘুম পাবে, বমিও হবে।

—তবে থাক।

সুবোধ মেয়েটিকে অনাবৃত হতে দেখছিল। হঠাৎ কি খেয়াল হল, জিজ্ঞেস করল—আজ কি তোমার আর খদ্দের আছে? তাড়াতাড়ি করছ কেন?

মেয়েটি হাসল—আছে। কিন্তু তাতে তোমার কি! তোমাকে আলাদা বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে রাখবো। তুমি টেরও পাবে না।

—প্যাবো না?

—না।

মেয়েটি কাছে আসে। আস্তে আস্তে উঠে বসে সুবোধ—তুমি তো অনিলা!

—হু।

—দূর। তাহলে হবে না। বলে হাই তোলে সুবোধ।

—কেন?

সুবোধ উত্তর দেয় না! অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকে। নীলা! নীলা এখন কোথায়। তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খায়। পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ পুরুষ। তার মধ্যে নীলা একা কোথায় চলে গেল? কী করছে এখন নীলা?

মেয়েটি বলে—আমার দিকে তাকাও। দেখ না আমাকে।

সুবোধ গরুর মতো নিরীহ চোখে তাকায়। হাসে। বলে—দূর। তোমার দ্বারা হবে না।

—কেন?

—তুমি তো পরিষ্কার মেয়ে। কিচ্ছু লুকোনো নেই তোমার। তোমাকে একটুও সন্দেহ হয় না।

—বাঃ। তা তুমি চাও কি?

—সন্দেহ করতে। বলতে বলতে হাসে সুবোধ। হেসে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

বয়স

তখন দিন সুরু হত স্মৃতিশূন্য ভাবে। অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনোটারই কোনো ভার ছিল না। দিনটা নতুন তামার পয়সার মতোই আদরের ছিল, প্রত্যেকটা দিনই ছিল উৎসবের মতো। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে ঘুম ভাঙত। দাঁত মাজতে কী যে আলিস্যি। উঠে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়লেই পৃথিবীর আদিমতম গন্ধটি পাওয়া যেত তখন। ঘাস, গাছপালা আর মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধ। পূবে রোদের মুখ লাল, পশ্চিমে, আমাদের লম্বা ছায়া। চারদিকে মাটি, গাছপালা, পৃথিবী। পৃথিবী কেমন তা অবশ্য জানা ছিল না। শোনা ছিল, নীচে এক গভীর জলাশয় আছে, তার ওপর জাহাজের মতো ভাসছে পৃথিবী। সতুয়ার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মপুত্র আড়াই প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে পৃথিবীকে, গারো পাহাড় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। মিসিসিপি আর মিসৌরীর কথা সে কখনো বিশ্বাস করত না। ম্যাপ দেখালে হাসত। বলত— ওসব হচ্ছে সাহেবদের কথা। ওসব কি বিশ্বাস করতে আছে? যারা খেয়ে হাত প্যাণ্টে মোছে, দাঁত মাজে না—অ্যাঃ।'

দিন সুরু হত দুঃখের সঙ্গেই। পড়াশুনো। কালী চক্রবর্তী বারোমাস কফের রুগী, কম্ফর্টারটা গামছার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কণ্ঠমণি আমরা কখনো দেখিনি। মুঠ মুঠ মুড়ি মুখে দিয়ে সুরুৎ সুরুৎ চা টেনে নিতেন ভিতরে, বলতেন—আঃ। তাঁর আঙুলের ডগা থেকে সরল, সাঙ্কেতিক আর সুদকষা ঝরে পড়ত। সব সময়ে উবু হয়ে বসতেন, অর্শ বা ভগন্দর কিছু একটা ছিল বলে বসতে পারতেন না। তাঁর গা থেকে একটা শশা-শশা গন্ধ আসত। স্নান বারণ ছিল বলেই বোধহয় ঘাম বসে একরকম গন্ধ ছাড়ত।

বাঁশের জানালাটা লাঠি দিয়ে ঠেলে তোলা। পাশেই উত্তরে ছোট্ট একটু জমি, তারপর শওকত আলির বাড়ি। যুবা শওকত আলি সেই জমিতে সকালের মিঠে রোদে কসরৎ করছে। তুর্কী লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে শরীর উল্টে ঝপ করে নেমে আসত প্রথমটা। সেই শূন্যের ডিগবাজী ছিল দেখবার মতোই। এত সহজে করত যেন মনে হত ওরকম করাটাই যে কোনো মানুষের নিত্য ক্রিয়া। তারপর লাঠির কসরৎ। লোকে বলত, শওকত

লাঠি ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকায়। আমরা অবশ্য ছোটো ছোটো ঢিল ছুঁড়ে দেখেছি, সেগুলো টুকটাক ছটকে পড়ে। গায়ে লাগে না। আমরা ভূগোল পার হয়ে ইতিহাসের পড়া দিতে দিতে আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম ভুল করতামই। বার বার ম্যাসিডনের নৃপতি…ম্যাসিডনের নৃপতি ছিলেন… অ্যাঁ…ম্যাসিডনের…" মনে পড়ত না। কারণ বাইরে শওকতের স্যাঙাৎ নিধে তখন এসে গেছে। ছোটো দুখানা কাঠের ছুরি নিয়ে দুপক্ষ ঘুরে ঘুরে বলছে 'শির, তামেচা, বাহেরা, কোটি, ভাণ্ডা, উর্ধ্ব…শির তামেচা বাহেরা, কোটি ভাণ্ডা উর্ধ্ব…' মাথা থেকে শুরু করে সারা শরীর জুড়ে আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। ছোরা খেলার নামতা আমাদের ঐভাবেই মুখস্থ হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারের বাবার নাম মনে পড়ত না।

শওকত আলির ছিল একটা ম্যাজিকের ঘর। সে ঘরে ঢোকা বারণ ছিল; কিন্তু আমরা জানতাম। সে ঘরে মড়ার মাথার খুলি আছে, আর আছে হাতের হাড়—যাদুদণ্ড। পুরোনো পুঁথির মতো যাদুর বই। বাইরের ঘরে একটা বাঘছাল, দেয়ালে টাঙানো, মাথাশুদ্ধ। চিতাবাঘের ছাল। সেবার মাদপুরে বাঘটা এসে এক মাঘমাসে উৎপাত সুরু করে। একটা কুকুরের মতো ছোটোখাটো বাঘ, তবু তার দাপটেই বাহেরা অস্থির হয়ে গেল। জোতদার দলুইয়ের গাদা বন্দুক তার গায়ে আঁচড়ও কাটল না। সে এসে গঞ্জে খবর দিল। শৌখীন শিকারীরা ছুটির দুপুরে বন্দুক কাঁধে চলল। শওকত আলীর বন্দুক ছিল না। বশংবদ লাঠিগাছ কাঁধে নিয়ে সেও চলল বীটারদের সঙ্গে। মাদপুরের ধানক্ষেত পার হলে জঙ্গল, জল। সেখানে টিন আর ক্যানেস্তার চোটে বিস্তর পাখী উড়ে গেল। বন্দুকের শব্দ ধুন্ধুমার। বাঘ আর বেরোয় না। একা শওকত আলী জঙ্গল ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে এক গর্তের মধ্যে দুটো বাচ্চা সমেত মাদী বাঘটাকে ঘুমোতে দেখতে পেল। দেখে অবাক। এইটুকু বাঘ গরু মোষ মারে! সদ্য-বিয়োনী সেই বাঘ একবার শওকতকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে ঠিক বেরালের মতো শব্দ করে। বাঘটাকে ছোট্ট দেখেই শওকত আলি তার লাঠির ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যায়। সেই লাঠি নিপুণভাবেই চালিয়েছিল শওকত আলি কিন্তু বাঘটা কেবল একটা ছোট্ট চকিত লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল। নিঃশব্দে। একটা চড়ে কোথায় গেল লাঠি। বাপরে বলে শওকত আলি জান বাঁচাতে হাতের লড়াই সুরু করে। সমস্ত গা ফালা ফালা করে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ছিঁড়ে ফেলছিল বাঘ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

শিকারীরা দৌড়ে এসেছে, হাতে বন্দুক কিন্তু কিছু করার নেই। গুলি যে কারো গায়ে লাগতে পারে। গলা টিপে অবশেষে মেরেছিল শওকত আলি বাঘটাকে। গভর্নমেণ্ট থেকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার আর চিকিৎসার খরচ দিয়েছিল। স্কুল ছুটি ছিল একদিন। সোনারূপোর গোটাকয় মেডেল আর মানপত্র দেওয়া হয়েছিল তাকে। সে সবই বাইরের ঘরে আলমারিতে সাজানো। আলমারির পাশের দেওয়ালে একটা বেতের ঢাল, তার পিছনে দুখানা সত্যিকারের তরোয়াল ছিল। মাঝে মাঝে সেগুলোতে তেল মাখতে খাপ থেকে বের করে আমাদের ডাকত সে। আমরা সর্বস্ব ফেলে তরোয়াল দেখতে যেতাম। গঞ্জে শওকত আলিকে সবাই খাতির করত।

সেবার চা-বাগান ঘুরে ছেঁড়া পাতলুন পরা ম্যাজিসিয়ান প্রোফেসর ভট্টাচার্য গঞ্জে এসে হাজির হল। ডাক্তার শশধর হালদারই তখন গঞ্জের সবচেয়ে বড়লোক। ফোঁড়া কাটতে ভয় পেতেন দারুন, একমাত্র ইঞ্জেকসনেই ছিল তার হাতযশ। ব্যথা লাগত না যে তা নয়। এমন কি রুগীর যে রকম মুখ বিকৃত হত ব্যথায়, তারও সেরকম হত। তবে ইঞ্জেকসনটা খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারতেন, এবং তারপর ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলতেন। ডাক্তারীর চেয়েও তার প্রসার ছিল ওষুধের ব্যবসায়, আর গরুর দুধে! সাত সের দুধ দেয় এমন গরু আমরা তার বাড়িতেই প্রথম দেখি। গঞ্জে গণ্যমান্য লোক এলে তার বাড়িতে ওঠাই ছিল রেওয়াজ।

বড একখানা টিনের গুদামঘর ছিল সেই গঞ্জের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তার একধারে বাজুরিয়াদের সিমেণ্টের বস্তা, ত্রিপল, কাঠ আর বাঁশের স্তূপ। অন্য ধারে কাঠের তক্তা জুড়ে মঞ্চ। টিনের চেয়ারে সামনে দিকে বসতেন গণ্যমান্যরা, তাদের সামনে বিছানো ত্রিপল আর শতরঞ্চীতে বাচ্চারা, পিছনে বেঞ্চ-এ পাবলিক। প্রোফেসর ভট্টাচার্য প্রথমদিকে এলেবেলে খেলা দেখালেন। পিস্তল ছুঁড়ে ধোঁয়ার ভিতর থেকে ভারতমাতার আবির্ভাব দেখে পাবলিক আর বাচ্চারা খুব হাততালি দিল। তারপর বাক্সবন্দী খেলা, কঙ্কালের জলপান, শূন্যে ভাসমান মানুষ। ক্লাস সিক্সের দিলীপকে ডেকে নিয়ে অদৃশ্য করে দিলেন। আধঘণ্টা পর খেলার মাঠের গোলপোস্টের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তাকে পাওয়া গেল। এ সব দেখে গণ্যমান্যরা হাততালি দিতে লাগল। প্রোফেসর ভট্টাচার্য বার বার বলতে লাগলেন—

এই পুওর বেলীটার জন্য ডোর টু ডোর বেগিং করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে···

এই পুওর বেলীটার জন্যে… এইসব বললেন আর মড়ার হাড় নেড়ে সব আশ্চর্য খেলা দেখাতে লাগলেন। সব শেষে চ্যালেঞ্জ। যদি কেউ থাকেন যিনি প্রোফেসর ভট্টাচার্যের সব খেলা দেখাতে পারবেন, তবে ভট্টাচার্য তাঁকে একশ টাকা দেবেন, যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে না পারেন তবে তাঁকে একশত টাকা দিতে হবে।

শওকত আলী টিনের চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি পারি।

পরদিন সকালেই প্রোফেসর ভট্টাচার্য হাওয়া হয়ে গেলেন। কিন্তু শওকত আলী সব খেলা দেখাল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এমন কি নন্তুকে ডেকে হিপনোটাইজ করে তাকে দিয়ে এমন সব শক্ত শক্ত অঙ্কের উত্তর করিয়ে নিল যে, কালীমাস্টার মশাই পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেলেন। নন্তু সাতঘরের নামতাও পারে না যে! সবশেষে নন্তুকে শওকত আলী বলেছিল—সাবধান, কাউকে ছুঁয়ো না, তুমি কিন্তু কাচের তৈরী। সেই ঘোর নন্তু পরের সাত দিনেও কাটাতে পারেনি। খেত ঘুমোতো খেলত, কিন্তু কেউ ছুঁতে গেলেই আঁৎকে উঠে চেঁচাত—ধোরো না, ধোরো না আমাকে, আমি কাচের তৈরী।

দিন সুরু হত। কালী মাস্টারমশাই বেলা করেই পড়িয়ে উঠতেন। আইবুড়ো মানুষ। গঞ্জে কী করে যে কবে এসে পড়েছিলেন কে জানে। নন্তুদের বাড়ি সকাল বেলাটায় খেয়ে স্কুল সেরে বিকেলে সাধনদের পড়িয়ে রাতে শশধরবাবুর বাড়িতে খাওয়া সেরে ওদের বাইরের ঘরের একধারে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। আমাদের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সুরু হত, শেষ হতে চাইত না। কালীমাস্টার চলে গেলে দুই লাফে বাইরে গিয়ে পড়তাম। বই খাতা গুছোনোর জন্য দিদি পড়ে থাকত। বাইরে তখন সকালের প্রথম বনজ গন্ধটি আর নেই। শওকত আলীর কসরৎ শেষ হয়ে গেছে। মাঠ ফাঁকা। তবু পৃথিবীতে করণীয় কিছুর শেষ ছিল না। মড়ার হাড় খুঁজতে শেলীদের বাড়ির পিছনে পোড়ো মাঠটাতে চলে যেতাম।

সেই মাঠে পশ্চিমাদের বয়েল গাড়ির বড় বড় বলদগুলো চরে বেড়াত। কাঁধে ঘা। সেই ঘা খুঁটে খাচ্ছে কাক। সেখানে হাড় পাওয়া যেত বিস্তর। কিন্তু সাধন বলত—ও হাড় ছুঁসনি, ভাগাড়ের গো হাড়। সেই মাঠ পার হলে নদীর ধারে ছিল শ্মশান। শরৎকালে শ্মশানের দিকটায় কাশ ফুলে ঢেউ দিত।

কিন্তু শ্মশান পর্যন্ত যেতে সাহস হত না। সেই মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা দূর থেকে শ্মশান দেখতাম। ভয় করত। মানুষের হাতের হাড় পাওয়া হয়নি।

দূর থেকেই দেখতাম বাবুপাড়ার রাস্তা দিয়ে শচীন আর শেলী গোবরের ঝুড়ি হাতে ফিরছে। শচীনরা ছিল তিন বোন আর এক ভাই। পিকলি, বিউটি, শচীন, শেলী। শচীনের বোনদের এইসব সাহেবী নাম রেখেছিলেন তার বাবা। একসময়ে শচীনরা ছিল গঞ্জের বড়লোক। তার বাবা কাছেপিঠের এক চা-বাগানের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। বন্দুক ছিল, ঘোড়া ছিল। বাড়িখানাও ছিল বাংলো প্যাটার্নের। তার ছিল দুই বিয়ে, অনেককাল সেটা জানা যায়নি। আগের পক্ষের ছেলেরা সব বড় বড়। সেবার শচীনের বাবা কালাজ্বরে মারা গেলে, আগের পক্ষের ছেলেরা এসে সব সম্পত্তি দখল করে। কলকাতায় তাদের বাড়ি ছিল বলে কেবল গঞ্জের বাড়িখানা ছেড়ে দেয়। শচীনরা গরীব হয়ে গেল। পিকলি, বিউটি আর শেলী লেস্-এর জামা পরা, রুজ পাউডার মাখা, অর্গান বাজিয়ে গান গাওয়া, কিংবা জন্মদিনে পার্টি দেওয়া—এ সব ভুলেই গেল। বাড়িখানা এখন রঙচটা, কোথাও দেয়ালের ইট বেরিয়ে আছে, বাগানের ভিতরে মোরমের বাহারী রাস্তাটায় গর্ত, সকাল থেকেই শচীন আর শেলী গোবর কুড়োয়, কাঠপাতা কুড়োয়। তার মা একসময়ে জর্জেটের শাড়ি পরত, এখন লজ্জার মাথাখেয়ে বাজুরিয়াদের বাড়ি আয়ার কাজ করে। বাজুরিয়াদের এক ছেলে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে এনেছিল। বাজারের ভিতরে তাদের পৈতৃক বাড়িতে সেই মেম-বৌয়ের ঠাঁই হয়নি বলে হাইস্কুলের পিছনদিকে চমৎকার একখানা বাড়ি করে সেইখানে থাকত। সেই বাড়িতেই যেত শচীনের মা। পিকলি আর বিউটি একসময়ে কারো সঙ্গে মিশত না। ঘরে তাদের ব্যাগাটেলি, ক্যারম, লুডো কত কী ছিল, ভাইবোনরা সেসব নিয়ে থাকত। এখন সেই দুবোন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে এর ওর তার নিন্দে মন্দ করে। কেউ তাদের বসতে বলে না। তাদের চরিত্র নিয়ে কথা ওঠে। শচীন ক্লাসে ফার্স্ট হয়। হেডমাষ্টার এমদাদ আলি বিশ্বাস নিজের পকেট থেকে তাকে বই কেনার খরচ দেন। বলেন, গরীবরাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের যোগ্য।

ছোটো ছোটো ঝুপসী লিচুগাছের ঘন ছায়ার ভিতর দিয়ে পথটি গেছে। বইখাতা হাতে সেই পথ ধরে যেতে যেতেই হঠাৎ শুনতে পেতাম দূর থেকে ইস্কুলের ঘণ্টার শব্দ। ওয়ার্নিং। সাধন বলত—দৌড়। এমদাদ আলি

বিশ্বাস এ সময়টায় গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। টর্চবাতির মতো তাঁর চোখ জলে। আমরা দৌড়তাম!

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে সেই ইস্কুলে। মাস্টারমশাইরা আছেন, দিদিমণিরাও আছেন। মেয়েরা ক্লাসে বসে থাকে না তারা থাকে মেয়েদের কমনরুমে। মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণিদের সঙ্গে ক্লাসের সুরুতে লাইন বেঁধে আসে, আবার ক্লাসের শেষে লাইন বেঁধে ফিরে যায়। ছেলেদের দিকে তাকানো বারণ। কথা বলা তো দূরের কথা। দিদি এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত, ফেল করে আমার সঙ্গে পড়ে তখন। ক্লাসে আমি পড়া না পারলে একমাত্র সে-ই আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে থাকত। বিশ্বাস সাহেবের দাপটে তখন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

সেবার শহরের ইস্কুলের টিম ফুটবল খেলতে আসে। এইট-এর কামু দারুন খেলেছিল। শহরের টিম দুই গোল খেয়ে গেল। ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ বলে কোনো প্রাইজ ছিল না। তবু বিশ্বাস সাহেব কামুদার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আদর করলেন এবং ঘোষণা করলেন—কামুদাকে তিনি রুপোর মেডেল দেবেন। খেলার শেষে আমরা কামুদাকে ঘিরে ধরলাম। কামুদা বাড়ি ফেরার সময়ে বলল—বিশ্বাস সাহেবের গায়ে যা সুন্দর আতরের গন্ধ না রে!

পরদিন হৈ-হৈ কাণ্ড। সারা ইস্কুলের দেওয়ালে সব অসভ্য কথা লেখা। কমনরুমেই বেশী। শহরের ফুটবল টিম ইস্কুলবাড়িতেই রাত্রিবাস করে সকালে ফিরে গেছে। সবাই বলল—এ ওদেরই কাজ। দু গোল খেয়ে রাগের চোটে এসব করে গেছে। কিন্তু তবু আমাদের ইস্কুলের কোনো ছেলে এ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য এমদাদ আলি বিশ্বাস ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ডিকটেশন দিলেন— মনোজ মাংস মুখে দিয়া মুখ মুছিয়া মালদহ মুখে যাত্রা করিল। এই বাক্যটা আমরা সবাই খাতায় লিখে, সেই পাতায় নাম ক্লাস রোল নম্বর দিয়ে পাতাটা ছিঁড়ে বিশ্বাস সাহেবকে দিয়ে দিলাম। ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে। কিন্তু কারো কিছু হল না। আমরা সেই বাক্যটার মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো অসভ্য কথা পেলাম না। বিশ্বাস সাহেব তবে কেন ঐ অদ্ভুত বাক্যটা আমাদের দিয়ে লেখালেন? দেয়ালের কথাগুলো আমরা দেখিনি। তবে অনেকে বলল বেশীর ভাগ অসভ্য কথাই 'ম' দিয়ে লেখা। সাধন সেদিন সন্ধ্যেবেলা এসে বলল—মাংস মুখে দিয়ে কেউ মুখ মোছে নাকি! না আঁচালে এঁটো থেকে যায় না?

বিকেলটা ফুরোতো সবার আগে। পূর্ণিমা থাকলে খেলা শেষ হতে না হতেই চাঁদ উঠে পড়ত। বিকেলটা শেষ হয়ে যাক এরকম ভাবতে ভাল লাগত না। দরগার পিছনে চাঁদমারির মতো উঁচু একটা ঢিবি ছিল। আমরা সেটার ওপর উঠে বসতাম। সাধন, দীপু, প্রদীপ, নন্তু, কোনো কোনো দিন সতুয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু তালগাছ আছে তাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়ে, সে গাছ শুইয়ে দিলে পৃথিবী ছাড়িয়ে আধ হাত বেরিয়ে থাকবে—এই গল্প বলত সতুয়া। সেই তালগাছ থেকে তাল পড়লে নাকি আশপাশের দশ বিশটা গ্রামে ভূমিকম্প হয়। এক একটা তালের ওজন বিশমন। দীপু বয়সে প্রায় আমার সমান। কিন্তু সে দৌড় ঝাঁপ তেমন করতে পারত না। একটু খেলেই হাঁফিয়ে পড়ত, মারপিট লাগলে বরাবর সে মার খেত। তারপর কাঁদতে বসত। বসত—ম্যালেরিয়া না হলে তোদের দেখে নিতুম। সে সবসময়ে আমার পাশ ঘেঁষে বসত, এবং বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করত। সেই ঢিবির ওপর থেকে দেখা যেত, শেলীদের বাড়ির পিছনের মাঠে সূর্য ডুবে গেলে কেমন দুখানা আকাশজোড়া পাখনা মেলে অন্ধকার উঠে আসছে। সেই দিকে চেয়ে ক্ষণস্থায়ী বিকেলের জন্য খুব দুঃখ পেতাম। নীল সমুদ্রে চাঁদ সাঁতরে চলত অবিরাম। খেলার শেষে আমরা সেই ঢিপির ওপর বসে আরো কিছুক্ষণ বিকেলের আলো দেখার চেষ্টা করতাম। সন্ধ্যে উৎড়ে ফিরলেও আমার তেমন ভয় ছিল না। বাবা বারমুখো লোক, মা রোগাভোগা। আমাদের বাড়ির শাসন তেমন কঠিন নয়। সবচেয়ে বেশী শাসন ছিল প্রদীপের। তার বাবা দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন সাহিত্যিক। অল্প বয়সেই মারা যান। প্রদীপের মা নানারকম হাতের কাজ শিখে গঞ্জে মহিলা সমিতির দিদিমণির চাকরি পেয়ে কলকাতা থেকে চলে আসেন। শোভনা দিদিমণি রোগা কালো মানুষ ঠোঁটে একটু শ্বেতীর দাগ, খুব নিয়ম মেনে চলতেন। প্রদীপ কড়া শাসনে থাকত। তার এক বড় ভাই আছে—সুদীপ। সে মার সঙ্গে আসেনি। কলকাতায় মাসীর কাছে থেকে ইস্কুলে পড়ে। সন্ধে হলেই প্রদীপদের বাসায় তার বাবার বড় করে বাঁধানো ছবির সামনে দীপ জ্বলে, ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হয়, ফুলের মালা দেওয়া হয় ছবিতে। প্রদীপ তাদের বাড়িতে যত্নে রাখা মাসিক পত্রিকা বের করে আমাদের দেখাত। শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীর নাম ছাপা গল্প আর কবিতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তাঁর লেখা একটা কলের কোকিলের

গল্প ছিল। কিছু বুঝিনি। প্রদীপ বলত—বাবার লেখা বুঝতে হলে মাথা চাই। আমার মা-ই কত লেখা বোঝে না। গঞ্জের সবাই তাদের খাতির করত। যদিও দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা কম লোকই পড়েছে। শোভনা দিদিমণি তাঁর স্বামীর কথা উঠলেই চোখ আধবোজা করে রাখতেন। সেই চোখের পাতার গভীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল জন্ম নিত। কিন্তু অন্য সময়ে তিনি ছিলেন ভীষণ কড়া। প্রদীপকে কখনো আদরের কথা বলতেন না। উঠতে বসতে খেতে শুতে সময় বাঁধা ছিল। বিকেলের দিকটায় দিদিমণির ফিরতে দেরী হত বলে সেই সময়টুকুতে চাঁদের আলোয় চাঁদমারির মতো উঁচু ঢিবিটায় সময় চুরি করে সে আমাদের সঙ্গে খানিক বসে থাকত। বলত—আমি একদিন পালাব, দেখিস। লোকের বাড়ি বাসন মাজব, ঘর ঝাঁট দেব, তবু পালাব। কথার মাঝখানে দীপু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলত, রন্টু, ঐ দেখ তোর বাবা আজও আবার লোক এনেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম ঠিকই। দরগার সামনে লিচু বাগানের ভিতর থেকে রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে সেই জায়গাটা পার হয়ে গল্প করতে করতে বাবা আসছে, সঙ্গে একটা খাকীর হাফ-প্যান্ট পরা লোক, মাথায় হ্যাট। কোথা থেকে যে ধরে ধরে বাবা অতিথি নিয়ে আসত কে জানে। সপ্তাহে তিন চার দিনই বাইরের অচেনা লোকেরা এসে পাত পারত আমাদের বাসায়। মা রাগ করলে বাবা উদার গলায় বলত—অতিথি খেলে বাড়ির মঙ্গল হয়, মানুষের পায়ের ধুলোয় কত জায়গা তীর্থ হয়ে গেল। মা তখন ঝোঁকে বলত—তা অসময়ে লোক এলে যে আমাদের হরিমটর করতে হয়। বাবা শান্ত গলায় মিন মিন করে বলত—তিথি মেনে যে না আসে সেই তো অতিথি। যারা আসত তাদের মধ্যে ভবঘুরে, চোর, জ্যোতিষী সব রকমের মানুষ ছিল। এ সব লোক আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এই হাফ-প্যান্ট আর হ্যাটওলা লোকটা আসার আগে যে এসেছিল, সে এক সকালে চলে গেলে দেখা গেল একটা পেতলের ঘটি, বিছানার চাদর, এক জোড়া চটিজুতো সে নিয়ে গেছে। এরপর মা রাগারাগি করায় বাবা আর লোক আনত না। কেবল একা খেতে বসে দুঃখ করে বলত—আমাদের দেশের বাড়িতে প্রতি বেলা একশ খানা পাত পড়ে। বিদেশে চাকরি করতে এসে দেখ কেমন একা একা খেতে হয়। একা খেলে আমার পেট ভরে না। সেই চুরির পর অনেকদিন বাদে লোক এল। দীপু আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল— মামীমা আজ কুরুক্ষেত্র করবে। চল্ দেখি

গিয়ে—! শুনে আমি তাকে একটা গাট্টা মারি, বলি আমার মা বাবার ঝগড়া দেখবি কেন? সে কাঁদতে থাকে।

খাকী হাফ-প্যাণ্ট পরা লোকটা ছিল গায়ক। মোটা মোটা নাদুস নুদুস চেহারা, গালে পানের ঢিবি। বাবার একখানা লুঙ্গি পরে নিয়ে দিদির সিংগিল রীডের হারমোনিয়ামটা নিয়ে সে বারান্দায় চাঁদের আলোয় শতরঞ্চী পেতে বসে গাইতে লাগল—ভুলিনি, ভুলিনি, ভুলিনি প্রিয়, তব গান সে কি ভুলিবার···! বাবা শুনতে শুনতে আধশোয়া হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে উদাস হয়ে গেল। মা নতুন করে রাঁধতে বসেছে। সেই ফাঁকে দেখি উত্তরের মাঠে নালীর ধারে শওকত আলি হ্যারিকেন জেলে মুর্গী জবাই করতে বসেছে। মুর্গী কাটা দেখতে চুপে উঠে গেলাম। ভুলিনি···ভুলিনি···গানের সাথে মুর্গীটার প্রাণান্তকর ডাক মিশে যাচ্ছিল। আকাশে জ্যোৎস্নার বান।

লোকটার নাম আমরা দিলাম ডি ও সান্যাল। আমাদের বাড়ির অতিথিরা দু রকমের ছিল। কিছু লোক ছিল যারা একবার এসে সেই যে চলে যেত, আর আসত না। আর কিছু লোক ছিল যারা ঘুরে ফিরে আসত। এই লোকটাকে দেখে মনে হল, এ দ্বিতীয় দলের। কাজেই এর একটা নাম দেওয়া দরকার। বাবা তাকে সান্যাল, সান্যাল বলে ডাকে, নাম টের পাই না। সান্যাল আরো একজন আমাদের বাড়ীতে আসে। সে ফোকলা। এ-লোকটার দাঁত আছে তাই তার নাম দেওয়া গেল, দাঁতওলা সান্যাল। সংক্ষেপে ডি-ও। ফোকলা জনের নাম এফ সান্যাল আগেই দেওয়া ছিল। পরদিন সকালে কোন সময়ে যেন বাবার চটিজোড়ায় আমার পা লাগলে লোকটা বলল খোকা, বাবার চটিতে পা লাগলে প্রণাম করবে। তারপর সে মার রান্নার প্রশংসা করল। আমাকে শংকরা আর বেহাগের পার্থক্য বোঝাতে লাগল। দুদিন গানে গানে আমাদের মাথা গরম হয়ে রইল। কালীমাস্টার মশাই পর্যন্ত একদিন কামাই করলেন। তারপর লোকটা চলে গেল। শুনলাম সে যুদ্ধে যাচ্ছে। ডি, ও সান্যাল আর কোনোদিনই ফিরে আসেনি।

হিটলারের হাতে ইংরেজ তখন বেজায় মার খাচ্ছে। তার ফলে চারদিকে বেকার আর ভবঘুরে বেড়ে গেল খুব। চাল-ডাল পাওয়া যায় না, কেরোসিন নেই, দেশলাইয়ের আকাল। মার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকে। দেশ থেকে সেই সময়ে বাবার দুচারজন জ্ঞাতি, আর তাদের আত্মীয়েরা এসে আমাদের

বাসায় থানা গাড়ল। তারা শুনেছে যুদ্ধের বাজারে ধূলো বেচে অনেকে বড়লোক হচ্ছে। তারাও সব কারবার কণ্ট্রাক্টরি করার জন্য চলে এসেছ কিন্তু ঘাঁত ঘোঁত জানা না থাকায় বেমক্কা সারাদিন ঘোরে, রাতে ঘরে বসে জটলা পরামর্শ করে। বাবা অনেকদিন থেকেই সিগারেট ছেড়ে স্বদেশী বিড়ি ধরেছে। জ্ঞাতিরা আসার পর সেই বিড়ি প্রায়ই চুরি হতে লাগল। বাবা কিছু বলতে পারে না কাউকে। তাড়ানো তো দূরের কথা। আমাদের ভাতের ফ্যান গালা বন্ধ হয়ে গেছে তখন। বাসায় অঙ্ক কষতে আর কাগজ নষ্ট করি না, শ্লেটে কষে মুছে ফেলি, স্কুলে উঁচু ক্লাসে শ্লেট অ্যালাউ করলেন বিশ্বাস সাহেব। বাড়িতে মা বাবার কথাবার্তা বন্ধ। শোনা গেল শওকত আলি যুদ্ধে যাবে। আমরা কদিন খুব উত্তেজিত হয়ে রইলাম। শওকত আলি লাঠি দিয়ে গুলি ঠেকায়, হাতে বাঘ মারে, মানুষকে সম্মোহিত করে দেয়, সে যুদ্ধে গেলে একটা হেস্ত নেস্ত হবেই।

জ্ঞাতিদের জ্বালায় মার প্রাণ ওষ্ঠাগত। দিনে পঞ্চাশবার উনুন থেকে কাগজ জ্বেলে তাদের বিড়ি ধরিয়ে দিতে হয়। দেশলাই নেই। মা প্রকাশ্যে রাগারাগি শুরু করে। জ্ঞাতিরা তখন মাকে খুশী রাখার জন্য বিচিত্র কাণ্ড সুরু করল। কেউ মার চেহারার, কেউ মার রান্নার প্রশংসা সুরু করল। কেউ বা এর ওর বাগান থেকে চুরি চামারি করে ফলপাকুড় এনে দিত। ঘরের কিছু কিছু কাজকর্মেও আসত। বাবা ফিরলে তারা সবাই একসঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠত - কাকা এসেছেন, কাকা এসেছেন! তারপর বাবার চটি ধরে টানাটানি, জামা খুলে দেওয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি। শেষে বাবা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করার সময়ে তারা বাবার হাত পা পিঠ দাবাতে বসত, আঙুল মটকে দিত, পিঠে সুরসুরি, মাথা চুলকোনো —সবই করত। বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চেঁচামেচি করত—ওরে আর জোরে দাবাসনি, হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তারা ছাড়ত না।

জ্ঞাতিদের মধ্যে একজন ছিল পুলিস। একদিন তাকে দেখি শেলীদের বাড়ির পিছনের মাঠে ভাগাড়ে হাড় কুড়িয়ে একটা বস্তা বোঝাই করছে।

ভারী অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাল—এ সব কুড়োচ্ছেন কেন?

পুলিস ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল—চুপ। একটা কারবারের কথা মাথায় এসেছে। হাড়ে বোতাম হয় জানো তো?

—জানি।

পুলিস খুব হেসে বলল—কথাটা এতদিন একদম মাথায় আসেনি। হঠাৎ সেদিন এপাশটা দিয়ে যেতে যেতে ব্যাপারটা মাথায় এসে গেল। শুধু বোতাম না, লবন শোধন করতেও লাগে। গোরারা তো সবই কিনে নিচ্ছে, যুদ্ধে নাকি সব লাগে। কাউকে বোলো না কিন্তু, লোকে বুদ্ধি পেয়ে যাবে।

পুলিশ সেই হাড়ের বস্তা নিয়ে বাসায় ঢোকামাত্র মার উনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হয়। সন্ধেরাতে সেই হাড় পুলিসকে ফেলে দিয়ে আসতে হয়। তারপর শীতের রাতে স্নান করে ঘরে ঢোকা। সেই বস্তার মুখটা এক বার আমি একটু ধরেছিলাম। কিন্তু পুলিস খুব মহত্ত্ব দেখাল, আমার কথা মাকে বলল না। বাজারে তখন লোহার বোতাম চালু হয়েছে।

ব্ল্যাক মার্কেট কথাটা তখন শোনা যাচ্ছে খুব। পুলিস সর্দিজ্বরে পড়ে থেকে প্রায়ই বলত— এবার ব্ল্যাকমার্কেটের ব্যবসা চালু করব। কথাটার অর্থ সেও ভাল বুঝত না।

বাড়িতে জ্ঞাতিরা জড়ো হওয়ায় বাবা খুব অখুশী ছিল না। একা খেতে হত না। পেট ভরত। কিন্তু মার মূর্তিখানা দিন দিন মা কালীর মতো হয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় বোমা পড়ায় সেখানে আমার মামা-বাড়ি থেকে দিদিমা, তিন মামা, দুই মাসী চলে এল আমাদের বাসায়। মার আর কিছু বলার রইল না। বাবার মুখ উজ্জ্বল দেখাল। মামাবাড়ির লোকজন যেদিন এল সেই দিনই মা নিজে যেচে বাবার সঙ্গে ভাব করে। বাড়িতে আর জায়গা ছিল না। পড়াশুনো মাথায় উঠে গেল। আমরা সারা দিন মনের আনন্দে ঘুরি। সাধনদের বাড়িতেও লোক, দীপুদের বাড়িতেও। কেবল প্রদীপদের বাড়িতে সন্ধেবেলা সাহিত্যিক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর ফটোতে রোজ বিকেলে মালা দেওয়া হয় ধূপকাঠি জ্বলে প্রদীপ সকাল বিকেল পড়তে বসে। তার মা বলে—কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন তোমার বাবা সে কথা কখনো ভুলো না। তোমাকে বড় কিছু হতেই হবে। প্রদীপ আড়ালে আবডালে বলত—সাহিত্যিক না কচু। লিখত তো বাচ্চাদের লেখা, তাও বেশীর ভাগ অনুবাদ।

আমরা অবাক হয়ে বলতাম—তুই কি করে জানলি?

—মামাবাড়িতে এই নিয়ে হাসাহাসি হত কত! আমি যুদ্ধে যাব জানিস। সাহিত্যিক ফাহিত্যিক না, আমি হব সোলজার।

চারদিকে ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে তখন। দরগার মাঠে লোকলস্কর লেগে দিব্যি আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চ কেটে দিল। নতুন রকমের একটা খেলা পেয়ে গেলাম আমরা। গর্তের মুখে লাফ দিই। সবাই পারি কেবলমাত্র দীপুই পারে না। তিন বোনের পর দীপু একমাত্র ভাই তার মা বাবার খুব আদরের, তাই বোধ হয় পারত না। তার হাত পা নরম নরম ছিল।

বর্ষায় ট্রেঞ্চে ব্যাঙের আস্তানা হল। জল জমে ডুবজল। নিধে ছিপ ফেলত। চ্যাঙা ব্যাঙা মাছ ধরত। অনেক রাতে বৃষ্টি নামলে প্রবল ব্যাঙের ডাক শোনা যেত। আকাশে কাক, চিলের মতো এরোপ্লেন দেখে দেখে আর শব্দ শুনেও চোখ তুলে তাকাতাম না।

মামারা ছিল বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়। তারা তখন কিশোর কিংবা যুবা। প্রখর চোখে তারা মেয়েদের দেখত। দীপুদের বাড়িতে তাদের বয়সী কয়েকটা ছেলে এসেছিল। সব কলকাতার ছেলে। মামারা তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সিঁথি কাটা, জুতো পরা, জামার হাতা গুটোনো—এ সব আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে শিখছি।

দরগার সামনে আমাদের ট্রেঞ্চ-এর তু'ধারে লাফাতে দেখে মামারা হেসে খুন। দীপু লাফাতে পাবে না দেখে আমার ছোট মামা জ্যোতির্ময় গম্ভীর হয়ে বলল – ও লাফাবে কি! ও তো মেয়ে!

—যাঃ। বলে আমি চেঁচিয়ে উঠি।

মামা হাসল। বলল—আমি জানি। ওর ভাই নেই বলে ওর মা-বাবা শখ করে ওকে ছেলে সাজিয়ে রাখে।

আমরা তাকিয়ে দেখি, দীপু দরগার মাঠ ধরে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন বিকেলে টিলার ওপর আমাদের মিটিঙ বসল। আমি সাধন, প্রদীপ, সতুয়া, নন্তু আর একধারে দীপু গোঁজ হয়ে বসে। তার চোখে জল।

—তুই মেয়ে? সাধন জিজ্ঞেস করল। মাথা নাড়ল দীপু, হ্যাঁ।

—আমরা অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পাই না। কী বলব! দীপু ততক্ষণে কাঁদতে থাকে। বলে—আমার সঙ্গে খেলবি না? আর খেলায় নিবি না?

সে সময়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে খেলতে আমাদের মধ্যে পৌরুষ এসে গেছে। প্রদীপ বলল—কি করে খেলি বল! সবাই জেনে গেলে বলবে মেয়েদের সাথে খেলি।

দীপু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল আমি যে মেয়েদের খেলা কখনো খেলিনি। আমার মেয়ে-বন্ধুও নেই।

সতুয়া খুব অবাক হয়েছিল। বলল—মেয়েছেলে তো তোকে হতেই হবে। ও কি লুকোনো যায়?

আমার মন খুব খারাপ ছিল। দীপু আমার বন্ধুত্বই সবচেয়ে বেশী চাইত। আমার দিকে চেয়ে দীপু বলল—মেয়ে হতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

নন্তু ধমক দেয়—মেয়ে হবি আবার কি। তুই তো মেয়েই।

দীপু গোঁজ হয়ে বসে কাঁদতে থাকে, সে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না।

নন্তু আমাদের আড়ালে ডেকে বলল—ভাই বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু। আমরা ক'জন ছাড়া দীপুর সঙ্গে আর কেউ খেলত না। ওকে দলে রাখা যাবে না।

আমরা পরামর্শ করলাম অনেক। সবশেষে সতুয়া গিয়ে বলল—দীপু তোকে আমরা অনেক জিনিস দেব। কাল থেকে আর আমাদের সঙ্গে খেলতে আসিস না।

সেই দিন দীপুকে আমরা প্রায় একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দিলাম। সেদিনও দিনের শেষে চাঁদ উঠেছিল। আমরা যে যার বাসা থেকে মার্বেল, ছুরি, গল্পের বই এনে দিলাম। দীপু নিল। চলে যাওয়ার সময়ে বলল—বড় হয়ে তো কোন ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই, তখন আমি—

বলে সে সবার দিকে তাকাল। আমরা চুপ।

দীপু পায়ের আঙুলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ নীচু করে বলল—তখন আমি রন্টুকে বিয়ে করব।

এই বলে এক ছুটে টিলা থেকে নেমে গেল দীপু।

যুদ্ধের শেষে একদিন বাড়ি বাড়ি তেরঙা পতাকা উড়ল। স্কুলে পতাকা তুললেন এমদাদ আলি বিশ্বাস। তার কিছু দিন পরেই ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল তাঁকে। সবাই তাঁর কৃতিত্বের কথা বললেন। তিনি বলতে উঠে বললেন —আমি যে মুসলমান বলে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি তা নয়। আমি বুড়ো হয়েছি, এই জায়গা ছেড়ে কোথাও না কোথাও আমাকে যেতেই হত। গোরও তো ডাকছে। আমি হিন্দু-মুসলমান দু রকম ছেলেই পড়িয়েছি। যখন শাসন করতে হাত তুলেছি তার ভালোর জন্য তখন হিন্দু বলে ভয় পাইনি মুসলমান

বলে ছেড়ে দিইনি। যে শেখায় তার ভয় পেতে নেই। যে ভয় পায় সে ভয় পেতে শেখায়।…ইত্যাদি। শহরসুদ্ধ লোক তাঁর জন্য দুঃখ করল। তিনি চট্টগ্রামে চলে গেলেন। শওকত আলি যুদ্ধে যায়নি। যাবো যাবো করছিল, তার আগেই যুদ্ধ থেমে গেল। শওকত আলি চলে গেল লালমণিরহাট।

আমরা স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ি তখন। স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলতে নামি। গোঁফের জায়গাটা কালচে হয়ে আসছে। ট্রেঞ্চগুলো বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। দরগার পিছনের টিলাটা ফাঁকা পড়ে থাকে। এখনো দিনের শেষে চাঁদ ওঠে। টিলার ওপর কেউ গিয়ে বসে না। আলাদা গার্লস স্কুল খোলায় পুরোনো স্কুলে মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন মেয়েদের মানে বুঝতে শিখেছি।

দীপু অনেক লম্বা হয়েছে। মাথার চুলে পিঠ ঢাকা যায়। লালচে আভার এক ঢল চুল তার। পরনে কখনো ফ্রক, কখনো শাড়ি। তার নাম এখন দীপালী। খুব সুন্দর হয়েছে কেবল একটু রোগা। তারা এখন চার বোন।

মাঝে মাঝে লিচু গাছে ছাওয়া রাস্তায় দেখা হয়। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে কথা না বলার অভ্যাস। বিশ্বাস সাহেবের নিয়ম ছিল। দেখা হলেও দীপুর সঙ্গে কথা বলতাম না। দীপুও বলত না। তাকাতও না।

দিন শুরু হত। দিন শেষ হত। আবার শুরু হত। তার মানে তখন বুঝতে শিখেছি। বয়স।

রাজার গল্প

চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাজা তাঁর মুকুট এবং সিংহাসন ত্যাগ করবেন। সেদিন প্রজাবর্গের সামনেই তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের বৃত্তি গ্রহণ করবেন হলকর্ষণ করে। তাঁর রাজকীয় মহিমার অবসান হবে। রাজহীন রাজ্যে তিনি প্রজাসাধারণের সঙ্গে সমভূমিতে নেমে আসবেন। সেদিন সেনাপতি, নগর-কোটাল এবং পৌরপ্রধানেরাও নিয়োজিত হবেন তাঁদের পুরাতন বৃত্তিতে। পৈতৃক কামারশালায় ফিরে যাবেন সেনাপতি, নগরকোটাল যাবেন তাঁর বিপণীতে, চিকিৎসাবিত্যায় ফিরে যাবেন পৌরপ্রধান। কারাগার বহুকাল বন্দীশূন্য, কারাধ্যক্ষ প্রত্যাবর্তন করবেন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রে। সমাজ রাষ্ট্রশূন্য হবে। শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সংক্রান্তির আগের রাত্রিতে রাজা তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে পাঠালেন সেনাপতিকে। সহাস্যমুখে প্রশ্ন করলেন—সেনাপতি, আপনার প্রয়োজন কি এ রাজ্যের পক্ষে সত্যিই ফুরিয়েছে?

সেনাপতি অনায়াসে উত্তর দিলেন—মহারাজ, এ রাজ্যের জন্য সেনাপতির প্রয়োজন নেই। আমরা আর রাজ্য জয় করি না, রাজ্য রক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্ররা একে একে সকলেই আমাদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। আদর্শের দ্বারাই আমরা প্রকৃত রাজ্যজয় করেছি। তাঁরা মিত্র ভাবাপন্ন হয়েছেন, সমাজতন্ত্রের মূল্য উপলব্ধি করেছেন। শীঘ্রই মানুষের মন থেকে নিজরাজ্য এবং পর রাজ্যের ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হবে। ফলে আক্রমণের কোনোই আশঙ্কা নেই। হ্যাঁ মহারাজ, আমার সেনাপতিত্বের প্রয়োজন এ রাজ্যের পক্ষে ফুরিয়েছে। আমি খুব আনন্দিত মনে কামারশালায় ফিরে যাবো। সেই কামারশালায় আমি ছেলেবয়সে হাপর ঠেলতাম, আমার বাবা লোহা গলাতেন। সেই স্মৃতি আমাকে এখনো সুখবোধে আচ্ছন্ন করে। আমি এখন সেই কামারশালাকে উন্নত করেছি। নূতন যন্ত্রলাঙলের নানা অংশ সেখানে তৈরী হবে—সেইভাবেই আমি নূতন করে কাজে লাগব।

তাকে বিদায় দিয়ে রাজা ডাকালেন নগরকোটালকে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে কোটাল নির্দ্বিধায় বললেন মহারাজ, বহুকাল হয় আমি কোটালত্ব ভুলে

গেছি। রাজ্য সুশাসিত হয় তখনই, যখন প্রতিটি মানুষ তার নিজের বিবেক দ্বারা শাসিত হয়। এখন এ রাজ্যে একজন সালঙ্করা সুন্দরী অষ্টাদশী কন্যা একাকিনী দিনে ও রাত্রে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন, তাঁর আভরণ ও সতীত্ব অক্ষুন্ন থাকবে, গৃহস্থরা দ্বার উন্মোচিত রেখে শয়ন করতে পারেন, ঘরে কেউ প্রবেশ করবে না। মহারাজ, আমাকে আর এ রাজ্যের প্রয়োজন নেই। আমার ঠাকুর্দার মুদিখানায় আমি ফিরে যাবো। যদিও সে দোকান এখন রাষ্ট্রায়ত্ত। সব দোকানই তাই। তবে সেখানে আমার ছেলেবেলার স্মৃতি আছে। সেই দোকানটিকে এখনো আমি ভালবাসি।

এরপর পৌরপ্রধান। প্রশ্নের উত্তরে বললেন—মানুষের কর্তব্যবোধ জেগেছে। এ নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সব নাগরিকই বহন করছেন। আমার আর প্রয়োজন কি? প্রধানের প্রয়োজন তখনই যখন অধঃস্তনরা নাবালকের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়। চিকিৎসক হিসেবে এক সময়ে আমি দেখেছি যে রুগী আরোগ্যলাভ করলে তাকে চিকিৎসামুক্ত করতে হয়। এখন পৌরকার্যও চিকিৎসামুক্ত হোক। নাগরিকরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সংক্রামক ব্যাধি কিছু নেই, নদীর জল জীবাণুমুক্ত, মানুষের জন্মহার নিয়ন্ত্রিত, বৃদ্ধ ছাড়া আর কোনো বয়সেই কোনো মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয় না। মহারাজ, আমার পুরোনো বৃত্তি যদিও আর খুব একটা কাজে লাগবে না, তবু সেই বৃত্তিতেই আমাকে ফিরে যেতে দিন।

এলেন কারাধ্যক্ষ। বললেন—প্রজারা আর নিয়ম ভাঙে না। বড় অপরাধ দূরের কথা, তারা পরস্পরকে কথাচ্ছলে অপমানও করে না আর। প্রত্যেকেই বিনয়ী এবং ভদ্র, কর্তব্যে সজাগ। ফলে প্রধান এবং তাঁর সহকারী বিচারকেরা কেবল আইনতত্ত্ব গবেষণা করে সময় কাটান, প্রয়োগের সুযোগ ঘটে না। মানুষ নিজের মহামূল্যবান জীবনকে উপলব্ধি করেছে, ফলে নরহত্যা ঘটে না। মানুষ তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই অনায়াসে পাচ্ছে, ফলে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ। পূর্ব অভিজ্ঞতাবলে প্রতিটি মানুষই জানে যে তার কর্তব্যে অবহেলা অন্যের সাতিশয় অসুবিধার কারণ ঘটাতে পারে, ফলে বিনা উৎকোচে সমস্ত কার্য যথাসময়ে সিদ্ধ হয়। ফলে কারাগার জনশূন্য। এত জনশূন্য যে প্রহরীরা সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বিষণ্ণ থাকে। মহারাজ, আপনি আমাকে বিদায় দিন, কারাভবনকে অন্য কোনো ভবনে রূপান্তরিত করুন, প্রহরীদেরও ভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োগ করুন।

এইভাবে একে একে সব রাজ-কর্মচারীকেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা। বুঝতে পারলেন, বাস্তবিকই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি এবার একে একে কিছু কিছু প্রজাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন।

প্রথমেই এলেন রাজ্যের সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি, যার বয়স একশ যাট বৎসর যিনি এখনো সরলকাণ্ড বিশিষ্ট গাছের মতো দাঁড়ান, যিনি নিয়োজিত আছেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে, বিশ্রাম জানেন না। রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নামমাত্র অভিবাদন করলেন রাজাকে, সমান আসনে বসলেন। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে বিনীত মুখে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। এ রাজ্যের পূর্ব অবস্থাও জানেন। এখন বলুন এ রাজ্যে রাজা বা রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রয়োজন আছে কিনা।

বৃদ্ধ ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন, মহারাজ, আপনি নিজে এ রাজ্যের সাধারণ প্রজা ছিলেন। আপনার পিতা ছিলেন আমার প্রতিবেশী। এ রাজ্যের অরাজক অবস্থায় আপনি রাজদণ্ডের ভয় না রেখে দুর্বল ভীরু পীড়িত জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করে বিপুল এক মনুষ্যশক্তির জন্ম দিয়েছিলেন। শক্তি মাত্রই নিরপেক্ষ—শুভ বা অশুভ যে-কোনো কাজেই তাকে লাগানো যায়। আপনি সেই শক্তিকে মঙ্গলাভিমুখী করেছিলেন। ফলে আমরা এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের জন্ম হতে দেখেছি। এ রাজ্যে যখন প্রথম খাদ্য ও শস্য বিনামূল্য হয়ে গেল তখন এটাকে সত্য বলে মনে হয়নি। সেদিন আমি নগরের বিভিন্ন আহারগৃহে গিয়ে আহার করেছি। যদৃচ্ছা যা প্রাণে চায় তাই খেয়েছি, এবং বেরোনোর সময়ে কেউ দাম চাইছে না দেখে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছি, নিজেকে চোরের মতন মনে হয়েছে। আমার মতো বহু মানুষই সেদিন ওরকম করেছে, তারা দেখছে সত্যিই সব বিনামূল্যে, তবু তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই বিনামূল্যে খাদ্য পাওয়ার ব্যাপারটা বেশী দিন স্থায়ী হবে না ভেবে কয়েকদিন আমি খুব খেয়েছিলাম। ফলে আমার পেট খারাপ হয়। আমার নাতি আমার এই কাণ্ড দেখে খুব হেসেছিল। তারপর মহারাজ, এক সময়ে এই রাজ্যে পরিধেয় বস্ত্র, তৈজস, আসবাব সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে গেল। আমি বিস্তর দোকানে ঘুরে হাজার জিনিস নিয়ে এসে বাসা ভর্তি করলাম। কিন্তু কেউ সেগুলো কেড়ে নিতে এল না। জিনিসগুলো আমারই রয়ে গেল। ক্রমে বুঝতে পারলাম আমি খামোখা এত জিনিস সংগ্রহ করেছি। আমরা

আগে দুর্দিনের জন্য সুদিনের সঞ্চয় রাখতাম। কিন্তু এখন দুর্দিন নিঃশেষিত হয়েছে, ফলে এই সঞ্চয় ঘরকে অরণ্যে পর্যবসিত করছে। আমি তাই সব জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর আগের মতোই অপ্রচুর জিনিসের ঘরগৃহস্থালীতে সুখী বোধ করতে লাগলাম আবার আগের মতো। আমি মিতাহারী। মহারাজ, যখন সেদিন আমার কানে এল যে আপনি সিংহাসন ত্যাগ করে সাধারণ জীবন গ্রহণ করবেন সেদিনও আমার মনে শঙ্কা এসেছিল যে, রাজা না থাকলে আবার অরাজকতা দেখা দেবে হয়তো, আবার পাপ আসবে। কিন্তু মহারাজ, একটু ভেবে দেখলাম, ঠিক যেভাবে আপনি আপনার পূর্বসিদ্ধান্তগুলোতে সাফল্যলাভ করেছেন, ঠিক সেভাবে এতেও আপনি সফল হবেন। না মহারাজ, সম্ভবতঃ এ রাজ্যে আর রাজার প্রয়োজন নেই।

আর একজন প্রজা এসে পূর্ববৎ অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করলেন এবং বললেন—মহারাজ, আপনার শাসনবিধির তুলনা নেই। খাদ্য, পানীয়, বসত-গৃহ, চিকিৎসা, যানবাহন ইত্যাদির জন্য আমাদের কোনো ব্যয় নেই। এ রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমি যে কোন যানে ভ্রমণ করতে পারি, যে কোনো আহারগৃহে আহার করতে পারি, যে কোনো চিকিৎসককে ডেকে চিকিৎসা করাতে পারি। তার জন্য আমাকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। মহারাজ, আমার পিতামহের দানশীলতার খ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যদি আপনার রাজ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তবে অবশ্যই খ্যাতিলোপের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতেন। কারণ, তাঁর দান গ্রহণ করার মতো একজনও দুঃখী বা অভাবী লোক এখানে নেই। মহারাজ, আমরা এখন আর মানুষের দয়াধর্মকে মহৎ গুণ বলে অভিহিত করি না, কারণ দয়াগ্রহণ মনুষ্যত্বের অবমাননাস্বরূপ। মহারাজ, আমরা আমাদের যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সজাগ। কাজেই রাজকীয় শাসন ও দয়াধর্মের মতোই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী প্রজা এক মধ্যবয়স্ক চিত্রকর। তিনি বললেন—মহারাজ, আমার পিতা ছিলেন যোদ্ধা। তিনি এক সময়ে এ রাজ্যের হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছেন। তিনি মহাবীর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর গায়ে নানা অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐ চিহ্নগুলিকে তিনি পদকের মতো ভালবাসতেন। এই যুদ্ধপ্রিয় লোকটি নরহত্যার অপ্রয়োজনীয়তাকে কখনো বুঝাতে চাইতেন না। যুদ্ধ না থাকলে মানুষ হীন ও নির্বীর্য হয়ে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। ছেলেবেলায় তাই আমি যুদ্ধবাজ

মনোভাবাপন্ন ছিলাম। আমি প্রথমে ফড়িং, পাখী, তারপর কুকুর, বেড়াল, বাঁদর এইসব হত্যা করতে শুরু করি। বাবার মতো হওয়ার জন্য শীঘ্রই আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বালককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করব এরকম অভিলাষও আমার ছিল। ঠিক সেই সময়েই আমি আপনার বিপ্লবে অংশীদার হই যুদ্ধের আশায়। এবং কালক্রমে আপনার আদর্শকে বুঝতে পারি, এবং আমার হৃদয় শান্ত হয়, যুদ্ধস্পৃহা জ্বরের মতো সেরে যায়। নিরীহ পশুপাখী হত্যা করে যে পাপ আমি করেছিলাম এখন তার স্খালন করি এই হাতে তাদেরই ছবি এঁকে। মহারাজ, এক সমাজব্যবস্থায় হয়তো যুদ্ধের এবং বীরত্বের প্রয়োজন ছিল, এখন তা ফুরিয়েছে মহারাজ, হয়তো সেরকম রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে ঈশ্বরও আমাদের কাছে কিংবদন্তী মাত্র।

সংক্রান্তির দিন সকালে রাজা স্নান করলেন। পুরোহিতকে বললেন—কেউ যখন রাজা হয় তখন তার অভিষেকের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রাজা যদি যে কেউ একজন হতে চায় তখন কি তার কোনো অভিষেক আছে?

পুরোহিত মাথা নাড়লেন—না, মহারাজ।

প্রাকারের পাশে সুসজ্জিত বেদীতে সাজানো সিংহাসন। রাজা সেখানে এসে বসলেন। হাতে তুলে নিলেন রাজদণ্ড, মাথায় পরলেন মুকুট। শেষবারের মতো। সামনের আম্রকাননে হাজার হাজার কৌতূহলী প্রজা সমবেত। এক পাশে শূন্য একটু জমিতে চাষার পোশাক এবং বলদযুক্ত একখানা হল রয়েছে। রাজা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসন, মুকুট ও দণ্ড ত্যাগ করে হলকর্ষণ করবেন। রাজাকে আজ বেশ আনন্দিত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

রাজা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় গতকাল রাত্রে যাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করে বললেন যে, তাঁর শাসনের প্রয়োজন সত্যিই ফুরিয়েছে। এবার সমাজ হবে রাষ্ট্রহীন। মনুষ্যত্বই হবে প্রকৃত শাসক।

রাজা মুকুট খুললেন, রাজপোশাক উন্মোচন করলেন, সিংহাসন ত্যাগ করে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পদক্ষেপে নামতে লাগলেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল—মহারাজ, কাল রাত্রিতে আমার ঘরে চোর ঢুকেছিল···

সবাই চকিত হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। সেনাপতি কোমরবন্ধ তলোয়ারসুদ্ধ খুলে রাখতে যাচ্ছিলেন। এই কথা শুনে কোমরবন্ধ আবার আঁটলেন। কারাধ্যক্ষ চকিত হয়ে হাতে ধরা ইস্তফাপত্রটি লুকিয়ে ফেললেন।

আর একটি কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলল—মহারাজ, আজকের অনুষ্ঠানে সম্মুখবর্তী এই আসনটি পাওয়ার জন্য আমাকে বিশ মুদ্রা উৎকোচ দিতে হয়েছে···

আর একটি কণ্ঠও আর্তনাদ করল—মহারাজ, কিন্তু তার অভিযোগ গোলমালে, পাল্টা চীৎকারে শোনা গেল না। কিন্তু বহু কণ্ঠের আর্তনাদ উঠতে লাগল মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ···

মাঝসিঁড়িতে থেমে দাঁড়ালেন রাজা। বিস্মিত, ব্যথিত। ভ্রূকুটি করলেন। তারপর হতাশ ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের উদ্বেলিত জনসাধারণের দিকে।

তারপর ধীর ক্লান্ত পায় আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগলেন পরিত্যক্ত সিংহাসনের দিকে।

সোনার ঘোড়া

তিনটে খরগোশ তুরতুর করে মাটি ভাঙে চীনাবাদামের ক্ষেতে। মাটি উল্টে বের করে বাদাম। সামনের দুই থাবায় ধরে কুটকুট করে খায়। তাদের কান নড়ে আনন্দে।

ভুট্টা ক্ষেতের ভিতরে ঝুঁঝকো আঁধার। সেইখানে সরসর করে শব্দ হয়। দুটি শিশু কচি ভুট্টা ছেঁড়ে, খোলস আর রোঁয়া সরিয়ে দাঁত বসায়। দানা ফেটে উছলে ওঠে ভুট্টার দুধ। স্বাদে তাদের মুখ ভরে যায়। তারা ভুট্টার দুধ শুষে নিতে থাকে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ঝুঁঝকো আঁধারে বুঝদারের মতো হাসে। মেয়েটার চুল রুক্ষ লালচে, পরেছে বিবর্ণ এক ডুরে শাড়ি, পুরু দুটি ঠোঁটে একটু উঁচু দাঁত ঢাকা পড়ে না। ছেলেটার পরনে নোংরা লেংটি, গা উদোম, ন্যাড়া মাথায় লম্বা টিকি।

বাবুদের বাগানের এক কোণে মেয়েটির বাবা রাজ্যের বুনো ঘাস নিড়িয়ে জড়ো করেছে। সারাদিন ঝরে পড়ে শুকনো গাছের পাতা। সেইসব পাতা কুটো শিমুলের ডাল থেকে খসে পড়া একটা বাবুইয়ের বাসা—এইসব দিয়ে একটা স্তূপ তৈরী করেছে সে। তারপর সাবধানে দেশলাই জ্বেলে সে একটা বিড়ি ধরায়, তারপর জ্বলন্ত সেই কাঠিটা দিয়ে বাবুইয়ের বাসাটায় আগুন দিয়ে শুকনো পাতার স্তূপটা ধরিয়ে দেয়। পাতা পোড়ার মিষ্টি ঝাঁঝালো ধোঁয়ার গন্ধ পায় সে। আগুন জ্বলে ওঠে। একটু দূরে ঘাসের ওপর উদাসী ভঙ্গীতে বসে সে বিড়ি খায়।

ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে মেয়েটি সেই গন্ধ পায়। পাতা পোড়ার মিষ্টি গন্ধ। তাহলে বাবা আগুন জ্বেলেছে! ঝলসে নিয়ে খাবে বলে সে দুটো ভুট্টা ছিঁড়ে কোঁচড়ে নিয়ে ক্ষেত থেকে বেরোয়। অমনি দেখতে পায়, খরগোশের কাণ্ড। চীনেবাদাম গাছের শিকড় খুঁড়ে বেগোছ করছে।

মুখ ফিরিয়ে সে ছেলেটাকে ডাকে—এ গেনিয়া, মোমফালি খা লেল কৈ।

—কৌন?

—হৌ দেখ।

গেনিয়া ভিখমাঙ্গা সুরদাসের ছেলে। তার হাতে সব সময়ে একটা খেঁটে লাঠি থাকে। ঐ লাঠির এক প্রান্ত ধরে তার বাবা অন্তপ্রান্ত ধরে সে। ঐ ভাবে লাঠি ধরে, সে বাবাকে ভিখ মাঙতে নিয়ে যায় রাস্তায় রাস্তায়, বাড়িতে বাড়িতে। চলে যায় যশিডির সাটল্ গাড়িতে উঠে মেল ট্রেনে ঝাঁঝা কিংবা মধুপুর ঘুরে আসে। সেই লাঠি হাতে ছেলেটা লাফ দিয়ে বেরোল।

তিনটে খরগোশ ছুটে পালায়। তারা বেশী দূরে যায় না। এ বাগানের সীমা পেরিয়ে কাঁটা গাছের বেড়ার তলা দিয়ে উত্তরে আর একটা বাড়ির বাগানে ঢুকে যায়। গেনিয়া মেয়েটাকে বীরত্ব দেখাতে খেঁটে লাঠিটা হাতে নিয়ে দু' চারবার লাফ ঝাঁপ করে, চেঁচায়। তার লেংটির একটা প্রান্ত দু' পায়ের মাঝখান বরাবর ঝুলে থাকে, এখন লাফ ঝাঁপ দেওয়ার সময়ে সেই অংশটা লেজের মতো নড়ে। মেয়েটা তাই দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

চীনেবাদামের ক্ষেত পার হয়ে তারা প্রকাণ্ড নিস্তব্ধ বাড়িটা ঘুরে আগুনের কাছে চলে আসে। আগুনের আঁচ থেকে দূরে ঘাসে বসে উদাস ভঙ্গীতে মাটিমাখা হাতে বিড়ি খায় ভূতনাথ। তার চোখ শূন্যে নিবদ্ধ। মেয়েটা বাবার ঐ ভঙ্গী দেখে আসছে জন্মাবধি। সে জানে এ দেশের মাটি তার বাবার পছন্দ না। তার বাবা যে-মাটির দেশে ছিল সে-মাটির দেশে আরো নিবিড় গাছপালা জন্মাতো। সেখানে ছিল অনেক জল। জলে-মাটিতে মাখামাখি হত খুব। এখানে তা হয় না। সেই ঢাকার দেশে বাবার ছিল বৌ, একটা ছেলেও। তারা দুজনেই ঘরের আগুনে মারা যায় দাঙ্গার সময়ে। তার বাবা একা পালিয়ে আসে কলকাতায়। সাহাবাবুরা দেশের লোক, তারা ভূতনাথকে দু একটা কাজ দিয়েছিল। কিন্তু লোকটার মাটির নেশা দেখে বুড়ো কর্তা বললেন—বৈদ্যনাথ ধামে আমার বাড়িটা পড়ে আছে। মালীটা বুড়ো-হাবড়া, তা তুমি সেখানে গিয়ে বরং মাটি ছানো গিয়ে। তোমার হাতে গুণ আছে, গাছপালা করো গে সেখানে—

বুড়ো বিহারী মালীর চাকরি গেল। বড় কষ্ট হয়েছিল ভূতনাথের। সেই কষ্ট থেকেই ভূতনাথ এক ঢিলে দুই পাখি মারল। বুড়োর এক মেয়ে ছিল, যদিও বাঙালী না, তবু তার মুখচোখে বিহারের সহজ লাবণ্য দেখা যায়। বুড়োকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে গেল সে, তার নিজের তখনো বিয়ের বয়স যায়নি। বুকে খামচে থাকা স্ত্রী পুত্রের দুঃখটাতেও একটা প্রলেপ পড়া দরকার। বুড়ো বিড়বিড় করে বলল—মেয়ে আমাদের দুধেল গাইয়ের মতো।

বিয়ে করতে চাও করো—নগদ দু শ' টাকা ধরে দাও। ভূতনাথ থ। কোথায় সে বিনাপণে দায় উদ্ধার করতে এসেছিল, কোথায় আবার উল্টে কন্যাপণ? তবু নিয়ম। রফা হল একশ'য়। কিন্তু এক দফায় না, চার দফায়। ইনস্টলমেন্টে বিয়ে করে ঘর বাঁধল ভূতনাথ, সাহাবাবুদের বাড়ির আউট হাউসে। চারদিকে জমি মেলাই। মনের আনন্দে মাটিতে ডুব দিল সে। ফুল-ফলের বুদ্বুদে ভরে দিল বাগান। এতোয়ারীর কোলে এল কম্‌লি।

সেই কম্‌লি এখন ঐ পাতার আগুনের দিকে সাবধানে হাত বাড়িয়ে কচি ভুট্টা সেঁকছে, সঙ্গে ভিখিরির ছেলে গেনিয়া। উদাস চোখে দৃশ্যটা দেখে ভূতনাথ। আবার বৌ, আবার সন্তান, আবার সেই জমি নিয়ে মাখামাখি, তবু কোথা থেকে এক অন্যমনস্কতা এসে বাসা বেঁধেছে ভূতনাথের মাথায়। মাঝে মাঝে তার বোধে আসে যে, সে যেন এই পৃথিবীর সঙ্গে ঠিকমতো আটকে নেই। কোথায় একটু ঢিলে বাঁধুনী রয়েছে, একটা আলগা ভাব। মাঝে মাঝে তাই সে বসে গাছের ছায়ায় ঘাসগজারির মধ্যে গা চুবিয়ে—জলের কথা ভাবে, জমির রঙের কথা ভাবে, কখনো বা তার মনে পড়ে সেই বৌ-ছেলের মুখ, কখনো মনে পড়ে দুঃসময়ের আগুনরঙা আকাশ। কিংবা কিছুই মনে পড়ে না, কেবল এক কাতরতা তাকে বকের মতো একা করে রাখে। এক ঠাঁই ঝিম মেরে থেকে থেকে মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে টের পায়, চিন্তার মাছ পলকে ঘাই মেরে ডুব দেয়। আর ধরা যায় না। খেলাটা খেলাভোর তাকে বসিয়ে রাখে, বিড়ি নিভে তেতো হয়ে যায়। তখন কখনো কম্‌লি 'বাবা' বলে ডাক দিল সে ভারি চমকে উঠে ভাবে—কে রে মেয়েটা?

ভুট্টার দানা দাঁতে নিতেই পোড়া ভুট্টার সুঘ্রাণে ভরে গেল শরীর। গেনিয়া কম্‌লির দিকে চেয়ে হাসে, কম্‌লি গেনিয়ার দিকে চেয়ে।

গেনিয়া আস্তে করে বলে—একটু নুন হলে—

কম্‌লি তখন লক্ষ্য করে বাবার পিঠে একটা ডাঁশ বাইছে। তড়িতে উঠে গিয়ে আঁচল ঝাপটে ডাঁশ তাড়ায়—

বাবা মুখ তুলে বলে—কী রে?

—ডাঁশ।

বাবা আবার চুপ করে বসে থাকে। বিড়ি খায়।

—বাবা, পাগলা ডাক্তারের খরগোশগুলো রোজ এসে বাদামের ক্ষেত ভেঙে যায়।

—জুড়িয়ে দিস।

—তাড়াই না বুঝি! এবার আমি একটা কুকুর পুষবো। গেনিয়ার চমেলী কুকুরের বাচ্চা হোক—কেমন বাবা! হ্যাঁ?

—আচ্ছা।

বাবা বড় ভাল। কুকুরের ওপর মায়ের বড় রাগ।

সুমসাম বাগানখানা রোদ মাখছে, বাতাস মাখছে। ফুলের গর্ভকোষে পরাগসঞ্চার করে ফিরছে পোকারা। তাদের ওড়াউড়ির শব্দ। ফুলের বেড লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয় গেনিয়া, পিছনে কমলি; নিস্তব্ধ ভয়াল বাড়িটার দিকে তাকালেই তাদের বুকে নানা ইচ্ছার রঙ এসে পড়ে।

দুজনে এসে বারান্দার গ্রীলের ভেজানো দরজা খুলে ঢোকে। বারান্দায় ওপাশে সারিবদ্ধ ঘর। বড় তালা ঝুলছে। বহুবার দেখেছে তারা, তবু রোজ একবার করে দরজার পাখি তুলে অন্দর দেখে। ভিতরে গোধুলির মতো অন্ধকার। তবু বিচিত্র আসবাব দেখা যায়। ইংলিশ বেড, ড্রেসিং টেবিল, জাপানী ফুলদানী, দেওয়ালে প্রকাণ্ড সব ছবি, খেলনার আলমারি, বইয়ের শেলফ। তারা ঘুরে এক এক ঘরের দরজার পাখি তুলে এক এক রকমের জিনিস দেখে। পনেরো দিন অন্তর ভূতনাথ দরজা খোলে, এতোয়ারী বালতি করে জল আনে, ঝাঁটা আনে। ঘর ধোলাই হয়। তখন ঘরে ঢুকে এটা ওটা ছুঁয়েছে কমলি। গেনিয়াকে এতোয়ারী ঢুকতে দেয় না, বলে—ওটা চোট্টা। এক পলকে জিনিস তুলে উধাও হবে।

গেনিয়া তাই তৃষিত চোখে ভিতরটা দেখে। রোজ।

কিন্তু কমলি বেশীক্ষণ দেখতে দেয় না। গেনিয়ার চোখ বড্ড লোভী।

দরজার পাখি ফেলে দিয়ে কমলি বলে—আর না।

একগাল হাসে গেনিয়া, বলে—আলমারীতে একটা সোনার ঘোড়া আছে—না রে?

কমলি ঠোঁট ওল্টায়, বলে—কী জানি! কত কিছু আছে!

উত্তরের ঘরটার জানালায় একটা শিক নেই। গেনিয়া তা দেখে রেখেছে।

·

অন্ধ রামজী সারা সকাল বিছানায় শুয়ে। বুড়ো হলে শরীরের তাপ কমে যায় নাকি! বিছানার ওম বড় ভাল লাগে। বাঁশের ওপর খড় পাতা, তার

ওপর চিটচিটে ন্যাকড়া আর ন্যাকড়া। এই বিছানা, তবু ওম বের। রাতে গেনিয়া শোয় পাশে, তার শরীরের ওমটিও ভাল লাগে। কোন ভোরবেলা উঠে গেছে গেনিয়া বুড়ো বাপকে একা ফেলে রেখে।

চোখ দুটো পাথর হয়ে গেছে বটে তবু আন্দাজী বেলা ঠাহর পায় রামজী। পেটে খিদে চাগাড় দিয়ে ওঠে। খিদের সঙ্গেই বসবাস, তাই অস্থির হয় না। ধীরসুস্থে উঠে, মাচান থেকে নামতে নামতে চেঁচিয়ে গেনিয়াকে ডাকে। ডাকটা কর্কশ, তবু ডাকের মধ্যে আদর আছে।

গেনিয়ার সাড়া পাওয়া যায় না। রামজী উঠে ঘরের পিছনের জঙ্গলে পেচ্ছাপ করে আসে। মাটির খোড়ায় দুমুঠো ভেজানো ভাত আছে। জল খায়। তারপর গেনিয়াকে সঙ্গে করে রামজী বেরোবে মাংতে।

গেনিয়াকে আরো কয়েকবার ডাকে রামজী। সাড়া নেই।

মাটির খোরায় হাত দিয়েই টের পায়, একটা অবধি ভাতও খুঁটে খেয়ে গেছে রেণ্ডীর ব্যাটা। বুড়ো বাপের জন্যে একদানাও রেখে যায় নি।

—এ গেনী – ই-ই—এ রেণ্ডীর ব্যাটা—

রোদে বসে প্রাণপণে ডাক দিতে থাকে রামজী—ভিখমাঙ্গা সুরদাস।

এ বাড়ির কলে কেমন হিল হিল করে জল পড়ে। মিঠে জল। হাঁটু গেড়ে কলের তলায় বসে আঁজলা ভরে জল খায় গেনিয়া। অদূরে চৌবাচ্চার চাতালে বসে মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে গম্ভীর মুখে উকুন খোঁজে কম্‌লি।

জলে পেট ভরে ওঠে। তবু কল থেকে জল পড়া দেখতে ভাল লাগে বলে গেনিয়া আঁজলা পেতে মুখ ডুবিয়ে রাখে। জল পড়ে যায়।

কম্‌লি উঠে এসে কল বন্ধ করে বলে—জল মাগ্‌না—না? এবার ভাগ।

আউট-হাউসের সামনে শাকের ক্ষেত। সেখানে এতোয়ারী খুঁটে খুঁটে শাক তুলছে। সেইখান থেকেই দেখতে পায় ভিখমাঙ্গা সুরদাসের চোর ছেলে গেনিয়াটার সঙ্গে কম্‌লি বাইরের কলের চাতালে বসে। মেয়েটার নজর নীচু হয়ে যাচ্ছে। সে ডাক দেয়—এ কম্‌লি—

কম্‌লি চলে যেতেই এক লাফে গেনিয়া ভুট্টার ক্ষেতে সেঁধোয়। মট মট করে ভুট্টা ভেঙে নেয় আট দশটা। বুকে জড়ো করে ধরে নিঃসাড়ে বাড়ির

উত্তর দিকের ধার ঘেঁষে দ্রুত পায়ে এগোয়। কাঁটা বেড়ার ভিতরে একটা গোপন ফোঁকর আছে, তাই দিয়ে গলে রাস্তায় পড়ে।

গেনিয়ার পায়ের শব্দ পেতেই রামজী নিঃসাড়ে লাঠিটার দিকে হাত বাড়ায়।

—আওল তু?

গেনিয়া উত্তর দেয় না। কিন্তু তবু তার শরীরের অবস্থিতি টের পায় রামজী। লাঠিটা আচমকা তুলে প্রাণপণে বসায়।

কিন্তু গেনিয়ার অভ্যাস আছে। খরগোশের মতো লাফ দিয়ে সরে যায় সে। বুক থেকে দুচারটে ভুট্টা খসে পড়ে। লাঠিটা মাটিতে পড়ে খট করে ওঠে।

—রেণ্ডীর ব্যাটা, সরম নেই? বুড়ো আন্ধা বাপের জন্য একটা দানা রেখে যাসনি।

দূর থেকে বাপের দিকে একটা ভুট্টা ছুঁড়ে মারে গেনিয়া। সুরদাস রামজী প্রথমটায় চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে মারছিস শালা চুহা? অ্যাঁ! আমাকে—বুড়ো আন্ধা বাপকে তোর—অ্যাঁ?

আবার লাঠিটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে ভুট্টাটা হাতে পায়। তুলে নেয়। খোসা ছাড়িয়ে হাত বোলায় দানাগুলোর গায়ে। তারপর হাসে।

—কোথায় পেলি? ভুতুয়ার বাগানে বুঝি! একটু সেঁকে দিবি গেনি? একটু আগুন কর না ব্যাটা।

গেনিয়া উত্তর দেয় না। চুপচাপ ঝোপড়ায় ঢুকে তার ক্যাম্বিসের ময়লা ছেঁড়া টুপিটা পরে বেরিয়ে আসে।

তার বাবা ভিখমাঙ্গা সুরদাস রামজী রোদে বসে ভুট্টার দানা ভাঙে দাঁতে। মুখে, শরীরে খড়ি উড়ছে, চোখের কোল ফোলা-ফোলা, উড়ো চুল, ভাঙা গালে দাড়ি আর ন্যাকড়া পরা লোকটাকে অমানুষের মতো দেখায়। গেনিয়ার চোখে অবশ্য বাপের কোনোটাই অস্বাভাবিক ঠেকে না।

সে লাঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—চলিচল।

সুরদাস রামজী বাতাস হাতড়ে লাঠিটা ধরে উঠে দাঁড়ায়।

ভিক্ষের বাজারে এখন আকাল। বাড়িগুলো খালি পড়ে আছে। বৈদ্যনাথধামে কোনো তীর্থযাত্রার সময়ও এটা নয়। শহর তাই ফাঁকা। নিরিবিলি রাস্তায় দুজন হাঁটে—লাঠির দুই প্রান্তে দুজন। সঙ্গে গা ঘেঁষে হাঁটে চমেলী কুকুর।

—সেই রেণ্ডিটার কাছে তুই যাস নাকি ?

—না তো ?

—না তো ! অ্যাঁ ? আমি টের পাই না ভেবেছিস ? আন্ধা বলে টের পাই না ? তুই যাস।

—কখন গেছি ?

—রোজ যাস। মাঝে মাঝে আমি তোকে ডেকে পাই না কেন ? তুই গিয়ে ঐখানে ভালমন্দ গিলে আসিস। ঘুমোলে আমি তোর পেট হাতিয়ে টের পাই তোর পেট ঢাক হয়ে আছে। কোথায় খেতে পাস তুই ?

—না। কির—

—কিসের কির ?

—বৈদ্যনাথজীর।

সুরদাস চুপ করে থাকে। রেণ্ডীটা চার বছর তাকে ছেড়ে গিয়ে মাহিন্দরের ঘর করছে লাইনের পারে। ছেলেটাকে ফেলে গেছে—কিন্তু ছেলেটা মাঝে মাঝে মা পানে ছুটতে চায়। অন্ধের নড়ি, এটা ছুটে গেলে সুরদাস রামজীর নৌকো হাল ছাড়বে। তাই সে সাবধান করে দেয়।

—যাবি না কখনো। আমি তোকে খাওয়াবো, দেখিস। আমার পয়সা আছে।

—জানি।

শুনে অমনি খরগোশের মতো তার কান খাড়া হয়ে ওঠে। মিহিন সতর্ক গলায় বলে—কী জানিস ?

—পয়সার কথা।

রামজী ভারী বিপদে পড়ে যায়। জানে নাকি ! সত্যিই জানে !

অন্যমনে হাঁটে।

হঠাৎ বলে—তাড়াতাড়ি চল। গাড়ি আসছে।

—কোথায় ?

—এই যে মাটি কাঁপছে ! টের পাচ্ছিস না ?

গেনিয়া টের পায় না। তার বাপ এইসব টের পায়।

উদাসী স্বামীর চেয়ে ঝগড়াটে মারকুটে স্বামী ভাল। তার স্বামী ভূতনাথ যে উদাসী তা বুঝতে একটু সময় লেগেছে এতোয়ারীর। সে যখন মেহদীতে

হাত পায়ের নকশা করত, কপালে পরত টিকলি, চোখে সুর্মা, তখন কদাচিৎ ভূতনাথ তার সে সাজগোজ লক্ষ্য করত। বোধ হয় পশ্চিমা সাজ ওর পছন্দ নয়—এই মনে করে এতোয়ারী তারপর পায়ে পরত আলতা, সিঁথিতে ভুরভুরে লাল সিঁদুর দিত, ডানদিকের বদলে বাঁ দিকে আঁচল নিল। তারপর বুঝল, লোকটা এ সব দেখে না। বাগানের মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে মাঝে মাঝে চুপ করে ঝিম্ মেরে থাকা—ঐ হচ্ছে ওর স্বভাব। এই ভেবে এতোয়ারীর বুক ভারী হয়েছে কতবার। এখন সয়ে গেছে। এতোয়ারী ঝগড়াটে কম নয়। কিন্তু এ লোকটার সঙ্গে সে ঝগড়া করে না। বয়সে ভূতনাথ তার চেয়ে অনেক বড়। এখনই মানুষটার চুলে পাক ধরে গেছে। সবসময়ে চিন্তা নিয়ে থাকে বলে মুখে গম্ভীর বুড়োটে ভাব। এইসব মিলে একটা সমীহের ভাব আসে এতোয়ারীর মনে। তার ওপর মানুষটা ভিন্‌দেশী।

দুপুরে খেয়ে মানুষটা বাইরের খাটিয়ায় বসে বিড়ি ধরিয়েছে। তেমনি উদাস ভঙ্গী। এঁটো ফেলতে বাইরে এসে একপলক নীরবে স্বামীকে দেখল। দেখতে ভালই লাগে। একটু পরেই কম্‌লি খেয়ে এসে বাপের হাত পা দাবাতে বসবে। তখন রাজ্যের গল্প ফাঁদবে কম্‌লি। তারপর গল্পের মাঝখানেই কখন বাপের বুক ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। পিপুলের ছায়ায় রোদের একটা জাল মৃদুমন্দ নড়বে ওদের মুখে, শরীরে।

ইস্টিশানে বাপ-ব্যাটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চমেলী কুকুর রোজ ল্যাং ল্যাং করে একা ফেরে। মাঝে মধ্যে বাতাস শুঁকে দাঁড়ায়, এধার যায় ওধার যায়। ঘুরে ফিরে এক সময়ে ঠিক দুপুরবেলা এসে দাঁড়ায় কম্‌লিদের উঠোনে। দাঁড়িয়ে হাঁক ছেড়ে জানান দেয় যে সে এসেছে। কম্‌লিও তৈরী থাকে, শেষ কয়েকটা গ্রাস সে খায় না। সেটা মুঠোভর নিয়ে দৌড়ে আসে। নাড়তে নাড়তে ল্যাজটা বুঝি আনন্দে খসেই যায় চমেলীর। যদিও সে গেনিয়ার কুকুর, তবু বাপ-ব্যাটার খাওয়ার পর ভুক্তাবশেষ কিছুই থাকে না বলে চমেলীর পেট ভরে না। প্রায়দিনই তাই তাকে কম্‌লির কাছে আসতে হয়। দু মুঠো ভাতের পরিবর্তে সে বিস্তর অত্যাচার সহ্য করে যায়। কম্‌লি চিরুনি দিয়ে তার গা আঁচড়ে দেয়, মেহদী বেটে গায়ে নকশা আঁকে, গলার চামড়া টেনে আদর করে।

ভাঙা একটা সান্‌কী পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ে। তাতে পাতের ভাত ঢেলে দিয়ে কম্‌লি চমেলীর সঙ্গে কথা বলে—কঁহা গৈল তোহর মালিক। বিজনেসমে ?

শুখা অন্ধকে লোকে খুব একটা দয়া করে না। বিজনেস ভাল হয় গলায় গান থাকলে।

সেই কথা মাঝে মাঝে বাপকে বোঝায় গেনিয়া। কিন্তু সুরদাস রামজীর গানের গলা নেই। হাঁ করলে ফাটা বাঁশের আওয়াজ বেরোয়।

—তুই শেখ গেনি। হিন্দি ফিলিমের গানা দুচারটে কাবেজে রাখ।

গেনিয়ার লজ্জা করে। আড়ালে অবশ্য সে গায়। গাইবার চেষ্টা তার আছে। দুটো চ্যাপটা পাথর আঙুলে বাজিয়ে ষশিভির ভিখন এই এত পয়সা রোজগার করে। দুটো পাথর গেনিয়ারও জোগাড় আছে।

সন্ধেবেলা সীতারামপুর কি ঝাঁঝা থেকে ফিরতি গাড়ি ধরে ফেরে বাপ-ব্যাটা। ঝোপড়ার কাছে এসে বাপকে একা ছেড়ে দেয় গেনিয়া, তারপর পিছন ফিরে জোর কদমে হাঁটতে থাকে। পিছন থেকে তার বাপ প্রাণপণে তাকে ফিরে ডাকে, শাপ-শাপান্ত করে, মিনতি করে, গেনিয়া ফেরে না। এক দৌড়ে লাইন পার হয়ে চলে আসে গুমটি ঘরের পিছনে ব্যারাকবাড়িতে। রোজ সন্ধেবেলা গান গায় মহিন্দর—যার সঙ্গে তার মা আছে এখন। পুরোনো একটা হারমোনিয়ম আছে মহিন্দরের, খাটিয়ায় চাগিয়ে বসে সে, এক পা তুলে দেয় হারমোনিয়মের ওপর, গোড়ালি দিয়ে বেলো করে, দুই হাতে রীড চেপে আওয়াজ বের করে হারমোনিয়মের। দরাজ গলায় গান গায়। তার সামনের দুটো উঁচু দাঁতে দু ফোঁটা সোনা চিকমিক করে। শৌখীন লোকটা। তার সামনে চমেলীর মতোই থাপ পেতে বসে থাকে গেনিয়া। মনপ্রাণ দিয়ে গান শোনে, তুলে নিতে চেষ্টা করে মনে মনে।

তার মায়ের দুটো বাচ্চা হয়েছে, তারা কিলকিল করে ঘরে। চেঁচায়। আস্তে আস্তে রাত বেড়ে যায়। প্রায় দিনই পেঁয়াজ রসুন আলুর চচ্চড়ি দিয়ে মা তাকে বাচ্চা দুটোর সঙ্গে ভাত খাইয়ে দেয়। ভাত দিতে দিতে বলে—খবরদার, ঐ বুড়োটার মতো ভিখিরি হবি না।

গেনিয়া হাসে—কিন্তু গান জানলে মাঙ্গা ভাল বিজনেস।

—হোক গে, তোর তাতে দরকার নেই। বুড়ো মরলে আমি তোকে নিয়ে আসবো।

কথাটা কাজের নয়। গেনিয়া জানে। শত হলেও মা তার পরের ঘর করে। মহিন্দরের দুটো ভৈঁষ আছে, একটা চায়ের দোকান আছে বটতলায়,

সেই দোকানে চোর ছাঁাচোড়দের আড্ডা। বড় রাগী মহিন্দর। মাকে মাঝে মাঝে বাঁশডলা মার দেয়। নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলে থুথু ফেলে মাকে দিয়ে চাটায়। এক এক বেলা বেঁধে রেখে চলে যায়, কতদিন গিয়ে সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছে গেনিয়া, মার মুখ দিয়ে টসটসে রক্ত পড়ে শুকিয়ে আছে, চোখ ফোলা, পিছমোড়া করে হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসহায় বসে আছে, দুটো বাচ্চা সেই অবস্থাতেই বুক খুলে চুষছে। এ সবের চেয়ে তার সুরদাস অন্ধ ভিখমাঙ্গা বাপের কাছেই সে সুখে আছে। যদিও বুড়োটা খচাই, পয়সাকড়ি কোথায় যে লুকোয় কে জানে, তবু গেনিয়ার বিশ্বাস, বুড়োর তবিল একদিন সে-ই পাবে। বুড়ো মরলে সে একদিন ঝোপড়াটা তোলপাড় করে দেখবে, মাটি খুঁড়বে, ঝোপড়া ভেঙে বাঁশের গর্তে খুঁজবে। থাকবেই কোথাও না কোথাও। সেই পয়সায় ঘর ভাড়া নেবে সে, কিনবে হারমোনিয়ম, গলায় বেঁধে চলে যাবে ট্রেনে ট্রেনে, বিজনেস করে এত পয়সা নিয়ে আসবে।

গেনিয়া রাত করে ফেরে। হঠাৎ পৃথিবীর সব দারিদ্র্য মোচন করে শাঁকালুর মতো সাদা একটা ক্ষয়া চাঁদ তার দুধ ঝরিয়ে দেয় চারদিকে। সাদা ফটফটে ইউক্যালিপটাস গাছ বেয়ে দুধ ঝরে পড়তে থাকে। ফুলের গন্ধে ম ম করে বাতাস। নির্জন রাস্তায় বেভুল দাঁড়িয়ে পড়ে গেনিয়া। তারপর আনন্দে উদ্ভাসিত গলায় গান ধরে সে, দু চক্কর নাচ নেচে নেয়, পাথর তুলে দু হাতে খঞ্জনির মতো বাজায়।

গেনিয়া এগোতে থাকে। সামনেই কমলিদের বাড়ি। বাগানের গাছপালার ভিতর দিয়ে দেখা যায়। ওদের ঘরে বিজলির আলো জ্বলছে। বড় বাড়িটা অন্ধকার, বাইরের ফটক বন্ধ। চারদিক নিঃঝুম। সেই নিঃঝুমতার মধ্যে একটা সোনার ঘোড়া আকাশ থেকে লাফ দিয়ে নামে। দুধের মতো স্বাদু জ্যোৎস্নায় সেই ঘোড়াটাকে গেনিয়া মনশ্চক্ষে দেখে আর দেখে। সোনার দাম অনেক। গেনিয়া জানে।

অভাবের সংসার বলেই তার মা অভাবী অন্ধ বাপকে ছেড়ে গেছে। খুব বেশীদূর যেতে পারেনি অবশ্য। লাইনের ওপারে রাগী মহিন্দরের লাথিঝাঁটা খেয়ে আছে। সোনার ঘোড়াটা পেলে সে ঝোপড়া ভেঙে

পাকা ঘর তুলবে একটা। রাণী মহীন্দরের কাছ থেকে নিয়ে আসবে মাকে। সুরদাস ভিখমাঙ্গা রামজী শীতের রোদে একখানা ভাগলপুরী চাদর গায়ে দিয়ে রোদ পোয়াবে। আর গেনিয়া গলায় হারমোনিয়ম বেঁধে চলে যাবে যশিডির মেল ট্রেন ধরে ঝাঁঝা কিংবা মধুপুর হয়ে গিরিডি অবধি।

নিঃসাড়ে গেটটা ডিঙোলো গেনিয়া। গাছগাছালির ভিতরে ভিতরে দুধ টল টল করছে। ছায়া পড়ছে বিচিত্র। তার ছায়াটা ঠিক যেন ন্যাংটো মানুষের ছায়া। গাছপালা ভেদ করে সে ধীরে ধীরে অন্ধকার বাড়িটার ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। চারদিকে চেয়ে দেখে। কোনোখানে কোনো নড়াচড়া নেই।

উত্তরের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়ায়, জানালাটার একটা শিক ভাঙা। সন্তর্পণে জানালার পাল্লাটা টেনে দেখে সে। বন্ধ। বন্ধ হলেও খুব আঁট নয় পাল্লাটা। ঢক্ ঢক্ করে একটু নড়ে। গেনিয়া একটা পাল্লা চেপে ধরে আর একটা টানে, মাঝখানে এক আঙুল পরিমাণ একটা ফাঁক দেখা যায়। ডান হাতের কচি আঙুলগুলো ঢোকে, আটকায় হাতের তেলোটা। প্রাণপণে পাল্লাটা টেনে ধরে গেনিয়া। আপ্রাণ চেষ্টা করে হাত ঢোকাতে। ভারী পাল্লা দুটো কামড়ে ধরে তার কচি হাত, চিবিয়ে খেতে থাকে। তবু ছিটকিনির গোল মুখটা তার আঙুলে লাগে। কিন্তু সেটাকে ধরার মতো অবস্থা তার হাতের নয়। তার ওপর পাল্লা টান থাকায় ছিটকিনিটা শক্ত হয়ে জমে আছে। তবু সে চেষ্টা করতে থাকে। জানালার দুই ভারী পাল্লা রাক্ষসের মুখের মতো নিবিড় আনন্দে তার হাতখানা চিবোতে থাকে। যন্ত্রণায় সে গোঙানির শব্দ করে।

কাছেপিঠে একটা কুকুর ডাকছে। হারামীরা হরবখত কেন যে ডাকে গেনিয়া ভেবে পায় না। হাতটা টেনে বের করার সময়ে ছলে ছড়ে যায়, হাতটা জ্বালা করতে থাকে খুব। জ্যোৎস্নায় বাগানের মধ্যে সে একটুকরো কাঠ কি কাঠি খুঁজে দেখে। পেয়েও যায়। ছোটো একটুকরো পাতলা কাঠ। আবার জানালা ফাঁক করে সে কাঠের গোঁজা ঢোকায়। তারপর আবার হাত ভরে। ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড চেষ্টায় সে কবজী পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিতে পারে।

কুকুরের ডাকটা এগিয়ে আসছে। দূরে কমলির গলা শোনা যাচ্ছে। সে ডাকছে—চমেলী—এ চমেলী—ই-ই-ই—

কুকুরটা চমেলীই। রেণ্ডী কোথাকার। ভাতের লোভে দুবেলা এইখানে এসে বসে থাকে।

নিবিষ্ট মনে ছিটকিনির মাথাটা ধরার চেষ্টা করতে থাকে গেনিয়া। ধরেও। সেই সময়ে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসে চমেলী। দুটো বুকফাটা আনন্দের ডাক দিয়ে সে কুঁই কুঁই করতে করতে প্রবল ল্যাজের তাড়না গেনিয়ার দুই পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজে দেয়। লাফিয়ে ওঠে গায়ে, পা চেটে দেয়।

—রেণ্ডী! চাপা গলায় গাল দেয় গেনিয়া। তারপর প্রবল লাথি কষায় একটা। কেঁউ করে ছিটকে পড়ে চমেলী। পরমুহূর্তেই অপমান ভুলে আবার কুঁই কুঁই করে এগিয়ে আসে, ল্যাজের ঝাপটা মারে, নানারকম আদরের শব্দ করতে থাকে। ওদিকে গেনিয়ার আঙুলের ডগায় ছিটকিনিটা ঘুরে যাচ্ছে। বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠছে তার মুখে।

একটা টেমি উঁচু করে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কম্‌লি, ডাকছে—চমেলী—এ চমেলী—ই—ই—

ছিটকিনিটা ঘুরছে। ঘুরে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরে অন্ধকারে লাফ দিচ্ছে সোনার ঘোড়াটা। ঘুরছে ঘরময়। বেরোবার পথ খুঁজছে। কিন্তু হাতটা জ্বলে যাচ্ছে গেনিয়ার, মটমট করছে হাতের হাড, ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে সে। কামড়ে ধরছে জানালার পাল্লা, দাঁতে দাঁত ঘষছে।

ধোঁয়াটে টেমি হাতে এগিয়ে আসছে কম্‌লি, ডাকছে চমেলী—ই—

গেনিয়ার দু পায়ের ভিতর থেকে আনন্দে সাড়া দিচ্ছে চমেলী। —ঘে-উ-উ—ঘেউ—

ঠক করে ছিটকিনি উঠে পাল্লাটা হাঁ হয়ে যায়। অবশ হাতটা পড়ে যায় গেনিয়ার। আর এক হাতে কজীটা চেপে ধরে গেনিয়া। আর একটা লাথি কষায় চমেলীর পেটে।

চোখের পলকে গেনিয়া জানালায় উঠে পাল্লাটা টেনে দেয়। বাইরে জানালার দিকে মুখ করে প্রবল চীৎকার করতে থাকে চমেলী। টেমির আলোটা উঁচু করে ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কম্‌লি দৃশ্যটা দেখে। তার ভয় করতে থাকে।

সে হঠাৎ পিছন ফিরে বাবা আর মাকে ডাকতে ডাকতে দৌড়োতে থাকে।

অন্ধকারে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চলে যায় গেনিয়া। দরজার গায়ে হাতড়ে ছিটকিনি খোলে, আর এক ঘরে যায়। ধাক্কা খায় আসবাব-পত্রের সঙ্গে। হোঁচট খায় কার্পেটে, পাপোষে। অন্ধকারে ঠাহর পায় না, তবু প্রাণপণে সেই ঘরটা খুঁজতে থাকে যে ঘরে আলমারী, আলমারীতে সোনার ঘোড়া। খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে মরে। দুটো ঘর খুলে তৃতীয় ঘর খুলতে গিয়ে সে ভারী বেকুব বনে যায়। এ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা হাতড়ে সে এই তত্ত্ব বুঝে যায়। এইটাই মাঝখানের ঘর বলে তার বোধ হয়। এই ঘরেই সেই আলমারীটা রয়েছে। দরজাটা আক্রোশে প্রাণপণে টানে সে। পাথরের মতো অনড় থাকে ভারী পাল্লা। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে! বৃথা। তারপর হাঁফিয়ে যায়। ক্লান্ত লাগে।

অন্ধকারে সে তখন বেভুল ঘোরে। ধাক্কা খায়। আবার ঘোরে। রাস্তা ঠিক করতে পারে না। ইঁদুর দৌড়োয় মেঝের ওপর দিয়ে। আরশোলা পিড়পিড় করে। বাইরে থেকে চেনা বাড়িটা ভিতর থেকে অন্ধকারে কেমন ভীষণ অচেনা লাগে। সে প্রতিটি জানালা হাতড়ায়। শিকভাঙা জানালাটা খুঁজে পায় না কিছুতেই। বাইরে চমেলী আর ডাকছে না। নিঃঝুম হয়ে গেছে চারধার। এখন গেনিয়া করে কী? যদিও সে চোর, রেণ্ডীর ব্যাটা, ভিখমাঙ্গা, তবু তারও আছে ভয়ডর। কমলি গেছে লোকজন ডেকে আনতে। এদিকে অন্ধকারে ভুল রাস্তায় টক্কর খেয়ে মরছে সে। বন্ধ দরজার ওপাশে সে স্পষ্টই টের পায়—সোনার ঘোড়াটা চক্কর দিয়ে ফিরছে। বেরোবার রাস্তা পাচ্ছে না।

ভূতনাথের হাতে মশাল, কমলির হাতে টেমি। তারা দুজন বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে। জানালাগুলি টেনে দেখে ভাল করে। সবই ঠিক আছে। উদাস গলায় ভূতনাথ বলে—কোথায় কী! তুই ভুল দেখেছিস।

তারপর নিশ্চিন্ত মনে তারা শুতে যায়।

গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে শীতবোধ করে সুরদাস রামজী। আজ বিছানায় তেমন ওম নেই। ওম-এর জন্য খুঁত খুঁত করে সে কোঁকায়।

ঘুমের ঘোরেই বিছানা হাতড়ে গেনিয়াকে খোঁজে। অন্ধের নড়ি। ওর শিশু শরীর বুকের মধ্যে নিলে তাপ আসে। কিন্তু বিছানাটা শূন্য। কোন চোরচোট্টার সাকরেদী করতে গেছে গেনিয়া কে জানে? নাকি ঐ রেণ্ডীটা ফুসলে রেখে দিল! হা ভগবান জীবনভর তবে দুনিয়া হাতড়ে প্রাণটা যাবে তার। আধোঘুমেই সে গাল পাড়ে, বিলাপ করে। আবার ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাইরের উঠোনে জ্যোৎস্নার নদী বয়ে যাচ্ছে। চমেলী সেই দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে ঘুমচোখে খায়। একটা দুটো ডাক ছাড়ে। আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে চোখ বোজে।

রাত বাড়ে।

নরম গদীর ইংলিশ বেড-এর ওপর উদোম গায়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে গেনিয়া! ভারী ক্লান্ত সে! কেঁদেছিল, চোখের জল শুকিয়ে আছে গালে। দু এক ফোঁটা জমে আছে চোখের কোলে।

মাঝরাতে বাগানের ছায়াগুলো বেঁকে ভেঙে যাচ্ছিল। জ্যোৎস্না তীব্র হয়েছে, ফুলের গন্ধে গাঢ়, মন্থর হয়েছে বাতাস।

দুঃখীদের জন্য স্বপ্নের সন্ধানে বেরিয়েছেন ঈশ্বর। আনাচ কানাচ ঘুরে তিনি চরাচর থেকে স্বপ্নদের ধরেন নিপুণ জেলের মতো। আঁজলা ভরা সেই স্বপ্ন তিনি আবার ছড়িয়ে দেন। মাঝরাতে তারার গুঁড়োর মতো সেই স্বপ্নেরা ঝরে পড়ে পৃথিবীতে।

গেনিয়া দেখে সোনার ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা চলেছে। পিঠের কাছে অন্ধ বাপ, তার কোমর জড়িয়ে মা। গেনিয়ার দুই হাতে খঞ্জনীর মতো দুটো পাথর। সে পাথর বাজিয়ে ভারী সুন্দর গান গাইছে। সামনেই সোনালী নদী, নদী পেরোলেই আকালের দেশ শেষ হয়ে যাবে। ঐ পাড়ে ভিক্ষে পাওয়া যাবে খুব।

চোখে জল নিয়েই ঘুমের মধ্যে একটু হাসে গেনিয়া।

মুনিয়ার চারদিক

এক

লেবুগাছের গোড়া থেকে মুখ তুলল কালো একটা সাপ। মুখ তুলে সে একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখল। শীতের কুয়াশায় আবছা সকাল, রোদ এখনো নিস্তেজ সোনালী। সেই সুন্দর আলোয় ডালিম গাছের ডগায় একটি ছোট্ট ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুনিয়া। দু পায়ের আঙুলের ওপর ভর, দেহটি টান, উৎকণ্ঠ মুখটি ওপরে তোলা, দু কাঁধে এলো চুল ভেঙে পড়েছে। তার সোনালী ফ্রক, নীল একটি সালোয়ার, পায়ে চপ্পল, মাথায় ডালিমপাতা খসে পড়েছে, পায়ে শিশির আর কুটোকাটা। বড় সুন্দর সকালটি, মেয়েটি সুন্দর, যেমন সুন্দর আলো—সাপটা দেখল। কিন্তু শীত বাতাসে তার শরীর অসাড় হয়ে আসে, কেঁপে উঠে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লেবুগাছের গোড়ায় তার গর্তটির দিকে এগোয়। তার শরীর পাকে খুলে দীর্ঘ হয়ে যেতে থাকে। এত দীর্ঘ হয় যে তা প্রায় ডালিম গাছের গোড়া পর্যন্ত চলে যায়, যেখানে মুনিয়ার গোড়ালি।

বাঁ হাতে একটি ডাল টেনে নামায় মুনিয়া। সে ডালটার টানে গাছটা ঝুঁকে আসে। ডান হাতে বড় ডালটা ধরে মুনিয়া। ক্রমে ছোট্ট ডালিমটা নাগালে আসে। মুনিয়া ছিঁড়ে নেয় ফলটা। দাঁতে ঠোঁট টিপে সুন্দর হাসে। শ্বাস ফেলে। তারপর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হাতে ডালিম ফল, তাতে কয়েকটা লালচে সবুজ পাতা।

তীব্র ব্যথায় কালো সাপ তার মুখখানা ফিরিয়ে দেখে। সেই সুন্দর আলো, সুন্দর মেয়েটি। কালো সাপ মুখ ফিরিয়ে নেয়। শ্বাস ফেলে। শরীর টেনে নিয়ে চলে যেতে চায় উষ্ণ গর্তটিতে। সে ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করে সুন্দর শীতের বেলাটিকে দেখে।

মুনিয়া কিছুই টের পায় না। সুন্দর শিশিরে ভেজা ডালিমটা তার হাতে। সে বড় অন্যমনস্ক। ফুটফুটে চপ্পল-পরা পা বাড়িয়ে সে এক পা এগোয়।

ব্যথায় নীল হয়ে যায় কালো সাপ। তার দীর্ঘ দেহের কোন উৎস থেকে অন্ধকারের স্রোতের মতো তীব্র রাগ ছুটে আসে, আসে হিংসা, ভয়। শীত ভুলে সে তার শরীর তুলে দোল খায়। তারপর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে যাওয়ার সময়ে সে ভিক্ষুকের মতো রিক্ত বোধ করে নিজেকে। মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুনিয়ার কাছে, সুন্দর শীতের বেলাটির কাছে।

মুনিয়া প্রথমে ভারি অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখে। এত অপ্রত্যাশিত, এত অদ্ভুত। কালো সাপটা তার পায়ের ওপর দিয়ে ছলকে সরে যায় এক ঝলক ছোট ঢেউয়ের জল যেন। তার ফুটফুটে সাদা পায়ের পাতায় দুটি ছুঁচের মুখের মতো লাল ফোঁটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। সমস্ত শরীর ঝিন্‌ঝিন্‌ করে, শরীরের ভিতরে বিদ্যুতের মতো চমকায়।

একটু সময় লাগে বুঝতে। তারপর বোঝে মুনিয়া।

—মা—গো—ও—

খুব ভোরবেলায় উঠে পরাগ অনেকটা দোড়োয়। পায়ে কেডস্, গায়ে গরম জামা, পরনে খাটো প্যাণ্ট। দৌড়ে এসে সে খানিকটা জিরোয়। তারপর খোলা ছাদে উঠে আসে। অনেকগুলো বেণ্ডিং করে, পা তুলে লাফায়, হাজার স্কিপিং করে। করতে করতে নটা বেজে যায়। শীতের বেলা, তাই বেলা বোঝা যায় না। কুয়াশায় জড়ানো রোদে সোনালী রঙ লেগে থাকে, ভোরের মতো। এ বছর সে একটা বড় টিমে ফুটবল খেলবে—এই কথা ভাবতে ভাবতে পরাগ তার শরীরে আর মনে একরকমের উষ্ণ আনন্দ বোধ করে। তার পোষা চন্দনা পাখীটিকে কাঁধে নিয়ে সে ব্যায়ামের শেষে সারা ছাদে ঘুরে বেড়ায়। হাতে মুঠো ভর্তি ভেজা ছোলা, আর আদার কুচি। সে খায়, খায় তার পাখীটা একই মুঠো থেকে। পাখীটা তার আঙুল কামড়ে ধরে। পা দিয়ে তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করে। পরাগ হাসে, পাখীর মোলায়েম গায়ে তার কিশোর গাল ঘষে দেয়। পাখী তার পায়ের থাবায় পরাগের হাতের আঙুল জড়িয়ে দোল খায়।

এ সময়ে প্রতিদিনই ছাদের দক্ষিণের রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকলে সে মুনিয়াদের বাগান দেখতে পায়। মুনিয়াদের বাগানে গাছপালা ঘন, সবুজ। মুনিয়া

বাগানে ঘোরে। ফুল তোলে, পেয়ারা পাড়ে, কখনো সখনো পরাগদের ছাদের দিকে তাকায়। পরাগ তার পাখীকে আদর করতে করতে মুনিয়াদের বাগানে রোজ সকালে মুনিয়াকে দেখতে ভালবাসে।

আজও দেখছিল। সোনালী ফ্রক পরনে, আর নীল সালোয়ার, গলায় নরম সাদা একটা মাফলার—মুনিয়া এই বেশে ডালিমের উঁচু ডাল থেকে ডালিম পাড়ছে।

পাখীটা তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করছে, হাতের আঙুল দিয়ে একটা ছোলা ফেলে দিল পরাগ। পাখীটা লাফিয়ে নামল। মুনিয়ার টান শরীরখানা ধীরে ধীরে ডালিমের নাগাল পাচ্ছে—এই দৃশ্য কুয়াশা ভেদ করে আগ্রহভরে দেখছিল পরাগ। দেখছিল, কেমন সুন্দর সাদা হাতে পাতাশুদ্ধ ডালিমটা ছিঁড়ে আনল মুনিয়া। সে ঝুঁকে বলতে যাচ্ছিল—মুনিয়া, কী রে?

ঠিক সে সময়ে কালো বিদ্যুৎ স্পর্শ করল মুনিয়াকে। পরাগ কুয়াশায় কিছু দেখেনি। শুধু দেখল, মুনিয়া উবু হয়ে বসে পা চেপে ধরেছে, ডাকছে—মা গো—

পরাগ তার মুঠো খুলে ভেজা ছোলা ছড়িয়ে দিল, ভুলে গেল তার প্রিয় পাখীটিকে। সে দৌড়ে ছাদের দরজা দিয়ে সিঁড়িতে নামল। পাখীটিও শুনেছিল মুনিয়ার সবনাশের ডাক। তবু নির্বিকার লাফিয়ে ঘুরতে লাগল গড়ানো ছোলার ওপর। ঘুরতে লাগল, আর আনন্দে পাখা ঝাপ্‌টে চীৎকার করতে লাগল।

দীর্ঘদিন লক-আউটের পর কারখানা খুলেছে। খুলবার আশা ছিলই না প্রায়। একবার শোনা গিয়েছিল, মালিক কারখানা তুলে নিয়ে যাচ্ছে গুজরাটে। আর একবার শোনা গেল, কারখানা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনই সুবিনয় ভোরবেলা এসেছে কারখানায়। দূর থেকে দেখতে পেত কারখানার গেট-এর সামনে নীরব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে পতাকা, ফেস্টুন বুকে ব্যাজ, কিন্তু মুখে নিরাশা। কারখানার দেয়াল জুড়ে দাবিপত্র। প্রতিদিন একই দৃশ্য। নীরবে প্রতিটি ভোরে কারখানার সামনে সেই নৈরাশ্যপীড়িত জমায়েতের মুখোমুখি দাঁড়াত সুবিনয়। মাঝে মাঝে তারও মন কেমন ডুবজলে নেমে যেত। বুকটা গ্রীষ্মের প্রান্তরের মতো শূন্য লাগত, তবু তারই

মুখ চেয়ে এতজন শ্রমিক—সে এদের নেতা—এই বোধ সর্বক্ষণ তাকে উস্কে রেখেছে। পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আনছেন কার্ল মার্কস। আরো কত লড়াই পড়ে আছে। এ তো সামান্য একটা কারখানার কয়েকজন শ্রমিক, আর লড়াইটাও ছোটো—যার কথা খবরের কাগজে খুব ছোটো হরফে বেরোয়। এই সব ভেবে সুবিনয় মনের জোর ফিরিয়ে আনত।

যদি সত্যিই কারখানা গুজরাটে চলে যেত, কিংবা হত হাতবদল? সে অবস্থার কথাও ভেবে রেখেছিল সুবিনয়। রমলার সেলাই-ফোঁড়াইয়ের হাত ভাল, তাকে একটা সেলাই-মেশিন কিনে দিত সে। মুনিয়াকে ইস্কুল ছাড়িয়ে আনত। আর তার অবশ্য একটু পুরোনো এল-এম-ই ডিপ্লোমা আছে—কিন্তু সে মার্কামারা লোক বলে এবং কারখানাগুলির অবস্থা ভাল না বলে কিছুতেই চাকরি পেত না—ফলে সে হয়ে যেত পার্টির হোলটাইমার। বাড়িটা তার নিজের। পাকিস্তান হওয়ার পর বাবা সেখানকার সম্পত্তির সঙ্গে বদল করে বাড়িটা পেয়েছিলেন। অনেকটা জমি, বাগান। বাড়িটা বরাবরই তাকে পার্টির হোলটাইমার হতে এক ধরনের জোর দিয়েছে।

কিন্তু অতটা কিছু হয়নি। কারখানা খুলেছে। সুবিনয় লড়াইটা জেতেনি। শ্রমিকেরা দু'দলে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু করে। অবস্থাটা সামলে দেওয়া যায়নি। মালিক সুযোগ বুঝে তাদের ডেকে কয়েকটা এলেবেলে শর্ত মেনে নিল, 'আপনারাই তো জিতলেন' এরকম একটা না ভাব করল। সেই ভানটা বজায় রাখতে হল সুবিনয়দেরও।

অবশেষে কারখানা খুলেছে।

ইন্‌স্‌পেক্‌শন ডিপার্টমেন্টের ঘরটির দুই দিকে কেবল কাচের আবরণ; আলোয় টৈ-টুম্বুর ঘর। বাইরে এখনো সকালের কুয়াশার আবছায়া, রোদ রাঙা। সেই রাঙা রোদে ঘরে একটা আনন্দিত উৎসবের আভা। সুবিনয় খুব মন দিয়ে একটা যন্ত্রাংশের মাপ নিচ্ছিল। টেবিলে এক পাশে একটা গরম চায়ের কাপ। হাতের কাজটি নামিয়ে রেখে সে চায়ে চুমুক দেয়। অসম্ভব সুন্দর সকাল বেলাটিকে দেখে। এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলে তার কেবলই মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে। মানুষের জন্য মস্ত লড়াই পড়ে আছে এশিয়া জুড়ে, আর সে পড়ে আছে কোন কোণে। তার শোয়ার ঘরে মাথার কাছে আছে কার্ল মার্কসের একখানা ছবি। স্মিত মুখ, তৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী। যতবার সেই মুখ মনে পড়ে ততবার সুবিনয় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয়, এ ঠিক জীবন নয়,

অন্যতর এক জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য। পূর্ব এশিয়ার যোজন জুড়ে শকুনের ডানার ছায়া। মুক্তি আনবেন কার্ল মার্কস। কাচের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে কুয়াশায় জড়ানো রোদ, সুন্দর সকাল, সুবিনয় অন্য মনে চেয়ে থাকে, চায়ে চুমুক দেয়।

—সুবিনয় চৌধুরী—ইন্স্পেকশনের সুবিনয় চৌধুরী—আপনার ফোন—ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে—শীগগির যান—

ডিপার্টমেণ্টের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে। ঝামেলা। কথায় কথায় ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে যাওয়া সুবিনয় পছন্দ করে না। লোকটা শত্রুপক্ষের। যদিও সুবিনয়ের এই চাকরিটা পাওয়ার পিছনে লোকটার হাত ছিল এক সময়ে। কিন্তু এখন দেখা হলেই ভ্রূ কোঁচকায়, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আগে 'সুবিনয়' বলে ডাকত, এখন ডাকবার নিতান্ত দরকার পড়লে 'মিস্টার চৌধুরী' বলে ডাকে।

ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখে আজ একটু ভাবান্তর ছিল। ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, তবে সেটা বিরক্তিতে নয় দুশ্চিন্তায়। সুবিনয়কে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলল—দেখুন।

একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠ গলা আক্রমণ করে তাকে—কে! সুবিনয় চৌধুরী? আমি—আমি পরাগ বলছি কাকাবাবু—

—পরাগ! ভারি অবাক হয় সুবিনয়—কে পরাগ?

—আমি সান্যালদের বাড়ির পরাগ—আপনাদের পাশের বাড়ি—

—ওঃ। কী ব্যাপার?

—একবার শীগগীর আসুন—

কেমন একটু অনিশ্চয় লাগে সুবিনয়ের, পা দুটো কাঁপে, বুক কাঁপে, গলাটা ঠিক নিজের গলার মতো শোনায় না—ওঃ। কী হয়েছে।—অ্যাঁ, কী ব্যাপার?

—তেমন সিরিয়াস কিছু না, ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেণ্ট—

—কার?

—মুনিয়ার।

ফোনটা অন্যমনস্ক সুবিনয় ক্র্যাডলে না রেখে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে নিলেন বললেন—চলে যান। আমি ছুটির ব্যবস্থা করছি—

বড় অসহায় বোধ করে সুবিনয়, কয়েক পলকের জন্য ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু লোকটিকে ঠিক চিনতে পারে না।

শীতের বেলা পড়ে এল। বড় বিলের ওপারে সূর্য ডুবছে। সি-সি-আর-এর রেল-লাইনের পাথরে গাঁইতি চালিয়ে ক্লান্ত দুটি লোক উঁচু রেলপথের ধারে ঘাসের ঢালু জমিতে একটু জিরোতে বসে। বিড়ি ধরায়। আকাশে কাচ-স্বচ্ছ কোদালে মেঘের রক্তিম খণ্ডগুলির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমের দিগন্ত জুড়ে এক নিস্তব্ধ বিশাল রক্তারক্তি কাণ্ড। তারা দুজন খোলা প্রকৃতির রোদ কিংবা বর্ষার বিস্তর দৃশ্য দেখেছে। তাই অবাক হয় না, মুগ্ধও না। কেবল কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নেয়। সি-সি-আর-এর উঁচু রেলবাঁধের তলায় নিশ্চিন্দার রাস্তা বেয়ে একটা রিকশা ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে। লোক দুটির একজন থুথু ফেলে বলে—ঐ দেখ, হামিদ ডাক্তার চলেছে।

—আই। অন্যজন বলে।

—গত বছর খুব বাঁচিয়েছিল মোকে, বুইলে?

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তারা নীরবে রিকশাটাকে লক্ষ করে। ধীরে ধীরে রিকশাটা দৃষ্টির বাইরে যায়।

তখন একজন অন্যজনকে বলে—বুইলে, গত বছর বোশেখের ঝড়ে মোদের দক্ষিণের আমবাগানে আম পড়েছিল মেলাই। মাঝরাতে উঠে দৌড়ে গেনু। অন্ধকারে ভাল ঠাহর হয় না, হাতড়ে হাতড়ে তুলছি কোঁচড়ে, একটাতে কামড় বসাতেই জিবটা একটু চিন্ চিন্ করলো। তেমন কিছু বুইতে পারিনি তখনো। দু চার কামড় খেতেই পেটে গোঁতলান, মুখে লোত, সারা শরীরে জ্বালা-জ্বালা। ঘণ্টাটেকের মধ্যেই মুখে গাঁজলা উঠে এল। রাত না পোয়াতে জি-টি রোডের এক লরী ধরে মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল, তা সেখানেও জবাব দিয়ে দিলে, বললে—এ তো বিষক্রিয়া, চিকিচ্ছের বাইরে গেছে। হাসপাতালেই মরি আর কী। সে সময়ে তো আর চৈতন্য ছিল না, পরে শুনেছি। আমার বাপ-ভাই বাইরের ফুটপাথে বসে কাঁদছে, একজন পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে সব শুনে-টুনে বলল, মরবেই যখন তখন একবার হামিদকে দেখিয়ে মরুক। দূর তো নয়। তাই হল। আধমরা আমাকে টেনে নিয়ে এল ওই হামিদ

ডাক্তারের কাছে। সে বেশী কথা-টথা বলেনি, আমার পা হু'খানা কেবল নেড়েচেড়ে দেখে ঠিক হু'পুরিয়া অষুধ দিলে। বললে, এক পুরিয়া কষে ঢেলে দাও, ভিতরে যাবে না—না যাক্, ওতে যদি কাজ হয়, যদি চোখের পাতা ফেলে কি পা নাড়ে তো কাল সকালে আর এক পুরিয়া······সাত দিন বাদে আমি পা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম।

—ধন্বন্তরী। অন্যজন বলে।

—আই। আর একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পরনে চেক লুঙ্গি, সাদা ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি, শীতকালে কাঁধে একটা তুষের চাদর খালি পা গালে রুক্ষ দাড়ি। তীক্ষ্ন নাকখানা, তাঁর একজোড়া চোখ। এই হচ্ছে ডাক্তার হামিদ, জি-টি রোডের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ, যার সম্বন্ধে বিস্তর কিংবদন্তী ছড়ানো রয়েছে গ্রামে, গঞ্জে, সমবায় পল্লী, ঘোষপাড়ায়। লোকে পথ চলতে চলতে, কিংবা চায়ের দোকানে বসে, সেলুনে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে সেই সব কিংবদন্তীর কথা বলে, শোনে। আবার যে যার পথে চলে যায়। গ্রামে, গঞ্জে, পল্লীতে, পাড়ায় পাড়ায় লোকে রোগ-ভোগের ভয় থেকে আত্মরক্ষা করে ডাক্তার হামিদের কথা ভেবে। হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়।

হাসপাতাল থেকে মুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। এখন তাদের বাসার বারান্দায় তাকে শোয়ানো হয়েছে। ঠোঁট দুটি নীল। বেলাশেষের আলোয় সেই ডালিম গাছটার ছায়া এসে একটুখানি স্পর্শ করেছে মুনিয়ার পা।

বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে সুবিনয় কিছুই লক্ষ করতে পারছিল না। বহু চেষ্টার পর হাসপাতালের ডাক্তার একবার দাঁতে ঠোঁট চেপে হতাশায় আক্ষেপ করে বলেছিল—ডেড্! কিন্তু সে কথা সুবিনয়ের বিশ্বাস হয়নি। ডেড্! কথাটা কেমন যেন! একটা ভারী পাথর খুব গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

একটু পরেই মুনিয়াকে নিয়ে যাবে সবাই। তবু সবাই অপেক্ষা করছে হামিদ ডাক্তারের জন্য। যদি হামিদ পারে! যদি হামিদ পারে!

সুবিনয় এক কোষ জল-বমি করেছে বারান্দার ধারে বসে। এ শরীর যেন আর তার শরীর নয়, এমনই আলগা শিথিল তার হাত পা। কেউ

একজন তার কাঁধে হাত রেখে বলছে—ভরসা রাখো। এখনো হামিদ আছে। সে এল বলে।

হামিদ! সুবিনয় যেন বা এ নাম আগে শোনেনি। কে হামিদ? কোথা থেকে সে আসবে! সুবিনয় মুখ তুলে পশ্চিমের আকাশে রক্তিম মেঘখণ্ডগুলি দেখে। মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর তীব্রচ্ছটা বহুদূর নীলিমার ব্যাপ্ত। ঐ কি হামিদের পথ। সে কি রথে আসবে!

মাথাটা কেমন টলমল করে সুবিনয়ের। রমলাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে —কেঁদো না। হামিদ আসছে। হামিদ আসছে। ঐ দেখ, চরাচর জুড়ে হামিদের জন্য পাতা হয়েছে পথ। আসছে হামিদ। মুনিয়া অনেক বড় হবে—দেখো।

বুড়ো রিকশাওয়ালা খলিল ঝুঁকে প্যাডল্ মারে, শরীর কাত করে শরীরের ভার দেয় প্যাডলের ওপর। রিকশা ধীরে ধীরে চলে। বুড়ো খলিল কেবল কাশে আর কাশে। রিকশা ধীরে চলে।

রিকশা এসে দাঁড়ায় মুনিয়াদের বারান্দার ধারে, গোলাপী বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ের তলায়। রঙীন পাপড়িগুলি শীতের বাতাসে খসে পড়ছে। পাপড়ি খসে পড়ে হামিদের গায়ে, তুষের চাদরে, রিকশার হুডের ওপর। চাপা গুঞ্জন ওঠে—হামিদ! ঐ তো হামিদ।

সুবিনয় মুখ তোলে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে হামিদকে দেখে, দেখে তার বুড়ো রিকশাওয়ালাকে। ডেড্—এই কথাটা আবার হঠাৎ ভারী পাথরের মতো গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়।

ডালিম গাছের ছায়া কখন এগিয়ে গেছে অনেকটা। তার রঙ গাঢ়। সিঁদুরে মেঘের আভায় আলোর ভিতর দিয়ে গাঢ় কালো ত্রিশূলের মতো ছায়া বিদ্ধ করেছে মুনিয়ার বুক।

খলিল দেখেছে অনেক। সে জানে, সময়মতো হামিদের হাতে পড়লে মানুষ মরে না। তবু মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। নিজেদের শরীরে রোগের লক্ষণ তারা দীর্ঘকাল বুঝতেই পারে না। বুঝতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তারপর অ্যালোপ্যাথির বিষ জমায় শরীরে। রোগের লক্ষণ চাপা পড়লে ভাবে—সেরে গেল। অ্যালোপ্যাথ জবাব দিলে তখন অনতিক্রমণীয় মৃত্যুকে ভোজবিদ্যায় ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারা ঈশ্বরের মতো

হামিদকে খোঁজে। তাই, মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। মাঝে মাঝে খলিল তার ছানির গ্রহণলাগা চোখে হামিদের মুখখানা বড় মমতাভরে দেখে। দেখে, হামিদের মুখে নানা চিন্তার দৃশ্য। বাচ্চা লড়ছে রোগের সঙ্গে। মানুষের জটিল দেহযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে হামিদ। লড়াই জমেছে খুব। খলিল তার বুড়ো শরীর হেলিয়ে প্যাডল্ মারে আর আপনমনে হাসে। মনে মনে সে আল্লার দয়া ভিক্ষা করে। প্রতিটি লড়াই জিতে আসুক হামিদ। মানুষের ঘরে ঘরে তার নামগান হোক।

ফেরার পথে রিকশা আরও ধীরে চলে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় কাঁচাপথে রিকশা টাল খায়। শীতের বেলা ফুরিয়ে আসে হঠাৎ। উঁচু রেলবাঁধের ছায়ায় ঝমকো আঁধার নামে পথে। গ্রহণলাগা চোখে সমুখের দিকটা ঠিক ঠাহর হয় না। খলিল রিকশা থামিয়ে নামে, কাঁপা হাতে কেরোসিনের ছোট বাতিটা জ্বেলে নেয়। একপলক হামিদকে দেখে। মুখটা হুডের তলাকার অন্ধকারে, ঋজু রোগা দেহটি স্থির, কোলের ওপর সেই চামড়ার পুরোনো ওষুধের বাক্সটি। ঐ স্থির মূর্তি দেখলে খলিলের বুকটা ভয়ে আর সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। আল্লার প্রেরিত পুরুষ ঐ বসে আছে তার রিকশায়। এই ধন্বন্তরীকে সে-ই নিয়ে যায় গ্রামে, গঞ্জে, পাড়ায়, পল্লীতে। মিঞা হামিদ—এই নামে কত অন্ধকার বুকে আলো জ্বলে ওঠে! তবু যে মানুষ মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। খলিল তার বুড়ো শরীর নিয়ে আবার রিকশায় ওঠে। প্যাডল ঠেলতে ঠেলতে বিড়বিড় করে—আল্লা, হামিদকে আরো শক্তি দাও। তার দুই হাত আলোর তলোয়ার হয়ে উঠুক।

যে দিন হামিদের রুগী মরে সেই রাতে খলিল তীব্র আবেগে, গভীর তৃষ্ণায় মদ খায়। জ্বালাময় অন্ধকারে তার শরীর ভেসে যায়। তারপর ক্রমে তার মাথার ভিতরে একটি আলোর ফুলঝুরি ফেটে পড়ে। সে হয়ে যায় চুর-চুর এক আনন্দিত মাতাল।

ফেরার পথটা দীর্ঘ চড়াইয়ের মতো কষ্টকর। ফুটফুটে মেয়েটা মারা গেল। বাঁচল না। খলিল বিড়বিড় করে—হামিদ কী করবে! হামিদের কোনো দোষ নিও না তোমরা—

মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা তৈরি হয়েছে। মুনিয়ার বন্ধুরা সাজিয়ে দিচ্ছে তাকে। কপালে টিপ, চন্দনের ফোঁটা। এলোচুল আঁচড়ে দুটি বেণী ছড়িয়ে

দিয়েছে দু ধারে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মুনিয়াকে। বোগেনভেলিয়ার পাপড়ি ঝরে পড়ছে শীত বাতাসে, উড়ে এসে রঙীন প্রজাপতির মতো বসছে মুনিয়ার খাটে, শরীরে, চুলে।

খাটের পায়া ধরে পড়ে আছে রমল। যেতে দেবে না। পাড়ার বউ-ঝিরা ছাড়িয়ে নিচ্ছে তাকে। সুবিনয় এ সব কিছু দেখছে না। হামিদ নামে একজন অলৌকিক পুরুষের আসার কথা ছিল। আকাশে তৈরি হয়েছিল তার আলোকিত পথ। সেই পথে কেউ আসেনি। এক বিশাল শকুন তার ডানা বিস্তার করেছে, চরাচর জুড়ে তারই ছায়া।

নিহত মুনিয়ার শেষ ভেলা চারজন বাহকের কাঁধে দুলে দুলে ভেসে যায়।

অনেক রাতে মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা ফিরছিল। তারা শুনল, চৈতল-পাড়ার পথে পথে ক্ষুব্ধ এক বুড়ো মাতালের চীৎকার। চুর-চুর মাতাল খলিল চেঁচিয়ে বলছে—তোমরা সাক্ষী আছো। আমি হামিদের এক ফোঁটা ওষুধও কখনো খাইনি। আমি যদি মরি তবে তার দোষ যেন হামিদকে না অর্শায়। হামিদ ধন্বন্তরী—হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়—বিশ্বাস করো—

অনেক রাতে, ঘুমোবার আগে হামিদ তার সাদা, ছোট, সহজ সরল বিছানাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, নমাজ পড়ার মতো পবিত্র ভঙ্গীতে। প্রতিদিন ঘুমোবার আগে সে এই কথা বলে—আল্লা, আমি তোমার সমকক্ষ নই। মানুষকে তুমি এই বিশ্বাস দিও যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তার সমকক্ষ নয়।

দুই

মাঘের শেষে এক মাঝরাতে পরাণের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে দেখতে পায় বুকের ওপরে আকাশ। গভীর সমুদ্রের মতো অথৈ। নক্ষত্রের আলো কাঁপছে। ত্রিপলের একটা কোণ উত্তরের বাতাসে উড়ে গেছে। শীত করছে খুব। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে উঠে বসে পরাণ। এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে

রেখেছিল। বালিশের পাশ থেকে সেই প্যাকেট তুলে অনভ্যাসের একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর মৃদু শব্দে একটু কাশে।

সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সানাই বেজেছে, বেজেছে উলুধ্বনি, হাসি, নানা শব্দ। সন্ধ্যারাতে ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। এখন রাত গভীর। ছাদের ওপর ঘুম ভেঙে বসে আছে পরাগ। মাথার ওপর ছাদের ত্রিপলের একটা কোণ উড়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীচে এঁটো পাতা নিয়ে ঘেয়ো কুকুরদের গম্ভীর ঝগড়ার আওয়াজ।

পরাগ অপলক চোখে অথৈ আকাশটুকু দেখে। এ রকম মধ্যরাত্রির আকাশ এমন বিরলে সে আর কখনো দেখেনি। আজকাল আর হইচই ভাল লাগে না তার, তাই শোওয়ার সময়ে সে একটা চেয়ারের গদি আর কম্বল টেনে নিয়ে এসে ছাদে শুয়েছিল। এখন বুঝতে পারে, এই ভয়ঙ্কর শীতে আর ঘুম আসবে না। সে বসে থেকে সিগারেট খায়, আর অপলক শূন্য চোখে আকাশ দেখতে থাকে।

কোথায় যেন একটা কাশির আওয়াজ হয়, নাল-পরানো জুতোর আওয়াজ, মাটিতে লাঠি ঠুকবার শব্দ। পরাগ উঠে ছাদের আলসের ধারে আসে। অন্ধকারে ঝুঁকে দেখে, মুনিয়াদের বাইরের বারান্দার অন্ধকারে কে যেন বসে আছে। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠে। লোকটা সিগারেট ধরায়।

পরাগ ডাকে—কাকাবাবু।

—উঁ। সুবিনয় উত্তর দেয়।

—এখনো শোননি! রাত দুটো বেজে গেছে।

সুবিনয় গলার মাফলারটা ভাল করে জড়ায়, পায়ের মোজাটা একটু টেনে তোলে। তারপর বলে—ঘুম আসে না।

হাতের টর্চটা জ্বেলে চার দিক একবার দেখে নেয় সুবিনয়, তারপর বলে—তুমি ঘুমোওনি?

—আমি ছাদে শুয়েছিলাম, কিন্তু এখানে বড় শীত। ঘুম আসছে না।

—হুঁ। এবারে শীতটা খুব পড়ল।

বাতাসে ত্রিপলের কোণটা উড়ে ফটাস শব্দ করে। তারা কেউ চমকায় না।

পরাগ চাপা গলায় বলে—এই অন্ধকারে কি আর খুঁজে পাবেন? এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—যাই। উত্তর দেয় সুবিনয়, কিন্তু ওঠে না। বসে থাকে।

মুনিয়া মারা গেছে এক মাস। প্রায় এক মাস ধরে সারা দিন সুবিনয় শাবল আর লাঠি হাতে বাগানে ঘুরেছে। খুঁড়েছে গাছের তলা, মাটির ঢিপি, ইঁদুর আর ছুঁচোর গর্ত। প্রথম প্রথম সঙ্গে পরাগ থাকত, থাকত পাড়ার উৎসাহী ছেলেমেয়েরা, যারা ভালবাসত মুনিয়াকে। ক্রমে ক্রমে সবাই যে যার কাজে ফিরে গেছে। এখন একা সুবিনয় সারা দিন সাপটাকে খোঁজে। গভীর রাত পর্যন্ত। আজকাল বড় একটা ঘুম আসে না।

পরাগ তার কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নেমে আসে। বারান্দা থেকে পাখীটা তীব্রস্বরে ডাকে—'পরাগ।' পরাগ নেমে আসে, সদর খুলে বেরোয়।

—কাকাবাবু এই নিন এক প্যাকেট সিগারেট। আপনার জন্য রেখেছিলাম।

খুশী হয় সুবিনয়। হাত বাড়িয়ে নেয়। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বলে—মুনিয়া বেঁচে থাকলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম, বুঝলে পরাগ! মনে মনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম।

শীত বাতাস বয়ে যায়।

—এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। শীতকাল—এখন সাপেরা বড় একটা বেরোয় না।

—তাই হবে। সুবিনয় বলে বসে থাকে। তারপর বলে—তুমি যাও। আমি আর একটু দেখে গিয়ে শুয়ে পড়বো। যতক্ষণ ওটা আছে ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাই না।

পরাগ ওঠে। খুব শীত বলেই কিনা কে জানে তার চোখে জল আসতে থাকে।

একা আরো কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকে সুবিনয়। তারপর টর্চবাতিটা জ্বালে। ব্যাটারীর জোর কমে গেছে, আলোটা স্নান। টর্চটা ঘুরিয়ে সামনের মাঠটা একটু দেখে, বাগানের বেড়ার ধারে যায়। লেবুগাছ আর ডালিমগাছের গোড়া থেকে আলো সরিয়ে নেয়। দত্তদের বাড়ি উঠছে, তাদের ইঁটের পাজাটা দেখে সুবিনয় পথে নামে। পরাগদের বাড়ির সামনে ঘেয়ো কুকুরদের ভিড়কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। বন্ধ ডাক্তারখানার চাতালে একজন মাতাল বসে আছে। সুবিনয় এগোয়। পুলিস-ব্যারাকের পিছনের দেয়ালের সামনে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে মোমবাতি আলকাতরার টিন, তুলি। কী লিখছে!

টর্চের আলো ফেলে সুবিনয় দাঁড়াতেই ছেলেগুলো রুখে মুখ ফেরায়।

—কে ?

এ পাড়ারই ছেলে। তাকে চিনতে পারে। একজন এগিয়ে এসে বলে—আমরা কাকাবাবু। আপনি কী খুঁজছেন—সেই সাপটাকে ? ওটাকে কি আর পাবেন ! বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

সুবিনয় টর্চের আলো ফেলে দেয়ালে বলে—এসব কী লিখছো ?

—তেমন কিছু না। আপনি বাড়ি যান কাকাবাবু। আমরা লিখি।

সুবিনয় লেখাগুলো পড়ে। ঠিকঠাক কিছু বুঝতে পারে না।

—লিখছো ! আচ্ছা লেখো। বলে সুবিনয় আবার এগোয়। রেলরাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। আবার ফিরে আসে। চার দিকেই অন্ধকার, নির্জনতা।

দিন কেটে যায়।

তখনো অন্ধকার ঝুলে আছে চারদিকে, ভোর রাত্রে পরাগের চন্দনা পাখীটা ডাক দেয়—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগের আলস্যজড়িত ঘুম ভাঙে। উঠতে ইচ্ছে করে না। পাখীটা ডাকে, ডাকতেই থাকে। বিরক্ত পরাগ পাশ ফিরে ধমক দেয়—এই, চুপ্ !

পাখীটা ডানা ঝাপটায়, কিন্তু আবার ডাকে পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

উঠতে ইচ্ছে করে না। সকালের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যটি আর দেখা যায় না। মুনিয়াদের বাগানে মুনিয়া। কী হবে বড় হয়ে আর ? পরাগের আর বড় হতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতরে এক গ্রীষ্মের প্রান্তরে হু-হু করে হাওয়া বয়ে যায়।

পরাগ পাশ ফিরে শোয়। সিগারেটে এখন তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বালিশের পাশেই থাকে প্যাকেট। সে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খায়। কিন্তু পাখীটা ডাকতেই থাকে—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগ চুপ করে থাকে। একবার ভাবে, উঠবো না—ভেলোয়াড় হবে আমার কী হবে ! আর একবার ভাবে উঠি। ভাবতে ভাবতে তার শীত করে। লেপটা মুড়িসুড়ি দিয়ে শোয়। মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না। তাই শুয়ে সিগারেট টানে পরাগ। এই অনিয়ম দেখে তার

চন্দনা পাখীটা রেগে গিয়ে ডানা ঝাপটায় আর ডাকে। ডানা ঝাপটায় আর ডাকে।

হঠাৎ মাথার ভিতরে একটি ঘন সবুজ মাঠের দৃশ্য ফুটে ওঠে। উঁচুতে একটা সাদা বল। সেই বলের দিকে লাফিয়ে উঠছে কয়েকজন লাল-সোনালী-নীল-লাল জার্সি পরা খেলোয়াড়। হঠাৎ উষ্ণ একটা রক্তস্রোতে পরাগের শরীর ভেসে যায়। এ বছর পরাগকে ডেকেছে কলকাতার বড় একটা ফুটবল ক্লাব।

ভাবতে ভাবতে পরাগের শরীর চনমন করে। সেই উষ্ণস্রোত তার শরীরের শীতভাব দূর করে দেয়। সে উঠে তার শর্টস পরে, পরে নেয় কেডস্, তার পাখীটি চুপ করে দেখে। খুশী হয়।

মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না।

পরাগ এ বছর কলকাতার বড় একটা ক্লাবে খেলবে।

ভোরবেলা বহু দূরে এক কারখানার ভোঁ বাজতে থাকে।

সুবিনয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রমলা একটা সেলাই মেশিন কিনবে। দুজনের চলে যাবে কোনক্রমে। সারাদিন এবং রাত পর্যন্ত সাপটাকে খোঁজে সুবিনয়। ঘুম আসে ভোর রাত্রে।

দাড়িওয়ালা, স্মিতমুখ কার্ল মার্কসের ছবিখানা এখনো তার শিয়রে টাঙানো, মাঝে মাঝে সে ঘুম-জড়ানো চোখে ছবিখানার দিকে চায়। অস্ফুট গলায় বলে—আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতুম আমার মুনিয়াকে। আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়। আমার এ অপরাধ ক্ষমা কোরো।

ক্রমে কার্ল মার্কসের ছবিখানায় ধুলো পড়ে। এক দুঃসাহসী মাকড়সা লাফ দিয়ে উঠে আসে, তারপর স্মিতহাস্যময় সেই মুখের ওপর তার অমোঘ জালখানা বুনতে শুরু করে।

ডুবুরী

আঁচিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেই থমকে গেল টুনু। বাঁশের মাচার ওপর বিছানায় মাথা গুঁজে মা কাঁদছে। একটু আগে তাদের খেতে দিয়ে মা পুকুরে গিয়েছেন স্নান করতে। এখনো মা'র শাড়িটা ভেজা। মাটির মেঝেটা শাড়ির জলে অনেকটা ভিজে গিয়ে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। সেই কাদা মা'র হাঁটুর কাছে আর গোড়ালিতে লেগে আছে। মেঝেতে বসে উঁচু হয়ে ময়লা কাঁথা আর শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তৈরী-করা চাদরের বিছানায় মুখ গুঁজে মা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মাকে কাঁদতে এই প্রথম দেখছে না টুনু, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে কিংবা বাবা মারলে মা চিৎকার করে সারা কলোনীকে জানিয়ে কাঁদতে বসে। কিন্তু এইভাবে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কান্নাটা অন্যরকম। টুনু ভয় পেয়ে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল তার।

টুনু ফিসফিস করে ডাকে—'মা, ওমা, মা।' মা উত্তর দেয় না। টুনু আস্তে আস্তে মার কাছে এগোয়—'মা, কান্দ ক্যান্ গো? কি হইছে?

কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মা'র খালি পিঠের পাতলা চামড়া ভেদ করে পাঁজরের হাড়গুলো গিরগির করে উঠছে। টুনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে ওঠে সে—'কি হইছে কওনা ক্যান্?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মা'র কান্না থেমে যায়। সোজা হয়ে বসে মা। ভেজা মাথার চুল থেকে কেঁচোর মতো মোটা মোটা ধারায় জল এঁকে বেঁকে নেমে চোখের জলের সঙ্গে মিশে হাড়-উঁচু শুকনো মুখের থুতনিতে এসে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে।

টুনু চেয়ে থাকে। মা'র গলার কাছটা ফুলে ফুলে উঠছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই চোখের জল হাত দিতে মুছে মা বলে—'কিসু হয় নাই, চিক্কইর দিস না।'

—'কিসু হয় নাই, তবে কান্দ ক্যান্? কি হইছে কওনা আমারে।'

—'কইলাম তো কিছু হয় নাই। খাইছস্ নি প্যাট ভইরা ?'

টুনু এগিয়ে গিয়ে মা'র কাছে, খুব কাছে দাঁড়ায়। তারপর সোজা হয়ে মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে বারো বছরের টুনু বিজ্ঞের মতো বলে—'কি হইছে কওনা আমারে।'

—'চুপ চুপ, আস্তে। কেউ য্যান্ শোনে না।' মা তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলে—'তর বাবায় ট্যার পাইলে কিন্তু আস্তা রাখবো না। দুলটা পুকুরে হারাইছি।'

টুনু বুঝতে পারে। কেননা, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, মা'র বাঁ কানের লতিটা শূন্য। ওখানে একটু আগেও ঝকঝকে সোনার দুলটা দুলছিল। যদিও মা'কে খুব বে-মানান লাগছিল। হাড়-উঁচু মুখ, প্রায় ন্যাকড়ার মতো জ্যালজেলে ময়লা শাড়ি আর রুক্ষ তেল-না-দেওয়া চুলের সঙ্গে দুলটার কোনো মিল ছিল না। কাল রাতেও বাবা ঠাট্টা করে বলেছে—'গোবরে পদ্মফুল। মাইনষের যেমুন দুল চাই, দুলেরও হেমুন মানুষ চাই। সাজলেই হয়না গো মাইজ্যা বউ।' এ সব কথায় মা রেগে গিয়েছিল খুব। রাগ করে বলেছে—'হগো হ' শরীল যে গেছে হেই দোষটা আমারে না দিয়া বুঝি শান্তি পাও না। মাইয়ামানুষ পালতে গেলে মুরাদ চাই, বুঝলানি! কয় ট্যাহা রোজগার কর তুমি যে, শরীল তুইল্যা কথা কও!' কিন্তু ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত খুব সাংঘাতিক হয়নি। কারণ কাল সুভাষ পল্লীর হারান জ্যাঠার মেয়ে লতিদির বিয়েতে গিয়েছিল দুজন। তা না হলে কিভাবে মা'র একটা একটা গয়না নিয়ে বিক্রি করে সংসার খরচ চালিয়েছে, বাবা সে কথা না বলে এবং বুক চাপড়ে না কেঁদে মা থামত না।

কাল রাতে মা তার বহু পুরোনো লাল রঙের ওপর সাদা জরির তারাফুল তোলা বেনারসীটা পরে বাবার সঙ্গে লতিদির বিয়েতে গিয়েছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণে গেলেই মা বেনারসীটা পরে আর কানে ঐ দুলজোড়া। এছাড়া মা'র আর ভাল পোশাক নেই, গয়নাও নেই, শুধু, হাতে কয়েক গাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি ছাড়া।

কাল রাতে সুভাষ পল্লীতে হারান জ্যাঠার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে মা আর দুলজোড়া খুলে রাখেনি। কাল রাতে মা'র মুখটা হাসি-হাসি ছিল। বাবার মেজাজ ভাল ছিল কাল।

কিন্তু আজ ? ভাবতেই টুনুর গাটা শির শির করে।

রোগা হাড়-বের-করা মায়ের দিকে তাকায় টুনু। বলে—'ভাল কইরা খুইজ্যা ছাখছ নি? অন্ত কোনোখানে পড়ে নাই তো?'

মা চাপা গলায় বলে—'চুপ। আস্তে কথা কইতে পারস না? বুল্‌কি আর পানু যদি শুইন্যা ফ্যালায়?'

টুনু রান্নাঘরের দিকে তাকায়। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বেড়াগুলো পুরোনো হয়ে ভেঙে গেছে এদিকটায়। পানুর ডোরাকাটা শার্ট আর বুল্‌কির সবুজ রঙের ফ্রকের অংশ দেখতে পায় সে।

—'না, শুনবো না। অরা অখনো পাকঘরে। খাইত্যাছে।'

—'শয়তান দুইটা। শুনলেই বাপের কানে লইয়া তুলব।'

বাবার ভয়ে মা সিঁটিয়ে যাচ্ছে যেন। মা'র চোখের পাতাগুলো পড়ছেই না। টুনু চুপ করে থাকে।

বাবাকে সে চেনে। খুব ভাল করেই চেনে। চারদিকের সবকিছুর ওপর বাবা যেন সবসময়ে ক্ষেপে আছে। টুনু একবারের বেশী দুবার ভাত চাইলেই বাবা চিৎকার করতে থাকে—'হ, সোয়াস্তার গিল্যা খাসী হইতাছ; ল্যাখা-পড়ার নামে তো লবডঙ্কা! যাগো ল্যাখন-পড়ন হয়, তারা স্তার-সোয়াস্তার চাউলের আহার করে না।' কিংবা কখনো কেউ কোনো জিনিষ ভেঙে ফেললে বাবা বলে—'কিরে বাসী, ঠাকুর্দার জমিদারির জিনিস পাইছ নাকি নিব্বইংশা পোড়ারমুখা—'

বাবার রুদ্র মূর্তির কথা মনে পড়তেই টুনু শিউড়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল—'আর একবার খুইজ্যা ছাখবা না?

মা বলে—'হ, আর একবার খুজুম। তুইও চ' দেখি আমার লগে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—'ঘাটে কেউ নাই অখন। একলা ডুব দিতে ডর করে।'

টুনু মনে-মনে হাসে। মা সাঁতার জানে, কিন্তু ডুব দিতে মা'র ভীষণ ভয়।

ঠিক দুপুর। নিস্তরঙ্গ সবুজ জল। কয়েকটা শুকনো পাতা জলের ওপর ভাসছে। খুব নির্জন চারদিকে। কেউ কোথাও নেই।

টুনু বলে—'কোন্‌খানে?'

কাটা সুপুরিগাছ আর বাঁশ দিয়ে তৈরীকরা সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে পা দিয়ে মা ইতস্তত করে। চারদিকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

টুনু আবার বলে—'কোনখানে মা ?'

মাঝখানের জলটা সবুজ, আর ঘাটের কাছে ঘোলা। কেউ বাসন মেজে গেছে সেই ছোবরাগুলো ছাই-কাদার মধ্যে পুকুরপাড়ে পড়ে আছে। কেমন যেন আঁষটে গন্ধ।

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে মা বলে—'এইখানেই পড়ছে। কিন্তু—'

আঁষটে গন্ধটা এড়াবার জন্যেই টুনু ঘাটের কাছ থেকে সরে এসে ঢেঁকির শাক আর কচুর জঙ্গলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

মা ঠিক কোমরজলে দাঁড়িয়ে আছে। পা ঘষে ঘষে খুঁজছে দুলটাকে। টুনু তাকিয়ে রইল। মা আর একধাপ নামল। জলের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে মা। কিন্তু জলটা ঘোলা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মা।

—'এমনই কপাল ! দুল কি পাওন যাইব ! তিন আনি আর তিন আনি—এই ছয় আনি সোনাই আছিল ঘরে। পোড়ার কপালে ছয় আনির তিন আনি গেল।' ঠিক গলাজলে দাঁড়িয়ে মা বলে—'ইচ্ছা করে বাকি তিন আনিও উন্দা মাইরা ফ্যালাইয়া দেই।'

কচুগাছের পাতা হাওয়ায় দুলে টুনুর পায়ে লাগে। কেমন সুড়সুড় করে যেন। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাকে দেখে টুনু। জলগুলো গোল চাকতির মতো মা'র চারদিকে, বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। মা'র মাথাটা একটুকরো কাঠের মতো জলের ওপর ভাসছে।

মার থুতনির কাছে জল এখন।

হঠাৎ মা চিৎকার ক'রে—'এই যে, কি জানি একটা পায়ে লাগল রে !'

মা ডুব দেয়। ছলাৎ করে খানিকটা সবুজ জল ফেনা তুলে সরে যায়। টুনু একলাফে ঘাটের কাছে এগোয়। জলের ঠিক ওপরের ধাপে কুঁজো হয়ে হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখে মা'র সাদা শাড়িটা সবুজ জলের ভিতরে মাছের মতো ডুবে যাচ্ছে। টুনু দম বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ জলটা অল্প ঢেউ তুলল। টুনু তাকিয়েই রইল।

হুস্ করে মাথা তুলল মা ! মুঠো-করা হাতটা জলের ওপর তুলে আঙুলগুলো আলগা করে দিল। মা'র হাতের চেটোয় ছোট্ট একটা লোহার স্ক্রু।

হাসি পায় টুনুর, কিন্তু হাসে না।

মা'র মুখটা এখন আরো সাদা, ঠোঁট দুটো চেপে লেগে আছে। মা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে এখন।

জুটা খুব জোরে আরো গভীর জলের দিকে ছুঁড়ে দেয় মা। ক্লান্ত স্বরে বলে—'দ্যাখ তো বুলকি আর পানু এদিকে আছে নাকি? আইলে কইস কিন্তু। আমি আর একটু খুঁজি।'

—'আইচ্ছা' জবাব দেয় টুনু। চারদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

মা'র সরু রোগা দেহটা আরো গভীর জলের দিকে সরে যাচ্ছে ঢেউ তুলে। ডিঙি নৌকোর মতো স্বচ্ছন্দ গতি, দু'পাশে সরু রেখার মতো ঢেউ তুলে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। জোড়া হাতে আর পায়ের আঘাতে জলে ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে আর ঢেউ উঠছে জলে। পায়ের কাছে দুটো ট্যাংরা মাছ মুখ তুলল। টুপ করে ডুবে গেল আবার।

—'আর দূরে যাইও না, মা।' টুনু চিৎকার করে বলে। ভয় করে তার।

—'আরে ডরস ক্যান'। গাঙপারের মাইয়া আমি, এত সহজে ডুবুম না।' মা বলে। জলের ওপর দিয়ে তার গলার স্বরটা কাঁপতে কাঁপতে এল। খুব ক্লান্ত স্বর। জলের জন্যেই বোধহয় ঠিক কাঁশির মতো শব্দ হল।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে টুনু দেখে মা টুপ করে ডুবে গেল। জলের নীচে এখন আর মা'কে দেখা যাচ্ছে না। তবু টুনু চোখ দুটো স্থির করে পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল। দুপুরের রোদ ওপারে নারকোল গাছের পাতায় লেগে ঝিকমিক করছে।

চোখ দুটো কর্ কর্ করে তার। চোখে জল আসে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষে টুনু তারপর আবার তাকায়।

এবার প্রথমে মা'র হাত দুটো সরু দুটো কাঠির মতো জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর মা'কে দেখা গেল। টুনু নিঃশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে দাঁড়ায়।

মা চিৎ হয়ে পা দিয়ে জল কাটে। চিৎ-সাঁতার দিয়ে পারের দিকে এগোতে থাকে। টুনু বুঝতে পারে যে, মা আর দম পাচ্ছে না।

পারে এসে কাদার মধ্যে সুপুরিগাছ আর বাঁশের সিঁড়িতে বসে হাঁফাতে থাকে মা। দুটো হাত দিয়ে ভর দেয় ছাইমাখা ছোবরা ছড়িয়ে থাকা নোংরা জায়গাটায়। শাড়িটা কাদায় মাখামাখি।

—'আর পারি না।' ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে মা বলে—'দম পাই না আর। পোড়া কপাইল্যা দুল! শরীলটায় পিছা মারে।'

—'আমি একবার দেখুম, মা ?'

—'দুর ! জলে নামলে ঠাণ্ডা লাগবো তর। আরে, কপালে নাই ঘি, ঠক্ ঠকাইলে হইবো কি !' খুব ক্লান্ত স্বরে মা বলে। পা দুটো জলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নোংরা মাটিতে হাতের ওপর শরীরের ভার রেখে মাথাটা ডান কাঁধে কাত করে দিয়ে মা বলে। মাথার চুলগুলো একদিকে সরানো। মা'র সরু ঘাড় আর ঘাড়ের ওপর তিনটে ঢিবির মতো উঁচু হাড় দেখতে পায় টুনু। মা'র জন্য কেন যেন ভীষণ কষ্ট হয় তার।

—'মা'—টুনু মা'র খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে মা'র পাশেই উবু হয়ে বসে চাপা গলায় বলে—'পরাণ মাঝিরে ডাকুম একবার ?'

—'কি হইবো হ্যারে ডাইক্যা ?'

—'একবার খুইজ্যা দেখবো।'

—'পয়সা নিবো না ? তখন পয়সা পামু কই ?'

একটু চিন্তা করে টুনু। বলে—'বেশী লাগবো না। দুলটা যদি পাওন যায়—'

—'হু, দে একবার খবর। বেশী জানাজানি হইলে কিন্তু আমার কপালে কষ্ট আছে।' মা খুব আস্তে আস্তে বলে। জল থেকে পা দুটো টেনে আনে মা। পা দুটো ভেজা, পায়ের পাতার নীচের চামড়াটা সাদা, কোঁচকানো—কাদার মতো নরম। মা একটা হাত উঁচু করে টুনুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'একবার ধর তো আমারে টুনু। শরীলটা য্যান কাঁপে আমার।'

টুনু মা'কে ধরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না মা। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। মাথাটা নুয়ে পড়ছে সামনের দিকে।

—'ওয়াক্'—হিক্কা ওঠে মা'র। টুনু মা'কে জড়িয়ে থেকে টের পায় যে মা'র শরীরের ভিতরটা গুরগুর্ করে কাঁপছে। মা'কে শক্ত করে ধরে থাকে সে। মাথার ভেজা চুলগুলো সামনের দিকে দড়ির মতো দুলছে। মুখটা সাদা।

আর একবার হিক্কা তোলে মা। খানিকটা হলুদ জল বেরোয় মুখ দিয়ে। তারপর মা হাঁফাতে থাকে। টুনু চিৎকার করে—'কিগো মা কি হইছে তোমার ?'

মা এবার তার কাঁধে ভর দেয়—'কিছু না, কিছু হয় নাই। সারাদিন খাই নাই তো কিছু। পিত্তি পড়ছে। গিয়া একটু শুইয়া থাকলেই সারবো।'

—'হ তোমারও মাথা খারাপ। এই শরীল লইয়া কেউ জলে ডুবায়?' টুনু বলে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় যেন।

—'কিন্তু দুলটা'—হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে—'আমার বিয়ার দুল। তর বাবায় দিছিল। বড় শখের দুলরে! সব তো গেছে। এই দুলজোড়া আছিল।' মা কাঁদতে থাকে, আর হাঁফাতে থাকে আর কাঁপতে থাকে।

টুনু ধমক দেয়—'কান্দনের কি হইছে! বাবায় ট্যার পাওনের আগেই দুল পাইয়া যাইবা। অখন গিয়া শুইয়া থাক। আমি পরাণ মাঝিরে একবার খবর দেই।'

মা'কে ধরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে থাকে টুনু। মা'র গা থেকে ভিজে জলের আর বমির কটু গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। একটু গা ঘিন্‌-ঘিন্‌ করে তার।

উঠোনের আগলটা হাত বাড়িয়ে ধরে মা বলে—তুই এইবার মাঝির কাছে যা। আমি একলাই ঘরে যাইতে পারুম।' তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে দুর্বল স্বরটায় যতদূর সম্ভব জোর দিয়ে মা ডাকে—'বুল্‌কিরে, পানুরে, এইদিকে আইয়া ধর দেখি আমারে একটু।'

টুনু বলে—'শয়তান দুইটা পাঁড়া বেড়াইতে বাইর হইছে বোধ হয়।'

মা'কে ধরে মাটি-লেপা দাওয়ায় বসিয়ে রেখে টুনু বলে—'ঘরে গিয়া শুইয়া থাক, আমি পরাণ মাঝিরে খবর দেই।'

পরাণ মাঝি পুকুর থেকে চোখ ঘুরিয়ে টুনুর দিকে তাকাল। একটু হেসে বলল—না কর্তা, আট আনায় হইবো না। পুরা একখান ট্যাহা দিলে নামতে পারি জলে।'

—'ক্যান মাঝি, জল দেইখ্যা ভয় পাইলা নাকি?' মনে মনে যেন একটু রাগ করেই বলে টুনু। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে লোকটা হাসছে।

—'ভয়? কত পদ্মা ম্যাঘনা পার হইলাম কর্তা, অখন হালার পুষ্কর্ণীরে ভয়! দিয়েন কর্তা, বার আনাই দিয়েন।'

পরাণ মাঝি মাথার গামছাটা খুলে কোমরে জড়াল। এবার খালি মাথাটা দেখতে পেলো টুনু। চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে এসেছে, গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলোও সাদায়-কালোয় মেশানো। শরীরটা মস্ত বড় পরাণ মাঝির, কিন্তু

চামড়াটা ঢিলে, কোঁচকানো। খাটো একটা কাপড় আঁট করে পরা। পায়ের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। কেঁচোর মতো শিরাবহুল মোটা গোঁড়ালি। পাগুলো সরু সরু।

খুব আস্তে আস্তে জলটাকে একটুও ঘোলা না ক'রে মাঝি জলে নামতে লাগল। গলা জলে দাঁড়াল মাঝি। এক আঁটি বিচালীর মতো সাদা মাথাটা জলে ভাসছে।

টুনু দেখে মাঝির কালো লম্বা শরীরটা প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের মতো নড়ছে জলের নীচে।

হুস্ করে ডুব দেয় মাঝি। অনেকক্ষণ পর ভেসে ওঠে। টুনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ পাওয়া যায়নি। মুখ থেকে খানিকটা জল 'পিড়িক' করে ছুড়ে দিয়ে আবার ডুব দেয় মাঝি। দুপুরের কড়া রোদে সবুজ, ঘন জলের নীচে অনেক নীচে একটা প্রকাণ্ড মাছের মতো পরাণ মাঝির শরীরটা নেমে যেতে থাকে। তারপর তাকে আর দেখতে পায় না টুনু।

পরাণ মাঝিকে কুশলী ডুবুরীর মতো লাগে টুনুর। যে সব ডুবুরী (সে বইতে পড়েছে) একটুও ভয় না করে সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে ঝিনুক তুলে আনে। সেই ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো। মুক্তো দেখেনি টুনু, ডুবুরীও না। পরাণ মাঝিকে দেখে শুধু ডুবুরীর কথা মনে হয়।

পরাণ মাঝির মাথাটা এবার প্রায় মাঝ-পুকুরে ভেসে ওঠে। হাতের মুঠো থেকে খানিকটা কাদা ছুঁড়ে ফেলে পরাণ মাঝি আবার ডুব দেয়। সেই ছুঁড়ে দেওয়া কাদার মধ্যে কয়েকটা শামুক।

এবার পারের কাছে মুখ তোলে মাঝি। ভীষণভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'না কর্তা, ঠিক কুনখানে পড়ছে হেইয়ে না জানলে হইবো না।'

টুনু মনে মনে ভয় পায়। ব্যস্ত হয়ে বলে—'এইখানেই পড়ছে। তুমি আর একটু খুইজ্যা দ্যাখো। ছানের সময় বেশী দূরে যায় নাই মা।'

পরাণ মাঝি হতাশভাবে জলের দিকে একবার তাকায়। ঘাটের সিঁড়িতে ভর দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলে—'দেখি আর অ্যাকবার। হালার দমে কুলায় না, না হইলে হালার পুষ্কর্ণীরে—' কথাটা শেষ না ক'রেই পিচ্ছিল গতিতে সাপের মতো জলে নামে মাঝি।

এবার পরাণ মাঝিকে স্পষ্ট দেখতে পায় টুনু। ঘাটের খাড়া পাড়ের কাছে জলটা গভীর। পরাণ মাঝি প্রকাণ্ড দুটো হাত মাছের পাখনার মতো নাড়তে

নাড়তে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু গতিটা এবার আর সহজ নয়। খুব আস্তে আস্তে নামছে মাঝি। সবুজ জলের ভিতরে তার পায়ের সাদা তলাটা নড়ছে। পা দুটো ওপর দিকে আর মাথাটা নীচের দিকে মাঝির।

অনেকটা নেমে প্রায় পুকুরের তলায় মাঝি থেমেছে। টুনু দেখতে পায়, মাঝি খুব সন্তর্পণে মাটিটা দেখছে। একটু পরেই জলটা আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে গেল। কাদা কাদা হয়ে গেল ওপরটা। মাঝিকে আর দেখতে পেল না টুনু।

অনেকখানি জল ছিটিয়ে মাঝি ভেসে উঠল আবার। এবার পাড়ের খুব কাছে। মুখ তুলে দম নেয় মাঝি। বলে—'আর একটু কর্তা, দেখি একবার। মনে লয় পাইয়া যামু।' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলতে পারল না মাঝি। হাঁফাতে হাঁফাতে কেটে কেটে বলল। বলেই আবার ডুবে গেল জলের মধ্যে। জলের ওপর সাদা কতগুলো বুদ্বুদ জমা হল। আরো বুদ্বুদ উঠে এলো জলের ভিতর থেকে। কাচের মার্বেলের মতো সেগুলো ভাসতে লাগল জলের ওপর।

টুনু তাকিয়ে দেখে মাঝি উঠে আসছে। টুনু চেয়ে দেখল মাঝির হাতে মুঠো করা কাদা-মাটি।

পরাণ মাঝি ভেসে উঠল জলের ওপর। ক্লান্ত হাতে জলে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল ওপরে।

'কর্তা'—দম নেবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে মাঝি বলে—'দ্যাখেন তো এইগুলির মধ্যে আছে নাকি!'

কাদার মুঠোটা খুলে মাঝি তাকে দেখায়। টুনু কাদার দলাটা হাত বাড়িয়ে নেয়। খানিকটা কাদা কয়েকটা পচা গাছের পাতা, একটু শ্যাওলা শামুক। আর কিছু নেই। টুনু নিঃশ্বাস ছাড়ল।

—'না মাঝি নাই তো এর মধ্যে।'

কোমরের গামছাটা খুলে মাটিতে বসে সেটা নিংড়োতে থাকে মাঝি। বলে—'দ্যাখলাম য্যান দুলের মতই। খাবলা দিয়া তুললামও। কপালে নাই কর্তা, কি করব্যান!'

পরাণ মাঝির গলার স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে আসছে ঠিক এমনি ক্ষীণ স্বরে সে বলে—'পারি না কর্তা আর। যখন মাঝি আছিলাম শরীরে জোর আছিল। একদমে নদীর তল থিক্যা মাটি উঠাইতাম গাঙ পার

হইতাম ভরা বর্ষায়। হেইদিন গেছে। অখন মাঝির নাম ঘুচাইয়া রিফিউজি হইছি।'

গা মুছতে মুছতে পরাণ মাঝি টুনুর দিকে তাকায়। টুনু মাঝিকে দেখে। প্রকাণ্ড শরীর কড়া পরা হাত। অথচ মাঝির হাত দুটো যেন কাঁপছে।

মাটিতে ফেলে রাখা ময়লা সাদা জামাটার পকেট থেকে বিড়ি বের করে পরাণ মাঝি। সেটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে বলে—'আছিলাম পরাণ মাঝি. একভাকে মাইনষে চিনতে পারত। কুয়ার মইধ্যে লাইম্যা ঘটি বাটি গলার হার তুলছি, অখনে অ্যাক বুক জলে ডুব দিতেই দম শ্যাষ। বয়স বাড়ছে অখন, শরীলে আর হেই তাকত নাই, প্যাটে ভাত নাই কর্তা।'

মাঝি ধোঁয়া ছাড়ে। আর পুকুরপাড়ে ভেজা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে টুনু বাবার কথা ভাবে। বাবা ফিরে এলে যদি জানতে পারে তবে মা আজ আর বেঁচে থাকবে না। গাটা সিরসির করে তার। বড় দুঃখী মা, টুনু ভাবে মা বড় দুঃখী। লোহার মতো শক্ত হাত বাবার, রোমশ বুক, পেট। খালি গায়ে যখন উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে তামাক খায় বাবা, তখন তারা কেউ কাছাকাছি যায় না। মাঝে মাঝে যখন মা'কে মারে বাবা, বিশ্রী গালাগাল দেয়, তখন মা কুঁই কুঁই ক'রে ইঁদুর ছানার মতো কাঁদতে থাকে। বাবার প্রকাণ্ড দেহের দুটো হাতের ভিতর মা'কে তখন ইঁদুরের মতোই ছোট্ট আর অসহায় মনে হয় তার।

পরাণ মাঝি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দেয়। বলে 'চলি কর্তা কাইল আইয়া আর একবার দেখুম অনে।'

টুনু চেয়ে থাকে। জামরুল গাছটার তলা দিয়ে বিন্দু-পিসির ঘরের বেড়ার কাছ ঘেঁষে আস্তে আস্তে মাথা নীচু ক'রে পরাণ মাঝি চলে গেল। টুনু ভাবে ঠিক তার রোগা, ছোট্ট মায়ের মতোই পরাণ মাঝিও যেন দুর্বল। খুব দুর্বল।

টুনু জলের দিকে তাকায় এবার। সবুজ জল, ঘন শ্যাওলা। দুপুরের সূর্য অনেকটা হেলেছে পশ্চিমের দিকে। কিন্তু এখনো দুপুর। গরম লাগছে টুনুর। সে আস্তে আস্তে জলের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

গায়ের শার্টটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে ঘাসের ওপর। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল জলে। কচু গাছ হাওয়ায় দুলছে। কেমন বিশ্রী একটা আঁষটে গন্ধ। পানা পুকুরের জলে তার ছায়া পড়ল।

টুনু তার ছায়ার দিকে তাকায়। রোগা লম্বাটে একটা ছেলের ছায়া। ছায়াটা জলের ভিতরে। একটা ডুবুরীর মতো জলের মধ্যে থেকে ছায়াটা তাকে দেখছে। মায়ের কথা ভাবল সে, পরাণ মাঝির কথাও। আজ সন্ধ্যাবেলা কিংবা অন্য কোনো দিন যখন বাবা টের পাবে তখন মা'কে বাবা মারবে। হয়ত এবার মেরেই ফেলবে। কেননা, দুলটা সোনার আর সোনা বলতে তাদের ঘরে ঐ দুলজোড়া-ই।

নীচু হয়ে জলটা দেখতে লাগল টুনু। ইচ্ছে হ'ল একবার পরাণ মাঝির মতো ডুবুরী হয়ে খুঁজে দেখে দুলটাকে। কিন্তু সে সাঁতার জানে না। সাঁতার জানলে পাথর নুড়ি, শ্যাওলা আর গাছের পচা পাতার মধ্যে গিয়ে সবুজ জলে ডুবুরীর মতো সে দুলটাকে একবার খুঁজে দেখত।

একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে সিঁড়িতে রাখে সে। ঠাণ্ডা জলটা সুড়সুড়ি দেয় পায়ে। টুনু আর এক ধাপ নামে। আর এক ধাপ। হাঁটুর ওপরে জল এবার। টুনু নীচু হয়।

ঘোলা জলটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন সেই ঘন সবুজ রঙ। জলের নীচে অনেকটা দেখা যাচ্ছে। টুনু চোখটা বড় বড় ক'রে তাকায়। চোখটা সরিয়ে আনে সিঁড়িগুলোর দিকে। একটা, দুটো, তিনটে সিঁড়ি স্পষ্ট এবং তারপর আরগুলো ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলো গুনতে শুরু করে টুনু—তারপর—

চিৎকার ক'রে উঠতে গিয়েও নিজের মুখে হাতচাপা দেয় টুনু। স্পষ্ট পরিষ্কার জলের নীচে চতুর্থ সিঁড়িটার ঠিক শেষে বাঁকা আর সুপুরি গাছের দড়ির বাঁধনটার কাছে সোনার দুলটার ছোট হুকটা চিকমিক্ করছে। কি আশ্চর্য! কেউ দেখতে পায়নি। টুনু মস্ত বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে। বুকটা ঢিপঢিপ্ করে তার।

টুনু ঝপ্ করে আর এক ধাপ নামল। কোমরের কাছে জল এবার। প্যান্টটা ভিজে গেল। ঠিক এই ধাপে দাঁড়িয়েই রোজ স্নান করে সে। এর বেশী নামতে সে ভয় পায়। সিঁড়িগুলো উঁচু উঁচু। আর এক ধাপ নামলেই গলা জল।

কিন্তু ফুলটা সে নিজেই তুলবে। চারদিকে তাকায় টুনু। কেউ নেই। আরো দু ধাপ নামলে ফুলটা।

টুনু পা বাড়ায়। গলা জল।

টুনু নিঃশ্বাস টানে। পচা শ্যাওলা আর পানাপুকুর আর মাটির গন্ধ। টুনু পা বাড়ায়।

ঝপ্ করে পরের সিঁড়িটায় পা রাখতে না রাখতেই টুনু ডুব দেয়।

ফুলটা! হাতের কাছেই।

কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে টুনুর।

সে মাথা তোলে।

পায়ের নীচেই সিঁড়িটা। ওপরের ধাপ। গলা জলে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টানে টুনু। বুক ভরে বাতাস নেয়। ফুলটা তাকেই তুলতে হবে। টুনু তাকায়। জলে ঢেউ। জল ছলছল করছে গলার কাছে। সেই ঢেউ আর সবুজ শ্যাওলার ভিতর দিয়ে ফুলটা চিক্ চিক্ করছে।

টুনু নীচু না হলে হাতে পাবে না।

ডুব দেয় সে। জলের ভিতরে অন্ধকার। জলের ভিতরে সবুজ রঙের অন্ধকার। পায়ের তলা দিয়ে একটা কি-যেন সরাৎ করে সরে গেল। বোধহয় মাছ! চমকে ওঠে সে।

হাত বাড়ায় সে। আরো এক ধাপ।

মুখ থেকে বুদ্বুদ বেরিয়ে গাল ঘেঁষে জলের ওপর উঠে যাচ্ছে।

পরের ধাপে পা দেয় টুনু। নীচু, আরো নীচু হয়।

আর মাত্র এক বিঘত দূরে ফুলটা! দম পায় না টুনু। বুকটা ফেটে যেতে চাইছে।

কোমরের নীচের দিকটা হাল্কা হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার মাথাটা নীচে। পরাণ মাঝির মতো হাত দুটো দুদিকে দোলায় টুনু। খুব তাড়াতাড়ি।

ফুলের কাছেই হাতটা এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। শেষবারের মতো দাঁতে দাঁত চাপে টুনু।

ফুলটা! কাছেই।

দু' আঙুলের মধ্যে হুক-টা!

একটা হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে সঙ্গে ফুলটা তার হাতের মুঠোয় এসে যায়।

যেন অনেক ভার বুকে। টুনু মুঠো-করা হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে। হাতের আঙুল আর চামড়া কেটে তুলটা যেন তার হাতের মধ্যেই বসে যাবে।

সিঁড়িটায় পায়ের চাপ দিয়ে টুনু সরে যায়। কোন্‌দিকে যে সরছে, তা বুঝবার আগেই চোখে সূর্যের আলো লাগে।

বাতাস! আঃ!

হাঁ করে বুক ভরে নিঃশ্বাস টানে সে। হাত-পায়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলো শিথিল।

কিন্তু তারপরেই আবার টুনু ডুবে যেতে থাকে। এক পলকের জন্য সে দেখতে পায় হাত দশেক দূরে ঘাট। ঘাটে কেউ নেই। সে অনেকখানি সরে এসেছে। হাতের মুঠোয় তুলটা।

প্রাণপণে হাত আর পা দিয়ে জলে আঘাত করে সে। তারপর ডুবে যেতে থাকে। হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে আসছে।

আবার মাথা তোলে। ঘাট এখন হাত-ছয়েকের মধ্যেই। কিন্তু টুনুর মনে হল, পুকুরটা যেন বহুবিস্তৃত সমুদ্রের মতো বড়ো হয়ে গেছে। যেন কূল-কিনারা কিচ্ছু নেই পুকুরটার। থই নেই পায়ের নীচে। হাতের মুঠোয় তুলটাকে প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করে।

গাঁটে গাঁটে অসংখ্য ফোঁড়ার যন্ত্রণা। সমস্ত শরীরটা শিথিল। হাত পা নাড়তে পারছে না সে। চোখের সামনে সূর্যের আলোটা নিভে গিয়েই জ্বলে উঠছে। কানে শুধু কলকল ছলছল জলের শব্দ।

না, আর জোর নেই শরীরে। আর কিছু নেই। হাতের পেশীগুলো সঙ্কুচিত হচ্ছে না। মুঠোটা আলগা হয়ে আসছে। প্রাণপণে আঙুলগুলোকে বাঁকিয়ে রাখতে চাইছে সে। পারছে না।

প্রাণপণে চিৎকার করতে গেল টুনু। মুখে জল ঢুকল। টুনু ঢোক গেলে।

জল তাকে ঘিরে যেন ঘুরছে। তাকে টেনে নিচ্ছে পাতালের দিকে। কত নীচে যে তলিয়ে যাচ্ছে সে! বেঁকানো আঙুলগুলো জট ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। বুক থেকে সমস্ত নিঃশ্বাস শুষে নিচ্ছে জল। দম নেবার জন্যে সে হাঁ করে। জল ঢোকে মুখে।

মাথাটা ডুবে যাওয়ার আগে হাতচারেক দূরে ঘাট দেখতে পায় সে। দেখতে পায় একপাঁজা বাসন হাতে বিন্দুপিসি আসছে ঘাটের কাছে।

তারপর জল আর পাতাল। ঝাঁকড়া মাথা বিরাট একটা দৈত্যের মতো কার মুখ যেন জলের ভিতরে।......ঝপ্ করে একটা শব্দ। একটা চিৎকার।

শেষবারের মতো ক্লান্তি, ঘুম আর অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে সে টের পায়, তার শরীরটা আছড়ে পড়লো মাটিতে। বুকটা হাল্কা। আর ডান হাতের তেলোয় তার মুঠোর মধ্যে শিথিল আঙুলের ফাঁক থেকে গড়িয়ে পড়বার আগ মুহূর্তে দুলটাকে সে অনুভব করে। দুলটা আছে! হাতেই!

তারপর একটা ছুঁড়ে-দেওয়া কালো চাদরের মতো অন্ধকারটা তাকে ঢেকে ফেলল।

টুনু চোখ মেলে চায়। অল্প অন্ধকার। ঘরে আলো জ্বলছে। অনেক লোক তাকে ঘিরে, তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। টুনু বুঝতে পারে না কিছু। মা'র মুখটা সবচেয়ে কাছে। মা কাঁদছে। আর অন্য সকলের ভিড়ের ভিতরে বাবা দাঁড়িয়ে। বাবার পাশেই বিন্দুপিসি। তাকে দেখছে সবাই। সবাইকে একসঙ্গে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে তার। তারপর আস্তে আস্তে মাথার ঝিমুনি ভাবটা কেটে যায়। মনে পড়ে আজ দুপুরবেলায়, ঠিক দুপুরবেলায় জলের অনেক নীচে সে আর সোনার দুলটা একই সঙ্গে ডুবে যাচ্ছিল।

টুনু চোখ বোজে। ক্লান্তি আর ঘুম।

অনেকক্ষণ পরে তাকায় সে। তার পাশে বাবা। আর কেউ নেই।

আবছাভাবে লণ্ঠনের অল্প আলোয় বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছে সে। মুখটা তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। অল্প দাড়ি বাবার মুখে। কোমল, শান্ত দুটো চোখ। বাবার রোমশ কঠিন একটা হাত আলতোভাবে তার কাঁধের ওপর, আর একটা হাত তার মাথার চুলের ভিতরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

খুব নম্র শান্ত গলায় বাবা বলে—'কেমন আছস্‌রে বাবা?'

—'ভাল'—ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় টুনু।

—'বাঘের বাচ্চা'—বাবা বলে—'বাঘের বাচ্চা তুই।'

সব কথা বুঝতে পারে না টুনু। তবু চুপ করে থাকে।

রান্নাঘর থেকে মা এ-ঘরে এল।

'টুনু, টুইন্তারে, তর দুধ আনছি'—এই বলে মা তার শিয়রের কাছে বসে। মা'র চুলগুলো ছাড়া। আবছা আলো-আঁধারেতে মা'র মুখটা দেখতে পায় সে। আর দেখতে পায় মা'র বাঁ কানের লতিটা আর শূন্য নেই। সেখানে ঝকঝক্ করে জ্বলছে দুলটা। মা'র মুখটা হাসছে। যেন ভাঙাচোরা হাড়-উঁচু মুখটা বদলে গেছে হঠাৎ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মা'কে। মা'র মুখটা অনেক উঁচুতে। দুল দুটো যেন মুক্তো—যে মুক্তো সমুদ্রের অনেক নীচে থেকে কুড়িয়ে আনে ডুবুরীরা।

টুনু নড়ে।

—'না, তুই উঠিছ না'—বাবা বলে।

মা তার কপালের ওপর ঈষৎ তপ্ত একটা হাত দিয়ে চাপ দিয়ে বলে—'উঠিছ না তুই, আমি তরে ঝিনুক দিয়া খাওয়াইয়া দিতাছি।'

টুনু তাকায়। ওপাশের মাচাইয়ে বুলকি আর পানু ঘুমোচ্ছে।

টুনু হাঁ করল। দুটো ঠোঁটের কোণে ঝিনুকটা আর মা'র কয়েকটা আঙুল। অল্প গরম দুধটা তার জিভ্ বেয়ে গলার কাছে নেমে এল। হাসি পেল টুনুর যেন সে অনেক অনেক ছোট হয়ে গেছে। যেন সে মা'র কোলে, আর মা তাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে।

শেষবার তার ঠোঁটের পাশ থেকে ঝিনুকটা সরিয়ে নিতে নিতে মা বলে—'এই ঝিনুকটা দিয়া ছোটবেলায় তরে দুধ খাওয়াইতাম। তর কি আর মনে আছে?' মা'র গলাটা কাঁপছে অল্প অল্প। মা'র চোখে বোধহয় জল।

—'হ অর কি মনে থাকনের কথা!' বাবা বলে।

বাবা যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে কথা বলছে। গলার স্বরটা ক্ষীণ। বাবা যেন দুর্বল, কথা বলতে পারছে না। বাবা কাঁদছে? না, বাবা কাঁদছে না। বাবা কোনোদিকে তাকিয়ে নেই। গায়ের চাদরটা দিয়ে দেহটা ঢাকা। চোখ দুটো বন্ধ। ভেজা-ভেজা। অল্প অল্প দুলছে বাবা। ছবিতে দেখা যীশুখৃষ্টের মতো মুখ বাবার।

হঠাৎ টুনুর মনে হল, খুব সুন্দর তার বাবা। খুব সুন্দর। বহু-পরিচিত পুরোনো বাবাকে যেন চিনতে পারছে না সে। এখন এই আধো-অন্ধকার ঘরে শিয়রের কাছে মা, আর পাশে খুব কাছেই বাবা। খুব কাছাকাছি দুজন; মা আর বাবা। দুজনেই তাকে ছুঁয়ে আছে।

খুব ক্ষীণ স্বরে, যেন একটা কাচের ওপাশ থেকে বাবা বলে—'মধ্যে মধ্যে মনে লই যে মরি। অখন মরণ হইলেই ভাল। কিন্তু মাইজ্যা বউ, এত সহজে আমরা মরুম না। আমরা—'

আর শুনতে পায় না টুনু। ঘুমে জুড়ে আসে চোখ। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, মা বাবা আর পরাণ মাঝি যেন একই রকমে দুঃখী, অসহায় দুর্বল। তারা কেউ নিষ্ঠুর নয়।

তারপর সুখী টুনু, তার দুঃখী মা বাবার মাঝখানে থেকে তাদের শরীরের ওম্-এর ভিতরে ডুবুরী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে, আর তার দুঃখী মা-বাবা তার ছোট্ট রোগা নরম শরীরে তাদের নিজেদের দেহের তাপ সঞ্চার করে দিতে দিতে একটা বৃহত্তর কূল-কিনারাহীন অথৈ অন্ধকারের সমুদ্রের ভিতরে পৃথিবীর আরো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে একই দুঃখ-বেদনায় জ্বলতে জ্বলতে খুব ছোট্ট সোনার টুকরোর মতো সুখস্বপ্নের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল।

নীলুর দুঃখ

সকালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনো পেমেণ্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর—মহা টিকৃরমবাজ লোক—সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলেই বুঝি ঐ প্রসন্নতা— ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা— বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রনোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিকৃরমবাজী। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদীর দোকান দিয়েছিল—অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে খেতো—ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষ দিকে টাকা ফুরোলেই টিকৃরমবাজী শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামী, ছেলে, ছেলে বৌ— চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন—নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুমসী বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা— বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি। ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে—কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুস্ হাস্ করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজোবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল—পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছন পিছন। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো উর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাকি ফাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভাল ছিল না। নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না-দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উল্টোবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু—শালা, বদের হাঁড়ি!

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনো দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল—খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান!

—ফের! কষাবো আর একটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকোনো হাত ছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গীতে রেখে বলে—একডিন কটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড় বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে—সেই

ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সারের জন্য বাড়িতে বড় শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারেরন। কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের্স্ক যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল—ভয় নেই, ভাল করে ধুয়ে দিয়েছি।

—কী ধুয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু—শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি—কী ধুয়েছিস আবে পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আরো অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল বৃটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যাণ্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বৌ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট, তখন বড় রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বৃটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছট্কু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল বৃটিশ—ঈ-ঈ-ঈ-দ্ কা চাঁ-আ-আ-দ! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট্-ফটাস্ করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরানী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠ-বেরালী, কাঠবেরালী, পেয়ারা তুমি খাও...' বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু বৃটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কত জিতেছিস? প্রথমে বৃটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল—আবে, পঞ্চা-আ-শ হা-জা-আ-র। জাপান আরো দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজারে। সেটাও

রবিবার। বাড়া পাড়ায় বুঝি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছে, ঈদ ধরেই পোগে ফেবারিট ছিল। আরো কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা ছুরি। বৃটিশ—তিনশো মাইরি বলছি—বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ' দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই বৃটিশকেই খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। বৃটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে বৃটিশের টেরিকটনের প্যাণ্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে নিতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে বৃটিশকে পাওয়া গেল না। ভি. আই. পি. রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশীক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা বৃটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কিনা! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। বৃটিশের বাড়িতে আজকাল আর যায় না নীলু। বৃটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে বৃটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত,—না, হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা—মাত্র দুশো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেণ্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে বৃটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাকি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বৌ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটে বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন—যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে

নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের ছুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্ত বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভাল করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি! উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনো। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ বারো জন ছেলে-ছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যাণ্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারির—খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডীজ সীটে দুতিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দুচারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উল্টোপাল্টা কথা, গানের কলি। কণ্ডাক্টর দুজন দু দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই!

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে —পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

—কত করে?

—আমাদের হাফ-টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

—এই যে কণ্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কণ্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না-কামানো কয়েক দিনের দাড়ি থুঁতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ণ দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কণ্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হেডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল—লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!

—ট্রাফিক সিগন্যাল বে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

—আর নিরোধ! নিরোধটা কী যেন!

—রাজার টুপি····রাজার টুপি···

—খ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা···

—খ্যা···

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল—বেঁধে···লেডীজ···

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই-শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা-চোখে যুবা কণ্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল—লাথি দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কণ্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশ্যে টিটকিরি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক অস্ত্র নিয়ে কয়েকটাকে খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই ইচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল—ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুণ্ডিগের রেডিওগ্রাম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যাণ্ট, দেয়ালে বিদেশী বারো-ছবিওলা ক্যালেণ্ডার, মেঝেয় কয়েরর কার্পেট। মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাশ-ট্রে-টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝেয় ইংরিজি ছড়ার বই খুলে বসে ছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরিজি কায়দায় থাকতেই ভালবাসে শোভন। মিলিকে কিণ্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে—তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দু কোলে তুলে নিয়ে ভারী একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলি জুলি তার চুল, জামার কলার লণ্ডভণ্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে—তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে!

—এইবার চড়বে। বাজার এলো এইমাত্র।

—হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর। সকলেই বিশ টাকি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেও আমার গাড্ডায়, ঘুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে—কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ঐ ভাষা।

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে—চলে যাস না নীলু, কথা আছে।

—যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে—নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—বাঃ, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলি জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাতো না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে—আমিও যাবো-যাবো করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে—বাঃ, মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারো তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে—বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছো।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—চলি রে। তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

—শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

—কী কথা ?

—বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা! তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমাদের বাড়ির দেয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায় ? তারা কারা ? আপনাদেরই তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা !

—কী লিখেছে ?

—সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেন নি ? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রঙ করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রঙ দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী ! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে—বারণ করে দিলেই পারো!

—কে বারণ করবে ? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল—ভ্যাগাবণ্ডস্, মিসফিট্‌স, প্যারাসাইট্‌স্…আরো কত কী ! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

—তা তুমি ধমকালে না কেন ? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল—ধমকাইনি নাকি ! শেষমেশ আমিই তো উঠলাম। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম– ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোবো না ? আপনার বন্ধু তো আমার কাণ্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিসফিস করে বলছে—চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যাম্ফ্‌লেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল—বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম—আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে !

একটা ছেলে বলল-- কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল— বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছজন আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে --খাওয়ালে না কি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল—খাওয়াবো না কেন?

—সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল---আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

—আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথাবার্তা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে— ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে—তার মানে তুমিও ওদের দলে।

—আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝবো!

—তুমি ঠিকই বুঝেছো। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে—না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে—কিন্তু চা তো খাইয়েছো!

—হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ' পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে! ওরা কী খুশী হল! বলল—বৌদি, দরকার পড়'ল আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল! ওরা ভাল না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে—কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ-তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

—না, নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা ছুই বড় বড় ছেলে এসে হাজির। বলল—আপনাদের দেয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থম্‌থমে মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছজনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন—ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাই। দু দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে—তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে—যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল—বুঝলেন তো! আমাদের কোনো দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছটা ছেলেকে চা খাইয়েছি—সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতার দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন—এইসব লেখা দেখেছো নীলু? কীরকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে—দেখেছো কীরকম উল্টো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

উনি বললেন—আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের

প্রতীক কামিনী, মার্ক্সের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন—তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এ সব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড় রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন—নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোলো। পথ-চলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়। নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র—কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে, হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যাণ্ট নিয়েছিস তুই? অনার্স ছাড়িস নি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। থেমে, ফিরে আসবে কিনা ভেবে ইতস্ততঃ করছিল। মুখ ফেরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতেচায়—দাদা, ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলী দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজী হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে—কিন্তু আমরা—ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি

যা। আমার জন্য ভাবিস না—আমি রাতচরা—কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দ কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামী কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোট বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরো বেশী। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল—ঘুমাতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্য ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুক্ আর গায়ের ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক্ পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামী, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ্য করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট্ পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল—তোমার মেয়ে দুটো বড কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

—আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় ঘরে পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামী টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ

ওঠে। মাঝে মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরী করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ঐ দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহীদ স্তম্ভ উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটোলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো বৃটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালবাসার বিয়ে। বড় সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথৈ জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভাল হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরেফিরে কুসুমের কথা বড় মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরো দুদিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসি-মুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে—কুসুমকে—এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে ?

একা থাকলে অনেক চিন্তায় টুকরো ঝড়ে-ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ীর ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে—পোগো, কী চাস ?

পোগো দূর থেকে বলে—ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে—আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে—মারবি না বল !

বড় কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মারবো না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশী হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ীর সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর—যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারে না—সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প—কুসুমের গল্প—অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

সাধুর ঘর

পাকুড় গাছের তলায় সাধুর ঘরে কে যেন আগুন দিয়েছে। উত্তুরে বাতাস বইছে হু-হু। দুপুরের রোদে আগুনের তেমন জলুস খোলে না। তবু সাধুর ঝোপড়াটা রোদ খেয়ে টনটনে হয়ে ছিল বলে আগুনটা ধরেছে ভাল। কয়েকটা হলকা পাকুড় গাছটার নিচু ডালপালা ধরে ফেলল, কয়েকটা লাফ দিয়ে গিয়ে ধরল হুলো সাতকড়ির চায়ের দোকানটা। দুপুরের খর রোদেও আগুনটার লাল হলুদ রঙটা ছড়িয়ে গিয়ে খোলতাই হল। হপ্তা বাজারের রাস্তায় লোক জমে গেল খুব। কর্ড লাইনের ধারের পসারীরা ছুটে এল।

কে আগুন দিল? কে?

সাধু লোক ভাল না। কর্ড লাইনের ধারের বেওয়ারিশ পাকুড়তলার জমি তার বাপের নয়। সরকারের। সরকারের বাঁধুনী আলগা, তাঁর কোঁচা দিতে কাছা খুলে যায়। তাই গভর্ণমেণ্টকে ছোলাগাছি দেখিয়ে বছর খানেক সাধু তার ঝোপড়ায় গেঁজেল তেড়েলদের আড্ডা খুলেছে। মুখোমুখি একঘর পাটকল মজুরের বাস। তাদের ছানাপোনা আঁতুড় থেকেই ধুলোয় গড়ায়, ধুলোমাটিতে হামা টানে। কয়েক গজ দূর দিয়ে বুক কাঁপানো মেল ট্রেন যায়, আর যায় বাহারী রাজধানী এক্সপ্রেস, নিঃশব্দে সাপের মতো চলে লোকাল। ছানা-পোনারা সেই সব ট্রেনের চাকা থেকে দু-তিন গজের মধ্যে খেলাধুলো করে, পাথর কুড়োয়। মায়েরা ভ্রূক্ষেপও করে না। বাপেরা ছেলেমেয়ের নামও ভুলে যায়। মানুষের এইসব উদাসীনতার ফাঁকে ফোকরে এক-আধজন লোক দুনিয়াতে বসে যায়। সাধুও বসে গিয়েছিল।

সাধুদের রাঙা পোশাক পরতে হয়, মুখ খারাপ করতে হয়, ত্রিশূল বইতে হয়— বোধহয় সেইজন্যই সাধু জটাজুট, রাঙা পোশাক, ত্রিশূল সবকিছুর যোগাড় রেখেছে। আর তার খারাপ মুখ। এমনই অনর্গল অবিরল সারাদিন সে মুখ ছোটায় যে, পাটকল মজুরদের ছানাপোনাদের মুখে প্রথম যে কথা ফোটে, তা হল সাধুর খারাপ কথা। কেউ রাগ করে না অবিশ্যি। শিখবেই তো বড় হয়ে, বাপ যখন মাকে বকবে, কি মাতাল হয়ে হল্লাচিল্লা করবে, কি

পাওনাদার যখন এসে বাপকে নেবে একহাত, তখন শেখা হবেই। সাধু শুধু কাজটা এগিয়ে রাখছে। রাখুকগে। সাধু যখন চিল্লায়, তখন সকালবেলায় ছানাপোনার মা দূরের দিকে চেয়ে বসে মাথায় উকুন চুলকোয় বাপ পাকুড়তলায় ছায়ায় খাটিয়ায় শুয়ে আগের রাতের খোঁয়ারি ভাঙে। কেউ সাধুর দিকে ফিরেও চায় না।

সবাই জানে—এ সাধুটো ঝুট্ আছে। সাট্টা সাধু মেকী। সেবার যখন শীতলাবাড়ির পাশে মজুমদারদের নতুন ভাড়াটের বৌটাকে রাত্ত বারোটায় তেঁতুলবিছে কামড়াল, তখন অত রাতে উপায় না দেখে তারা এসে সাধুকে ডেকেছিল, যদি সাধু এসে ঝেড়ে ফুঁকে দেয়। সাধু বিপদ বুঝে তেড়ে গাল দিতে লাগল—বিছেটাকে মেরে ফেলেছ তোমরা? অ্যাঁ? মেরে ফেলে আবার আমাকে ডাকতে এসেছো? বলি, ঝাড়বো যে, তা বিষটা টানবে কে? বিছেটা মেরে ফেললে—তা বিষটা কি আমি মুখ দিয়ে টানবো?

তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, সাধুটা সাট্টা। মজুমদারদের ভাড়াটেরা তখন জি টি রোড থেকে বিখ্যাত ঝাড়ুনী বুড়িকে নিয়ে এসেছিল। বুড়ি এসে প্রথমটায় দুধ আর জল দিয়ে ঝাড়ল, তারপর ঝাঁটার কাঠি দিয়ে। ব্যাপারটা দেখতে চমকালো, কিন্তু কাজ হল না। কিন্তু সাধু পদ্ধতিটা দেখে রাখল মন দিয়ে। অন্য যায়গায় চালাবে। তাকেও করে খেতে হবে তো?

গোলবাজারে বুড়ো শেখ সাহেব বসতেন এক সময়ে। দারুণ গেঁজেল। তাঁকে ঘিরে ছিল সারা হপ্তা রেসুড়েদের ভিড়। শুক্রবারে ভিড় হত সবচেয়ে বেশি। শেখ সাহেব ভ্রূক্ষেপ করতেন না। গাঁজা টানতেন, আর টানতেন। তারপর নিমীলিত চোখে কখনো হুঙ্কার দিয়ে বলতেন—এক লাঠি। তার মানে হচ্ছে এক। এক নম্বর ঘোড়া ধরো তো তোমরা। কখনো বলতেন—দো রোটি। তার মনে হচ্ছে—আট। কখনো বা—তিন কাঠি। তার মনে হচ্ছে—চার। এই রকম ঠারে ঠোরে টিপ্‌স দিতেন শেখ সাহেব। ঘোড়া রেসের ময়দানে শেখ সাহেবের কথা মতো চলত।

সাট্টা সাধু কায়দাটা শিখে রেখেছিল। পাকুড়তলায় গাঁজা টানতে টানতে সে-ও মাঝে মাঝে চিৎকার দেয়—এক লাঠি! কিংবা—তিন কাঠি। কিংবা দো রোটি।

লোকে প্রথমটায় খেয়াল করেনি। রেলের গ্যাংম্যান চানুর বাহারী দাড়ি আছে বলে তার নামডাক দেড়েল চানু বলে।' দেড়েল চানু সাধুর টিপ্‌স ধরে

পয়লা বারে একশ' আঠোরো টাকা, দ্বিতীয় দফার শ' দেড়েক টেনে আনল তারপর দিশী মদ গিলে এসে সাধুর পায়ের ওপর বডি ফেলে কাঁদতে কাঁদতে বলল—মন্তর দাও। আজ থেকে আমি তোমার চেলা।

তা দেড়েল চানুই সাধুর প্রথম শিষ্য। মন্তর বলে যে একটা ব্যাপার আছে, তা সাধু খেয়ালই করেনি। স্বপ্নেও তার ভাবা ছিল না যে, তারও একদিন শিষ্য জুটবে। ছেলেবেলায় সে তার বাপকে দেখত, ঘুম থেকে উঠেই হাই তুলতে তুলতে চেঁচাত— ওঁ তৎসৎ। সেই মন্তরটা জানা ছিল। দেড়েল চানুর কানে কানে সেই মন্তরটা দিয়েছিল সে। আর ধরিয়ে দিল গাঁজার কলকে। বর্ষার পর দেড়েল চানু তার ঝোপড়াটা নতুন খড় দিয়ে ছেয়ে দিল, ভিতরে তৈরি করে দিল একটা বাঁশের মাচান, নতুন একটা লোমের কম্বল কিনে দিল। আরো গোটাকয় শিষ্যও দিল জুটিয়ে। কিন্তু চানু ছাড়া আর সব কটা শিষ্যই হাড়হাভাতে। গুরুর পয়সায় গাঁজা টানে, তারই সঙ্গে সমানে বসে খিস্তি-খাস্তা করে, ঝোপড়ায় বসে থুথু ছিটিয়ে ঘর নোংরা করে যায়। সাধু রাগ করে চেঁচায়, অশ্লীলতম কথা বলে গাল পাড়ে। কিন্তু চেলাগুলো তখন তার সঙ্গে ডাকটিকিটের মতো সেঁটে গেছে, মা-বাপ তোলা গালাগাল শুনে গোলাপী রঙের হাসি হাসে।

দেড়েল চানু সাট্টা সাধুটার পিছনে হকের পয়সা ঢালছে—এটা লোকের সহ্য হয় না। চানুকে এখানে সেখানে পাড়ার লোকে পাকড়াও করে—তোমার সংসার ভেসে যাচ্ছে চানু হে। ফুটো নৌকোর সওয়ারী তুমি—ঐ শালা জোচ্চোরটার পিছনে—ইত্যাদি। তখনই লোকের চোখ টাটায়—সরকারী বেওয়ারিশ জমি, বেদখল করে শালা বসে গেছে পাকুড়তলায়, এত লোকের যাতায়াতের রাস্তার ধারে, কারো নজরেও পড়ে না নাকি! সরকারী জমি, সরকার বুঝবে, কার বাবার কী? কিন্তু তবু লোকের চোখ টাটায়। চানুটা চেলা হয়েই সাধুকে ঝোলালে।

পাটকল মজুরদের কুঠরীগুলোয় প্রায় দিনই হাঁড়ি ফাটে। রাত-বিরেতে দিশী মদের ঝোঁকে মরদরা এসে বৌয়ের উপর খামোখা টঙ হয়, অন্ধকারে এধার ওধার লাথি চালায়। দু-চারটে বাচ্চা লাথি খেয়ে কোঁৎ কোঁৎ করে উঠে চেঁচায়, বৌগুলো উড়োখুড়ো চুলে দৌড়ে বেরোয়, ছুটাছুটি করে। সেই হুড়-দৌড়ের মধ্যে পুরুষেরা ভাতের মেটে হাঁড়ি ভাঙে, উনুন ভাঙে, আরো কত কাণ্ড করে। সাধু দেখেশুনে তার ঝোপড়ায় একটা দোকান দিয়েছিলো।

মেটে হাঁড়ি কলসী মালসার দোকান। মাকালতলায় কুমোরদের ঘর থেকে বয়ে এনে। পাটকলের মজুরদের ঘরে প্রায় দিনই হাঁড়ি কলসী বিকোয়।

শীতলাবাড়িতে রোজকার সকালের প্রণাম সেরে নিরাপদর দাদা ফেরার পথে পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে চারধারটা চোখে চোখে জরীপ
কতটা জমি নিয়েছিস রে, অ্যাঁ ?

সাধু তার হাঁড়ি কলসীর মাঝখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে
তা কাঠা দুয়েক হবে।

হারু ঘোষ হাসে—দূর ব্যাটা, দু কাঠায় তিনতলা উ
বড় জোর, তা জায়গাটা ভালই। গেড়ে বসেছিস একেবারে
গাছ-টাছ রুয়েছিস নাকি ?

সাধু তেমনি উদাস জবাব দেয়—আমি রুইব কেন ? জমি আমার বা...
নয়, যখন তুলে দেবে উঠে যাবো। গাছ-গাছালি যার যার মন-মতো উঠছে।

—দেখিস বাপু।

কী দেখবে, তা সাধু ভেবে পায় না। থুথু ফেলে সে খুব ভাবে। রাতারাতি একটা মন্দির তুলে ফেলতে পারলে পাকাপাকিভাবে বেওয়ারিশ জমিটাতে শেকড় চালানো যেত। সিমেণ্ট না জোটে চুনসুরকি দিয়ে হাত দশেক উঁচু একটা মন্দির, ওপরে লাল নিশেন উড়ছে—এরকম একটা স্বপ্নের ছবি সে দিন-দুপুরেই দেখে। কিন্তু সকলেই চোখ পেতে আছে—মন্দির ওঠাতে গেলেই খিচাং বেঁধে যাবে। শিষ্য-সাবুদরাও কেউ মানুষ না। দিনদুপুরেই হল্লা-চিল্লা করে গাঁজা খায় ঝোপড়ায় বসে। সাধু লাথি মেরে বের করার চেষ্টা করে দেখেছে। নড়ে না। শালখুঁটির মতো শক্ত হয়ে গেড়ে গেছে শালারা। এদের দিয়ে মন্দির ? সাধু আবার থুথু ফেলে।

যেমন করেই হোক, মানুষকে দাঁড়াতে হয়। ঐ যে নিরাপদ—ছ মাস আগেও জ্ঞাতিদাদা হারু ঘোষের আটাকলের পার্টনার ছিল। চালের আড়ৎ, আটাকল একা সামলাত। সারা শরীরে, চুলে, লোমে, ভ্রুতে আটা মেখে দাদা হারু ঘোষ তাকে একদিন ডেকে বলল—এবার থেকে মাইনে নিয়ে থাক, পার্টনারশিপ আর নয়। নিরাপদর বড় লেগে গেল কথাটা। দাদার কারবার থেকে তার সামান্য পুঁজি তুলে দেড়শ গজের মধ্যে আবার দোকানঘর ভাড়া নিল, কিনল আটাকল, খুলল চালের কারবার। পাকুড়তলায় বসে ঐ দেখা যায় নিরাপদকে—পিছনে গোঙাচ্ছে চাকি, ফিতে ঘুরছে, ধুলোর মতো উড়ছে আটা

ময়দা, কালো নিরাপদ সাদা হয়ে খাটছে, মাপছে, দিচ্ছে, নিচ্ছে, এক মুহূর্তের
অবসর নেই। দাঁড়িয়ে গেল মানুষটা। বসে না থাকলে মানুষ দাঁড়ায় ঠিক।
পাকুড়তলায় বসে সাধু এইরকম তার ভবিষ্যৎ ভাবত। নুলো সাতকড়ির
...ড নেই। হাতটা শরীরের সঙ্গে লেগে থেকে লাঠির মতো ঝোলে।
...ল দিলেই হয়, তবু সাতকড়ি রেখেছে। হাঁটতে চলতে হাতটা
...জারে হাটে লোকের সঙ্গে ধাক্কা খায় হাতটা। আর একটা
...ঞ্জিনের মতো গেলাসে চামচ নেড়ে চা বানায়। তার
দোকান। পাটকল মজুর, স্টার সেলুনের আড্ডাবাজ
যোগানীরা দশ পয়সায় চা মারে। একটুখানি ছাপড়ার
... দুই বেঞ্চ, একটা চায়ের টেবিল, দুচারটে কৌটোবাউটো—ব্যস।
...ড় মেড়ে রস করে রাখে সাতকড়ি—গুড়ের চা সাত পয়সা। সাধুর
ঝোপড়ায় চার হাতের মধ্যে একহেতে সাতকড়িও দাঁড়িয়ে গেল বুঝি! মানুষ
দাঁড়ায় বসে না থাকলে।

কথাটা সে তার চেলাদেরও বলে। কিন্তু চেলারা ভঙ্গী বদলায় না।
দিনকাল ভাল যায় না সাধুর। দেড়েল চাদু ছাড়া তার আর কোনো চেলা
হাত উপুর করে না। মেটে হাঁড়ি কলসী বেচে দিন যায়।

নেশাখোর নানকুর দোকানটা বিলেৎ বাকী পড়ে উঠে গেল গত বছর।
সাহেব বাগানের জমিটা দর পেয়ে বেচে দিল। উঠে গেল ইঁটখোলার দিকে।
ওয়াগন ভাঙিয়েদের দলে ভিড়ল কিছুদিন। তারপর পোষাল না বলে সব
ছেড়ে ছুড়ে এখন মাল টেনে পড়ে থাকে। জ্ঞান ফিরলে নিখরচায় হাট করতে
বেরোয় থলি হাতে। একটা বৌ দুটো বাচ্চা তার। হাটবাজার না করলে
চলে কী করে? তাই আর পাঁচজন লোকের মতোই সে যায় হপ্তাবাজারে।
দোকান থেকে আনাজপত্র তুলে নেয় খুশি মতো, পয়সা দেয় না। দোকানীরা
ব্যাজার মুখে চুপ করে থাকে। ফেরার পথে ঝণ্টুর দোকান থেকে চা খায়,
স্টার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়ে নেয়, শুটকের দোকান থেকে ভাল
জর্দা দেওয়া পান খায়, এক প্যাকেট পছন্দসই সিগারেট পকেটে পোরে, হারু
ঘোষের দোকান থেকে চাল তোলে, মুদীর দোকান থেকে সওদা নেয়—এমন
অনায়াসে সব তুলে নেয় যেন অদৃশ্য পয়সা গুনে দিচ্ছে। নিখরচায় সব সেরে
ফেরার পথে পাকুড়তলায় সাধুর ঝোপড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে—সাধো,
এই শালা সাধো—

পুরো একটা ছিলিম টেনে নেয় শালা। তারপর অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থাকে। উঠবার সময় হলে আবার সাধুকে ডেকে সামনে দাঁড় করায়। পাছায় একটা লাথি কষিয়ে বলে—পাকুড়তলাটা কি বাপের জমিদারী? সরকারী খাজনা লাগে না?

খাজনাটা নানকুই নেয়। তারপর পথে নামে। গান গায়। সাধু বিড় বিড় করে বকে—ইঁটখোলার দিকে অন্ধকারে মা গোখরো যেন দেয় ঠুকে, হেই ভগবান, ভগবান হে!

এই হচ্ছে সাধু। এইমতো তার দিন যায়।

এখন উত্তুরে বাতাসে সাধুর ঝোপড়াটা ঐ জ্বলছে। আগুনটা ধরেছে ভাল। পাকুড়তলা থেকে হাত বাড়িয়ে হুলো সাতকড়ির দোকানটা নিয়ে বাহার খুলেছে আগুনটার। পাটকল মজুরদের ছানাপোনারা নাকে আঙুল পুরে দাঁড়িয়ে গেছে, কাজের লোক নিরাপদ চাক্কি বন্ধ করে চলে এসেছে, স্টার সেলুনের আড্ডাবাজরা লাফিয়ে পথে নামল, কর্ড লাইনের ধারের ছোট্ট বে-আইনী বাজারের ক্ষুদে পসারীরা দু-চারজন দৌড়ে আসছে। সাধুর দুই চেলা দুটো শুখো হাঁড়ি জল ছিটিয়ে দেবার ভঙ্গীতে দোলাচ্ছে, তাদের চোখেমুখে এখনো ভ্যাবলা ভাব। গাঁজার নেশা এখনো কাটেনি। একটু দূরেই ধুলোয় বসে সাধু বিড়ি ধরিয়েছে, তার মুখচোখ জ্বলজ্বল করছে।

কে আগুন দিল? কে?

সাধু দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে বলে আমি।

সবাই বোকা। বলে—কেন?

—আমার ইচ্ছে। সব জ্বলে যাক শালা।

একটু ব্যোমকে থাকে ভিড়টা। তারপরই হঠাৎ সাধুর যে দুই চেলা শুকনো হাঁড়ি থেকে অদৃশ্য জল আগুনে ঢালছিল তাদের একজন এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাঁউরে মাউরে করে চেঁচিয়ে বলল—যখন আগুন দেয় তখন আমরা মাইরি ঘরে ছিলাম।

পোড়েল বাড়ির বেঁটে ছেলেটা এগিয়ে সামনে এসে জিজ্ঞেস করে—নিজের ঘরে আগুন দিয়েছো। বেশ। কিন্তু হুলো সাতকড়ির দোকানটা যে গেল—গরীব মানুষ—তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

সাধু ঝেঁঝে উঠে বলে—তা আমি কী করব? আগুন কি আমার বাপের? নিজের ঘরে আগুন দিয়েছি আমি, সে আগুন যদি বাতাস বেয়ে

বালির বাজারে মাল তুলতে গিয়েছিল সাতকড়ি। চটের থলিতে গুঁড়ো চা, আক্রার চিনি, গুড়। ফেরার পথে দূর থেকে আগুন দেখে দৌড়াচ্ছে। এক হাতে ব্যাগ, নুলো হাতটা লটপট করে এধার ওধার বেমক্কা দোল খাচ্ছে। পরনে খাকী হাফ প্যান্ট, গায়ে ময়লা তেলচিটে গেঞ্জী, গেঞ্জী ফুঁড়ে বুকের হাড়-গোড় কাঠকুটোর মত ফুটে উঠেছে। সে চেঁচিয়ে বলছে—আমার একশ টাকার মাল—একশ টাকার—

—ঐ তো সাতকড়ি।

সাতকড়ির দৌড়োনোর দৃশ্যটা খুবই করুণ। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। ঘামে তেলতেলে মুখ, গালে বিজবিজে দাড়ি ভ্রূতে পাকা চুল, লটপটে নুলো হাতটা, ছেঁড়া গেঞ্জী, বুকের হাড়গোড়—সব মিলিয়ে ক্ষয়াভাব চেহারাতে। ভিড়টা সেই দৃশ্য দেখে ক্ষেপে গেল।

—নুলো সাতকড়ির ঘর কে বানিয়ে দেবে?

—দুটো লোক ঘরে ছিল, তুমি তাদের সুদ্ধু আগুন দিয়েছিলে। শালা খুনে।

—গভর্নমেন্টের জমি, বেদখল করে—মাম্‌দোবাজী—

সাধু বিড়িটা ফেলে উঠে দাঁড়ায়। বিপদ। উত্তুরে হাওয়া টেনে দিয়েছে আগুনটাকে, কিন্তু হক্‌ কথা, সে সাতকড়ির দোকানে আগুনটা যাক—তা চায়নি, সে কথাটা ভালভাবে বলবার আগেই পোড়েলদের বেঁটে ছেলেটা চড় কষাল।

পেটে ভাল খাবার পড়ে না বহুকাল, তার ওপর নেশাভাঙ। সাধু ঝিম্‌ হয়ে আবার বসে পড়ে। তারপর বেজায়গায় একটা লাথি খেয়ে জমি নিল কোল-বালিশের মতো। ধুলোয় গড়িয়ে চীৎকার করে বলল—মেরে ফেল, কেটে ফেলে দাও আগুন—

—তাই দিচ্ছি। তার আগে বল, কেন আগুন দিয়েছিস—

সাধু ধুলোয় গড়ায়, আর লাথি খায়, আর বলে—নিজের ঘরে দিয়েছি, তাতে কার কী? আমার আগুন—

—তোর আগুন অন্যের ঘরে যায় কেন?

জটিল প্রশ্ন। যন্ত্রণার মধ্যে প্রশ্নটার জুৎসই জবাব ভেবে পায় না সে। তবু মুখে রক্ত তুলে বলে—ঐ শালারা কেন চামুকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে

নিচ্ছে? কেন দুখন, মোধে, নিধে আমার ঘরে গেড়ে বসে গাঁজা খায়, কেন নানকু আমাকে রোজ সাঁঝের বেলায় লাথি মারবে, কেন হারু ঘোষ—

সবটা বলা হয় না। দাড়ি মুঠো করে ধরে কে যেন তাকে তোলে। সে বুঝতে পারে, তার সঙ্গে পাবলিকের কোনো খানাপিনা নেই। তার কথার উত্তরে তখন পাবলিক বলতে থাকে—

—তুমি যে দেড়েল চাষুকে শুষে নিচ্ছ হারামজাদা—

—ভদ্রলোকের যাতায়াতের পথে ভেড়েল গেঁজেলদের আড্ডা বসিয়েছো—

—গভর্নমেণ্টের জমি মেরেছো শালা।

—ঝাড়ফুঁক মন্তর জানো না, গুল-চাল মেরে মানুষের মাথা খাচ্ছে—

—সাতকড়ির দোকানে যে তোমার আগুন গিয়ে লাগল—

সাধুর ঝোপড়া আর সাতকড়ির দোকানে জুড়ে দপ্ করে যেমন আগুনটা ধরেছিল তেমনি কয়েক মিনিটেই নেতিয়ে গেল আবার। দুচারটে ছাঁচ বেড়া, মাচান, দুটো টুলবেঞ্চি তো আর আগুনের বেশীক্ষণের খোরাক নয়। কিন্তু আগুনটা নিভতে নিভতেই সাধুর মুখ ফুলে ঢোল, টস্ টস্ করে রক্ত ঝরছে নাকে, কপাল বেয়ে। দাড়ি ছিঁড়ে হাওয়ায় ওড়ে, ছেঁড়া জটার চুল মুঠো থেকে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে মারকুটেরা। কে যে মারছে শালা কে জানে। সবাই এখন পাবলিক। সে একা। সাধু। বিড় বিড় করে কেবল বলে—মার শালা, মেরে ফেল্। কেটে ফেলে দে আগুনে, দুনিয়া থেকে পাতলা হয়ে যাই।

মারধোরে আর হিসেব রাখে না সাধু। অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা চলে। অনেক হাত, অনেক পা। শেষটায় আর ব্যথা লগে না তেমন। কেমন যেন নেশাড়ু ঘুম-ঘুম ভাব পেয়ে বসে। টের পায় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে কারা যেন বাঁধছে তাকে।

—এইখানে থাক্ শালা, যে যাবে একটা করে লাথি মেরে যাবে।

—মার না শালা। তোরা পারবি নিজের ঘরে আগুন দিতে? বুকের পাটা আছে? সাধু বিড় বিড় করে বলে।

সেই বিড় বিড় কারো কানে পৌঁছায় না। পৌঁছোলে বিপদ ছিল।

ঝিমুনির নেশাটা যখন জমে এসেছে, তখন আস্তে আস্তে পাবলিক ফোটে। চারদিকে কালো ছাই ওড়ে। শ্মশানের কলসীর মতো ছাইয়ের মাঝখানে সাধুর কলসী হাঁড়ির স্তূপ পড়ে থাকে। উত্তর দিক থেকে টেনে হাওয়া দেয়। সাধুর ঝোপড়াঁর ছাই চারদিকে ছড়ায়। ল্যাম্পপোস্টে হাতবাঁধা সাধু ত্রিভঙ্গ

হয়ে মাথা রেখেছিল ধুলোর ওপর, সেখান থেকেই পিটির পিটির চেয়ে দেখে হুলো সাতকড়ি একা পাকুড়তলায় বসে কাঁদছে, পাশে তার পাঁচ বছর বয়সের ছেলেটা পিলে বের করে দাঁড়িয়ে।

কারো জন্য এই প্রথম সাধুর মায়া হয়। মায়া মানেই বন্ধন। সাধুদের মায়া থাকতে নেই, তবু মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসে সাধু। মাথাটা হালকা লাগছে, মাথার জটটা পরচুলার মতো পড়ে আছে ধুলোয়। সাধু ভ্রূক্ষেপ করে না। হুলো হাত বলেই কিনা কে জানে, সাতকড়ি তাকে মারেনি। দূরে বসে কাঁদছে। সে উঠে বসতেই সাতকড়ি মুখ তোলে। আবার নববধূর মতো মুখ নামিয়ে কাঁদে।

সাধু বলে—কাঁদছ কেন মেয়ে মানুষের মতো? বিড়ি থাকে তো দাও।

সাতকড়ি উঠে আসে। মুখে বিড়ি গুঁজে ধরিয়ে দেয়। তারপর বলে—কিন্তু আমার দোষটা কী বলো তো? আমার ঘরটো কেন লিলে আগুনে?

সাধু দাঁতে দাঁত চেপে বলে—আগুনটো আমার বাবার কিনা, তাই—

—তা আমার কী হবে এবারে?

—কী আর হবে? আমার তো মালকড়ি নেই, গতরে খেটে ঘর তুলে দিব। চান্নুকে বলি, যদি দু দশ টাকা দেয় তো সে তোমার—

ঘর বাঁধতে বাঁধতে শীত গিয়ে গরম চলে আসে। রোদের হালকা দুপুরের চরাচর চেটে যায়। রাস্তার কুকুরটাও ছায়া ঘেঁষে বসে। সাধু আর হুলো সাতকড়ি মিলে সাতকড়ির দোকানঘর বাঁধে। জটা-দাড়ি-ছেঁড়া সাধুর দুই হাত, হুলো সাতকড়ির এক। বাঁশ-বাঁখারি-খুঁটি যত্নে বাঁধে সাধু, সাতকড়ি তার এগিয়ে দেয়, দড়ি ফেরায়। দুজনে কত কথা হয় ভরদুপুর, সারা দিনমান।

সাতকড়ি বলে—তুমি লোকটা সাধুই বটে হে।

সাধু অনাবিল একটু হাসে, বলে—বুঝলে সাতকড়ি, পাকুড়তলায় ঘরটোয় যখন তেড়েল গেঁজেদের আড্ডা বসল, লোকের চোখ টাটাল, আমার সুখ ছিল না; নানকু শালা এসে রোজ লাথি মেরে যায়; তখন মাঝে মাঝে ভাবতাম, মরি যদি তো আরবার গুণ্ডো হবে। ভাবতে ভাবতে মনে হল, কিন্তু এ জন্মটায় শালা কেন আমি সাট্টা সাধু? একবার ঝাঁকি মেরে উঠে দেখি না কী হয়! তখন ঠিক করলাম, মরদের মতো কিছু একটা করি।

সাতকড়ি চুপ করে থাকে।

সাধুর চোখ জ্বল জ্বল করে—মাইরি, নিজের ঘরে আগুন দিলাম তবু কেউ বললে না, কাজটা মরদের মতো করেছে সাধু। একজনও তো বলবে!

—তুমি পাগলা আছ। নিজের ঘরে আগুন দিলে কী আর হাতীঘোড়া হয়!

—হয় সাতকড়ি হে, হায়। এই যে আমি নিজের ঘরে আগুন দিলাম, তার জন্যই এখন তোমার ঘর আমাকে বেঁধে দিতে হচ্ছে। আর তুমি বলছ, আমি সাধু বটে।

—বলছি। তোমার মনটা ভাল।

—এইরকম কত লোকের ঘর আমি এবার থেকে বেঁধে দিব। আর লোকে বলবে, লোকটা সাধু বটে। বুঝলে সাতকড়ি হে, যে লোকটা বসে থাকে না, সে দাঁড়ায়। দেখো, পরের ঘর বাঁধতে বাঁধতে আমি একদিন ঠিক সাচ্চা সাধু হয়ে যাবো।

সুখ দুঃখ

লোকটা সারা দিন তার ক্ষেতে কাজ করে। একা একা সে মাটির সঙ্গে কত ভালবাসার কথা বলে! আল তুলে জল বেঁধে রাখার সময়ে সে ঠিক যেন এক পিপাসার্তকে জলদানের তৃপ্তি পায়। সে ভালবাসে গাছগুলিকেও। যারা ফল দেয়, ছায়া দেয়, দূরের মেঘকে টেনে আনে। সে প্রতিটি গাছের সুখ-দুঃখকে বোধ করার চেষ্টা করে। সে ভালবাসে তার গৃহপালিতগুলিকেও। সে বোঝে, প্রতি-প্রত্যেকের টান ভালাসার ওপর সংসার বেঁচে আছে।

পাপপুণ্যময় দিনশেষে সে তার নির্জন নিকোনো দাওয়াটিতে বসে। গুড় গুড় করে তামাক খায়। অন্ধকারে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশে দেবতার চোখের মতো উজ্জ্বল তারা ফুটে ওঠে। সে সেই হিম, নিথর ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে বিশাল ছায়াপথ, ঐ পথ গেছে তার পূর্বপুরুষদের কাছে। কখনো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় উঠোনে খেলা করে তার তিনটি শিশু ছেলে মেয়ে। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। সে কখনো সেই নিথর আকাশকে, কখনো বা সেই নিষ্পাপ তিন শিশুকে উদ্দেশ্য করে বিড় বিড় করে বলে—আমি তোমাদের কাছে কোনো লাভ লোকসান চাই না। তোমরা আমাকে অনাবিল আনন্দ দিও।

সারা রাতই প্রায় সে জেগে থাকে। গোয়ালঘর থেকে গরুর দাপানোর শব্দ পেলে উঠে গিয়ে মশা কিংবা ডাঁশ তাড়ায়। টেমি হাতে চলে আসে হাঁসের ঘরে। দেখে, তাদের ডিম স্বচ্ছন্দে প্রসব হয়েছে কিনা। ঝড়ের রাতে সে উঠে চলে যায় বাগানের গাছগুলির কাছে। বাঁশ-কাঠের ঠেকনো দিয়ে রাখে বড় গাছগুলিতে।

মাঝে মাঝে অন্ধকার নিশুত রাতে বারান্দায় বসে সে যখন তামাক খায়, তখন তার বউ আর ছেলেমেয়েরা ঘরে ঘুমোয়, ঘুমোয় তার গাছপালা, তার গৃহপালিতরা, লোকটা তখন একা জেগে দেখে, দূরের মাঠ ভেঙে ধোঁয়াটে

লণ্ঠন হাতে অস্পষ্ট কারা যেন চলে যাচ্ছে, কানে আসে ক্ষীণ হরিধ্বনি। কখনো বা দেখে ভিন গাঁয়ের দিকে মশাল হাতে চলেছে একদল লোক, তাদের হাতে বন্দুক, সড়কি, খাঁড়া, মুখে ভুষোকালি মাখা। লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকে তার আর ঘুম আসে না।

গ্রামের ধারে রুপোলী নদীটির পাশে শিবরাত্রি কি রথযাত্রার মেলা বসে। কত দূর থেকে রঙে ছোপানো জামাকাপড় পরে আসে অচেনা মানুষেরা। রঙীন ছেলেমেয়েরা মুখোশ পরে ঘোরে, বাজীকর খেলা দেখায়। পায়ে পায়ে রাঙা ধুলার মেঘ ওড়ে। ছেলের হাত ধরে লোকটি মেলায় আসে। ছেলেকে ডেকে বলে মানুষের মুখ দেখ বাবা, মানুষের মুখ দেখ। এর বড় নেশা। হাটুরে ঘোরে ফেরে, দরদাম করে। লোকটা কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে অচেনা হাটুরেদের দেখে আর দেখে। কখনো বা ছেলেকে বলে—অচেনা মানুষ একটু পর-পর লাগে বটে, কিন্তু আপন করে নেওয়া যায়। কাজটা শক্ত না।

সে গানে দেশের আইন, জমি এবং ফসলের মাপ, অঙ্কের হিসেব, লোকটা জানে। কবিরাজী বিদ্যা। সে জানে, কোন উদ্ভিদের কী গুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল, কোন বীজ থেকে কী গাছ। তাই এ গাঁ সে গাঁ থেকে নানা জন আসে তার কাছে। আইন জেনে যায়। জমির মাপ জেনে যায়, আসে চিঠি লেখাতে কিংবা হিসেব মিলিয়ে নিতে। লোকে আসে রোগের ওষুধ জানতে। সে কেবল মানুষকে দেখে আর দেখে। সে জানে, পৃথিবীর কোনো কিছুর একটি ঠিক আর একটির মতো নয়। আছে বর্ণভেদ। আছে বৈশিষ্ট্যের তফাৎ। এক গাছের দুটি পাতাও নয় এক রকমের। সে মানুষে মানুষে সেই তফাৎ দেখতে পায়। দেখে বৈশিষ্ট্য। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য তার আলাদা বিধান, আলাদা ব্যবহার, আলাদা ওষুধ। এক-একটি মানুষের অর্থ এক-একটি আলাদা জগৎ। প্রতিটি মানুষেরই আছে অস্তিত্বের বিকিরণ। মানুষ দেখে দেখতে লোকটার এমন অবস্থা হয়, যে সে মানুষের সেই বিকিরণটি অনুভব করে। সেই বিকিরণ অনেকটা আলোর মতো। বিভিন্ন মানুষে আলোর রঙ আলাদা। বড় সরল লোক সে। সে ভাবে তার মতো আর সবাইও মানুষের বিকিরণ দেখতে পায়। তাই সে কখনো হয়তো কোনো লোককে দেখে চেঁচিয়ে বলে—এঃ হেঃ তোমার আলোটা যে লাল গো— ড লাল। ও যে রাগের রঙ।

শুনে লোকে হাসে, বলে—পাগল।

লোকটা নানা রকমের আলো দেখেছে জীবনে। কখনো পাঠশালা থেকে ফেরার পথে—যখন বর্ষার ভারী মেঘ নীচু হয়ে ঘন ছায়া ফেলেছে চরাচরে—ঝুমকো হয়ে এসেছে আলো—তখন মহাবীরথানের বটগাছ পেরোবার সময়ে লোকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখেছে, তার সামনে এক আলোর গাছ। আলোর ঝালর তার পাতায়, পাতায় কাণ্ডে, ডালে। তারপর সে চারদিকে চেয়ে দেখছে হঠাৎ যেন পাল্টে গেছে পৃথিবীর রূপ। বাতাসে মাটিতে শূন্যে সর্বত্রই আলোময় কণা। খেলা করছে চরাচর জুড়ে আলোর কণিকাগুলি। সে দেখল নানা রঙের আলোর কণা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই কণাগুলিই খেলার ছলে তৈরী করছে গাছপালা, মাটি, মেঘ। তারাই ঘুরছে, ফিরছে তৈরী করছে সব কিছু, আবার ভেঙে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে অন্য চেহারায়। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে ভয় পেয়ে চোখ বুজল। টের পেল, তার দেহ জুড়ে সেই কণাগুলিরই খেলা চলেছে। মাঝে মাঝেই সে সেই কণাগুলিকে দেখতে পেত, ভাবত—তবে কি সৃষ্টির সত্য চেহারাটা এই যে, তা আলোময় এবং কণিকাময়? কখনো কখনো সে দেখেছে, সেই কণাগুলির চলাফেরা ছন্দময় যেন এই মহাবিশ্বের কোনো অশ্রুত সঙ্গীতের সঙ্গে তারা সুরে বাঁধা। তাদের দোলা এবং চলা সেই ছন্দটিকে প্রকাশ করছে।

কোনো লোকই তার এই সব কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। সে সব বিচিত্র আলোর বর্ণনা দিত মায়ের কাছে, বন্ধুর কাছে। তারা বলেছে পাগল।

সংসারী মানুষের আছে সুখবোধ। গৃহস্থ সুখ পায় পুত্রমুখ দেখে, নিজের সঞ্চয় দেখে যত কিছু সে অধিকার করে পৃথিবীতে তত তার সুখ। লোকটার তেমন সুখ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তার অদ্ভুত এক আনন্দ আসে। একা একা সেই অকারণ আনন্দের প্লাবনে ভেসে যেতে যেতে সে চীৎকার করে ছেলে বউকে ডাকে, ডাকে চেনা লোকেদের. সেই আনন্দে সবাইকে সামিল করতে। বস্তুত কেউই তার সেই আনন্দকে বুঝতে পারে না। লোকটা অবাক হয়ে ভাবে, তবে বুঝি আমি পাগলই! আমার একার জন্যই বুঝি কিছু দৃশ্য আছে, কিছু শব্দ আছে, আছে অপার্থিব আনন্দ!

মাঝে মাঝে ক্ষেতের কাজ করতে করতে, পোয়াল নাড়া বাঁধতে বাঁধতে, গোয়াল পরিষ্কার করতে করতে, হঠাৎ চমকে উঠে ভাবে—আরে! আমি

লোকটা কে। আমি এখানে কেন? এতো আমার ক্ষেত নয়! এতো নয় আমার বাড়িঘর। আরে! আমি যেন কোথায় ছিলাম—কোথায় ছিলাম! সে যে এক গভীর নীল স্নিগ্ধ জগৎ। সেখানে এক অদ্ভুত আলো ছিল। ছিল এক বিচিত্র সুন্দর শব্দ! সেই আমার জগৎ থেকে কে আমাকে এখানে আনল? কেন আনল এই মৃত্যুশীলতার মধ্যে, হঠাৎ সে চমকে উঠে বোধ করে—যে পথ দিয়ে আমি এসেছিলাম সেই পথের দু'ধারে ছিল অনেক তারা নক্ষত্র। সেই বীথিপথটি অনন্ত থেকে চলে গেছে অনন্তে। তার শুরু নেই শেষও নেই। সেই পথে চলতে চলতে কেন আমি থেমে গেলাম। নেমে এলাম এইখানে? এই কথা ভেবে লোকটা চারদিকে চেয়ে এক সম্পূর্ণ অচেনা অদ্ভুত অপার্থিবতাকে বোধ করে। কোনো কিছুকেই সে আর চিনতে পারে না।

সংসারী মানুষদের আছে ক্ষেতখামার পশুপাখি গাছপালা ছেলে বউ। এই সবের সঙ্গে তারা কেমন মেখেঝুখে থাকে। তারা নিজের জিনিস চেনে, চেনে পরের জিনিস। তারা সে সব জিনিসে নিজেদের চিহ্ন দিয়ে রাখে। অবিকল তাদের মতোই এই লোকটারও আছে সব। কিন্তু তাতে তার চিহ্ন দেওয়া নেই। বউ রাগ করে—তোমার বাড়ি তো বাড়ি নয়, এ হচ্ছে হাট। সারাদিন এখানে লোক আসে যায়। তোমার দিন কাটে দাওয়ায় বসে। কখনো বা বলে—তুমি অন্যের ক্ষেত থেকে পাখি পাখালি তাড়াও, ছাগল গরু তাড়াও, অন্যের অসুখের দাও ওষুধ, অন্যের দুঃখে গলে পড়ো। আমাদের ওপর তোমার মন নেই। অথচ আমরাই তোমার আপনজন, আর এ সমস্ত তোমার নিজের জিনিস।

লোকটা ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে না। কেমন গুলিয়ে যায়। মাঝে মাঝে সে যে নিজেকেই অনুভব করতে পারে না ঠিকমতো, তবে নিজের বলে কী অনুভব করবে?

এ কথা সত্য যে মানুষটি পৃথিবীকে ভালবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে। গৃহস্থের এরকম হতে নেই। গৃহস্থকে আরো শক্ত হতে হয়, হতে হয় হিসেবী সঞ্চয়ী, তার চাই আত্মপর ভেদজ্ঞান। তার বউ বলে—আরো পাঁচ-জনকে দেখ। দেখ, তারা নিজেদের ঘরে বাস করে। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি আছো পরের ঘরে।

লোকটার বউ বলে এ কথা। লোকটার বুড়ি মাও বলে। বেঁচে থাকতে লোকটার বাবাও বলত—এ সংসারে তুমি দুঃখ পাবে বলেই জন্মেছো।

লোকটা অন্য রকম বোঝে। সে যখন দাওয়ায় বসে দূরের গাঢ় ধূসর পাহাড়টিকে দেখে, যখন দেখে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশ কিংবা নিষ্পাপ শিশুর মুখ, তখন যে অনাবিল আনন্দকে সে টের পায়, সে আনন্দ তো তার নিজের। সে আনন্দের কারণ হোক না তার নিজের শিশু কিংবা দূরের পাহাড় কিংবা আকাশ—না কিনা সংসারের বাইরে—তার সৌন্দর্য। তবে তো আনন্দই নিজের, সেই আনন্দই আপন করে তোলে এই বিশ্ব সংসারকে। যে জানে সে জানে, পর বলে কিছু নেই।

জলে ডুবে মারা গেছে একটি শিশু। বাপ তার মৃত শিশুকে শরীর ঢেকে কোলে নিয়ে চলেছে। লোকটা থেমে চেয়ে থাকে। দেখে শিশুটির মুখখানা ঢাকা, তবে পা দুটি কেবল ঝুলে আছে। সেই শিশুটিকে কোনো দিনই দেখেনি লোকটা। আজও দেখল না। কেবল সেই চির অপরিচিত শিশুটির দু'খানা পা দেখে রাখল। বুকখানা ব্যথিয়ে উঠল তার। হু-হু করে কান্না এল। অচেনা বাপটির মুখ দেখে ফেটে গেল বুক। বড় অবাক হল সে। ভাবতে বসল, কেন এরকম হবে। যাকে কোনোদিন দেখিনি, যে আমার চেনা ছিল না, তার জন্য কান্না কেন। তাহ'লে কি যাদের পর করে রেখেছি তারা আমার যথার্থ পর নয়? ঐ যে এক মুহূর্তের একটু দুঃখ তা কি কাঁটার মতো নির্ভুল বলে দেয় না যে, ঐ অপরিচিত শিশুটিও ছিল আমারই জন। যেমন দূরের দেশে আকাল এলে, মড়ক লাগলে মানুষের প্রাণ ছটফট করে। ঐ একটু দুঃখ কি কয়েক পলকের জন্য দূর ও নিকট, আপন ও পরের ভেদ-রেখা মুছে দেয় না? চাবুকের মতো চকিতে আঘাত করে না মানুষের স্বার্থপরতাকে?

গাঁয়ের বুড়ো মাতব্বররা শুনে বলে—তুমি বাপু আহাম্মক। অচেনা একটা জলে ডোবা শিশুকে দেখে তোমার যে দুঃখ তা তো আসলে তোমার নিজের ছেলের কথা ভেবেই ঐ যে অচেনা বাপটির মুখে তুমি শোক দেখলে, ঐ বাপের জায়গায় তুমি দেখেছো নিজেকেই। মানুষ কি পরের জন্য দুঃখ পায়। দুঃখ পায় নিজের যদি ঐ অবস্থা হয়—এই ভেবে। দূরের দেশের আকাল কি মড়কের কথা শুনে লোকে যে অস্থির হয়, তা তার নিজের দেশের কথা মনে করেই। পরের জন্য যে দুঃখ, তা আসলে নিজেরই প্রক্ষেপ।

লোকটা উঠে পড়ে। ভাবতে ভাবতে যায়। মাঝপথে কী যেন মনে পড়ে। অমনি ফিরে এসে মাতব্বরদের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটাকে

বলে—খুড়োমশাই, পূর্ণিমা কি অমাবস্যা [illegible]রে আপনার হাঁটুতে বাতের ব্যথাটা বাড়ে, তা কি সত্যি ?

—বাড়ে তো।

—তাহলে তো বলতেই হয় দূরের চাঁ[illegible] সঙ্গে আপনার শরীরের একটা সম্পর্ক আছে ! বাইরে থেকে তো তা [illegible] যায় না।

আকাশে ঘনিয়ে আসে বর্ষার গাঢ় [illegible] ঘন মেঘের ছায়া পড়ে চারধারে। বর্ষার ব্যাঙ ডাকে। বৃষ্টি নামে। [illegible] তার দরজার চৌকাঠে বসে সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে। কোন দূর [illegible] বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আসে, গাঢ় ভালবাসায় মাথে মাটিকে. ভিজিয়ে দে[illegible]। বৃষ্টির শব্দে যেন কোন ভালবাসার কথা বলা হতে থাকে। [illegible] বোঝে না লোকটা, কিন্তু টের পায়। ঐ যে বর্ষার ব্যাঙ ডাকে, গাছ[illegible] হয়, সে প্রাণ দিয়ে তা শোনে। তার মনে হয় ঐ ব্যাঙের ডাক মেঘকে [illegible]ন, গাছপালা তাকে আকর্ষণ করে, মাটিতে টেনে নামায় মেঘ থেকে [illegible] রকম টান ভালবাসার ওপরেই চলেছে সংসার। লোকটা সেই বৃষ্টির দৃশ্য [illegible] নিথর হয়ে তার চৌকাঠে বসে থাকে তো বসেই থাকে। তার চোখে [illegible] পড়ে না। এমনিই বসে থেকে সে শীতের কুয়াশা দেখে, দেখে বৈশাখের ঝড়।

মাঝে মাঝে বিছানায় শুয়ে [illegible] তার ঘুম ভাঙে। বুকচাপা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে সে তবু তা[illegible] মনে হয় সে ঠিক ঘরে নেই। নিশিরাতের পরী তাকে উড়িয়ে এনে[illegible] বাইরে। শুইয়ে দিয়ে গেছে অবারিত মাঠের মাঝখানে। ঘরের দেয়া[illegible] দরজা নেই, আগল নেই। টের পায়, ম্লানমুখ চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্না [illegible] ধরেছে চরাচর। কুকুর কাঁদে। বাতাসে ভাসে পায়রার পাল[illegible] [illegible]দার ঘর ভেঙে রক্তমাখা মুখে বেড়ালটা নিঃশব্দ থাবায় হেঁটে উঠে[illegible]ন। তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা কাঁদছে, চাঁদ ও শূন্য[illegible] চেয়ে—তার তুটি ছানা নিয়ে গেছে শেয়ালে। বেড়ালটা সেই কান্না [illegible] আকাশের দিকে তাকায়। দেখে, বিপুল বিস্তার। ম্লান জ্যোৎস্না[illegible] স্নাত পার্থিব পালকগুলি ঝেড়ে উড়ে যায় একটি পায়রা। নিকষ [illegible] আলোয় সে পৃথিবীর সব সীমা পার হয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে বেড়ালটা [illegible] দেখে। কুকুরটা কাঁদে, আর কাঁদে। চাঁদ দেখে, দেখে শূন্যতা। [illegible] সেই দূরগামী পায়রাটি দিকে একবার থাবা তোলে বেড়ালট—দূ[illegible] [illegible]টির জন্য সে একবার লোভ

বোধ করে। তারপর কুকুরের কান্না শুনে থাবাটি তুলে রেখেই সে বসে থাকে।

লোকটা ঘুমোয় না। প্রতিটি দুঃখীর দুঃখকেই তার বহন করতে ইচ্ছে করে, ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে প্রতিটি পাপীকে। তার বাবা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল—এই সংসারে দুঃখ পাবে বলেই তুমি জন্মেছো। সেই অভিশাপকে হঠাৎ তার আশীর্বাদ বলে মনে হয়। সে উঠে চলে আসে। রূপোলী নদীটির ধারে অবারিত মাঠটিতে! দেখে, আকাশের মহাসমুদ্র সাঁতরে ধীর গতিতে চলেছে গ্রহপুঞ্জ, অথৈ সময়কে পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাদের জ্যোতি। লোকটির পায়ে পায়ে ক্ষণস্থায়ী ঘাসের ডগাগুলি থেকে গড়িয়ে পড়ে শিশিরের কণা। ঘরের চালে তখনো শুব্ধ বিমর্ষতায় থাবা তুলে বসে থাকে বেড়ালটি। কুকুরটি তার দুটি হৃত সন্তানের জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে কাঁদে। লোকটির পায়ে পায়ে শিশির ঝরতে থাকে। কেবল শিশির ঝরে যায়।

কেমন নির্বিকার বয়ে যায় রূপালী নদীটি। সেই নদীটির আছে উচ্ছ্বাস, আছে আনন্দ বেদনা তবু, কেমন উদাসীনতার গৈরিক রঙ তার সর্বাঙ্গে লোকটা দেখে, আর ভাবে। দুঃখও একরকমের ভাব, সুখও একরকমের ভাব। জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, সুখকেও। সুখ দুঃখ কোনটাই যেন ব্যাপ্ত না হয়, সব উৎপাত চুকে যাক। এই দয়া হোক তার প্রতি চিত্ত যেন উদাস থাকে। দয়া হোক তার প্রতি—এই দয়া হোক। সুখে দুঃখে তার থাক অপ্রতিহত আনন্দ, তার থাক বয়ে-যাওয়া। রূপালী নদীটি যেমন নিয়ে যায় মানুষের আবর্জনা ক্লেদ শ্রান্তি, বহন করে মানুষের বাণিজ্যের ভার। তেমনই সে বোধ করে, দুঃখ পাবে বলে নয়, সে সংসারে জন্মেছে সকলের দুঃখকে বহন করবে বলে। রূপালী নদীটির মতো নির্বিকার বয়ে যাবে।

বিনীত, সুন্দর একখানা অহংশূণ্য মন নিয়ে সে চেয়ে থাকে। তখন তার চারপাশে খেলা করে আণবিক আলোর কণিকাগুলি। এক নিস্তব্ধ সঙ্গীতের দোলাচল তাদের চলাফেরায়। তার কাছে উড়ে আসে এক নীলাভ জগতের স্মৃতি, উড়ে আসে আলো, আসে সুন্দর সব শব্দ—যা এই সংসারের নয়। এক অপরূপতাকে ঘিরে ধরে। তখন একে একে নিভে যায় জাগতিক হাত, পা, চোখ এবং মন। নিভে যায় চেনা মানুষের মুখ। তখন পাখির ডিমের মতো ভোর নীল আকাশের নীচে ঘাসের ওপর সে বসে হাঁটু গেড়ে। অনুভব করে, সে আর সে নয়। এখন ভোর, আকাশের তলায়, রূপালী নদীটির

পাশে, অবারিত মাঠের ঘাসের উপর পড়ে আছে তার বীজ। সেই বীজটিতে একটিমাত্র বোধ সংলগ্ন হয়ে আছে—আমি। যে প্রাণপণে পৃথিবীর ঘাস মাটি আঁকড়ে ধরে। যেন বা এক দূর এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর দরজায়, হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে তাকে। সে বিড় বিড় করে বলে—আর কিছুক্ষণ—আর কিছুক্ষণ আমাকে সংলগ্ন থাকতে দাও এই সংসারের সঙ্গে। তারপর আমি চলে যাবো।

গ্রামের এক প্রান্তে থাকে এক সাধক। বুড়োসুড়ো মানুষ। সাধন-ভজন আর ভিক্ষেসিক্ষে করে তার দিন কাটে। লোকটা তার কাছে যায়, তার দাওয়ায় বসে, জিজ্ঞেস করে—আপন কি কখনো দেখেছেন আলোর গাছ? কিংবা ছন্দোবদ্ধ আলোর কণিকাগুলি? দেখেছেন মানুষ আলো বিকিরণ করে? কখনো কোন নীলাভ জগতের স্মৃতি আপনার মনে আসে না? আপনি শোনেননি সেই শব্দ যা মানুষকে ভিক্ষা করে ফেরে?

বুড়োসুড়ো মানুষটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানায়—না। অনেকক্ষণ চিন্তান্বিত মুখে তামাক খায়। তারপর এক সময়ে লোকটার দিকে চেয়ে বলে—আমি ওসব কিছুই দেখিনি বাবা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি দেখলেও বা দেখতে পারো। হয়তো সত্যিই আছে ওসব। আমিও শুনেছি সৃষ্টির মূলে আছে এক শব্দ।

লোকটার আর চাষবাস করতে ইচ্ছে করে না, যেমন ইচ্ছে করে না গরুর দুধ দোয়াতে, ইচ্ছে করে না নিজের জন্য উপার্জন করতে। তা বলে সে বসেও থাকে না। সে লোয়াজিমা সংগ্রহ করে মানুষের জন্য। সে দেখে মানুষের জ্যোতি। বৈশিষ্ট্যমাফিক তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। সে মানুষকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে। দান করে দক্ষতা এবং ধর্ম। সে যা জানে সবই শেখায় তাদের, বর্ণভেদ অনুসারে। কেউ নেয় তার চিকিৎসাবিদ্যা, কেউ নেয় অঙ্কশাস্ত্র, কেউ শেখে চাষবাস।

বউ গঞ্জনা দেয়—তোমার সংসার যে ভেসে গেল।

লোকটা হাসে—তাই কখনো যায়!

বউ বলে—তোমার যে বৃত্তি-পেশা নেই, উপার্জন নেই!

লোকটা বলে—তা কেন! আমার সব আছে। যেখানেই আমি বীজ বপন করেছি সেখানেই দেখেছি বৃক্ষের উৎপত্তি। একথা ঠিক যে নিজের জন্য আমার কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু মানুষে যদি বুঝতে পারে যে, আমাকে

বাঁচিয়ে রাখা তাদের স্বার্থের পক্ষেই প্রয়োজন, তবে তারাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার রোয়াজিমা তারাই এনে দেবে আমাকে। সংসারের মরকোচটা এরকমই হওয়া উচিত। টান ভালবাসার ওপর সংসার চলুক। আমি কেন স্বার্থ খুঁজে বেড়াব? লোকের ভালবাসা জাগিয়ে দিই, তারা আমার সংসার কাঁধে করে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

কিন্তু বউ তা মানতে চায় না। ঝগড়া করে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাপকে সাবধান হতে বলে। কিন্তু ততদিনে লোকটা হয়ে গেছে মানুষ-মাতাল, জগৎ-মাতাল। তার নিকটজনেরা তাকে বলে—অপদার্থ, বাউণ্ডুলে। তারা মনে করে এই লোকটাই তাদের দুঃখের কারণ। তারা লোকটার হাজার দোষ দেখতে পায়, দেখে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা।

কিন্তু যারা দূর থেকে আসে, তারা তার কাছে এসে এক আশ্চর্য সুগন্ধ পায়। তারা টের পায়, এক স্নিগ্ধ সাদা আলোর ছটা তাকে ঘিরে আছে। বলে—আহা গো কী সুন্দর গন্ধ এখানে! তুমি যে মানুষের গায়ের আলোর কথা বলো, সে আলো যে তোমারও রয়েছে! বড় সুন্দর আলোটি—হাঁসের পালকের মতো সাদা—এর মধ্যে কোনো হিংসা নেই, দ্বেষ নেই। এই আলোতে দু' দণ্ড বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেউ বা এসে বলে—তুমি যে আমাকে ওষুধের গাছ চিনিয়েছিল, চিনিয়েছিলে রোগ নির্ণয় করতে, দেখ, সেই পেশায় আমি এখন দাঁড়িয়ে গেছি। একটা সময়ে আমি পড়ে থাকতুম বাবুদের বাড়ির আস্তাবলে, গরু ঘোড়ার সেবা করতুম, কিন্তু সে কাজে আমার কোনো দক্ষতা ছিল না। কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারত না যে আসলে ও কাজ আমার নয়। আমার মধ্যে যে বৈদ্য হওয়ার গুণ আছে তা তুমিই বুঝেছিলে। এই দেখ, তোমার জন্য এনেছি জামাকাপড়, তোমার বউয়ের জন্য শাড়ি গয়না, তোমার ছেলেপুলেদের জন্য খেলনা আর খাবার।

এইভাবে লোকটার সামনে অযাচিত উপহার জমে ওঠে।

যে লোকটা ছিল এ গাঁয়ের বিখ্যাত চোর, সে এসে একদিন সলজ্জ হাসিমুখে প্রণাম করে দাঁড়াল, বলল—আমাকে—মনে আছে তো তোমার? আমি ছিলাম এ দিকের দশখানা গাঁয়ের বিখ্যাত চোর। রোজ আমি রাতে চুরি করতে বেরোতুম, আর তুমি তোমার দাওয়া থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বলতে—ওরে আয়, চুরি করতে যাবি তো তার আগে একটু তামাক খেয়ে যা।

দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করি। তা আমি বুদ্ধিটা মন্দ নয় দেখে এসে বসতাম। তামাক খেতে খেতে পাঁচটা কথা এসে পড়ত। কথায় কথায় যেত ভোর হয়ে। আমি কপাল চাপড়ে চাপড়ে দুঃখ করে বলতাম—ঐ যাঃ, গেল আমার এক রাতের রোজগার। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতে—আজ রাতে সকাল-সকাল বেরোস। আবার পরের রাতেও তুমি ডাক দিতে। আবার রাত পুইয়ে যেত। আমি মনে মনে ভাবতাম, এই লোকটাই খাবে আমাকে। উপোস করিয়ে মারবে। তাই আমি তোমার দাওয়ার সামনেকার রাস্তাটা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলাম একদিন। কী করে টের পেয়ে মাঝপথে তুমি ছিলে ঘাপটি মেরে। ধরলে আবার, কথায় কথায় দিলে রাত পুইয়ে। রোজ এমন হতে থাকলে আমি একদিন অন্য উপায় না দেখে ধরলাম ঠেসে তোমার পা, বললাম—ঠাকুর ব্রাহ্মণ হয়ে কেন তুমি আমার অন্ন মারছো! এ যে আমার বৃত্তি। এ না করলে যে ভাতে মরণ! তুমি হেসে বললে—আচ্ছা, আজ বাড়ি যা। তুই আর চুরির জানিস কী? আমি তোকে চুরির ভাল কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দেবো। আজ আমি যাবো তোর সঙ্গে। শুনে ভারী ফুর্তি হল মনে। জানতাম, তোমার জানা আছে বিবিধ বিদ্যা। তুমি জানো রসায়ন, জানো গণিত, জানো বলবিদ্যা, জানো পদার্থের গুণ। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি হবো চোরের রাজা। সেই রাতে বেরোলাম তোমার সঙ্গে। গল্পে গল্পে পথ হাঁটছি, যাবো ভিন্‌গাঁয়, ধনী মহাজনের দোকান লুটে আনবো দু'জনে। মনে বড় ফুর্তি। হঠাৎ মাঝপথে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁরে, তোর ঘরে না সুন্দরী বৌ আছে। আমি বললাম—তা আছে তো! তুমি বললে—আরে, তুই না একবার বলেছিলি, তোর পাশের বাড়ীতে একটা বদ লোকের বাস, সে লোকটা তোর বৌয়ের দিকে নজর দেয়! আমি বললাম—হ্যাঁ, সত্যি। তখন তুমি বললে—তা এই রাতে যদি সে লোকটা তোর ঘরে আসে! তুই তো রাতবিরেতে ফিরিস, তোর বৌ ঘুমচোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। সে লোকটা হয়তো তোর গলা নকল করে ডাকবে, আর তোর বৌ উঠে দরজা খুলে দেবে। যদি তাই হয়! রাতবিরেতে একা সুন্দরী বৌকে রেখে বেরিয়েছিস—পাশেই ঘোষের বাসা—কাজটা কি ঠিক হয়েছে? অমনি বিছের কামড়ের মতো মন ছটফট করে উঠল। বললাম—তাই তো! বলে সিঁদকাঠি ফেলে দৌড় লাগালাম ঘরের দিকে। তারপর থেকে সেই বিষ-যন্ত্রণার আর ঘর থেকে বেরোতে পারি না। রাত হলেই ঘরের বাইরে মন টানে। বাইরে বেরোই তো ঘরের কথা ভেবে ফাঁপর

হয়ে পড়ি। সে এমন দোটানায় পড়লাম যে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না। রোগা হয়ে হাড় বেরিয়ে গেল। তখন আবার গিয়ে তোমার পায়ে পড়লাম— এ কী সর্বনাশ করলে আমার! আমার যে বৃত্তি ঘুচে গেল। অথচ চুরি ছাড়া আর যে আমি কিছুই শিখিনি! এখন কী করে আমার দিন চলবে? তুমি গম্ভীর হয়ে ভাবলে, ভেবে বললে—তোর যন্ত্রপাতিগুলো আন তো। এনে দেখালাম। তুমি সে সব দেখে টেখে বললে—তুই তো তালাচাবির কলকব্জা ভাল চিনিস। জানিস এদের মরকোচ। দেখ তো ভাল তালা বানাতে পারিস কিনা—যে তালা চোর খুলতে পারে না। এইসব যন্ত্রপাতি তোর সবই কাজে লাগবে তাতে। তোমার সেই কথামতো মনের দুঃখে অগত্যা তালা তৈরী করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সে সব তালার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এখন শহরে আমার ফলাও কারবার। পাঁচজন আমাকে ভদ্রলোক বলে সম্মান করে।

সেই চোর এই কথা বলে লোকটার সামনে তার পোঁটলা খুলে দেয়, বলে— তোমার জন্য এনেছি ভাল তামাক, হুঁকো, একজোড়া শহরে চটিজুতো, ফলমূল—

এইভাবে মানুষেরা আসে। নিজেদের গল্প বলে। তাদের সংগৃহীত উপহার দিয়ে যায়। তারা জানে, এ লোকটা বেঁচে থাকলে তারাও বাঁচবে বাঁচবে আরো হাজারটা লোক! তাই লোকেরা এসে তাকে ঘিরে বসে, নিজের খাবারের ভাগ দিয়ে যায়, দেয় পরিধেয় কখনো বা শৌখীন জিনিস, রাত জেগে তাকে পাহারা দেয়।

তবু কেউই তাকে সঠিক বুঝতে পারে না। বলে—আরে! আহাম্মকটাকে দেখছি বিগ্রহ বানিয়েছে সবাই! প্রণামীর ঠেলায় আহাম্মকটা যে হয়ে গেল ধনী। কেউ বলে—ঘড়েল লোকটাকে দেখ, আহাম্মকদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে!

এরকম বিবিধ কথা হয় লোকটার সম্বন্ধে। কিন্তু সকলেরই জিজ্ঞাসা— 'বাপু, তুমি আসলে কে? আসলে কী? তুমি সত্যিকারে কেমন?

লোকটা উত্তরে দিতে পারে না। আলো যেমন বলতে পারে না—আমি আলো, বাতাস যেমন বলতে পারে না—আমি বাতাস; সেইরকম সেও বলতে পারে না সে কী বা কে। কিন্তু মানুষের প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে এক রকম অনুভব করে। বুঝতে পারে যোজন যোজন বিস্তৃত তার অস্তিত্ব। সে কেবল পৃথিবীকে ভালবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে।

চৈতন্যময় আলোর আণবিক কণিকাগুলি তাকে ঘিরে খেলা করে। তার ভিতর থেকে স্পন্দমান সৃষ্টির মূল শব্দটি উঠে আসতে থাকে। লোকটা ময়ূর-পুচ্ছের মতো নীল আকাশের দিকে চায়, চেয়ে থাকে দূরের পাহাড়টির দিকে। হঠাৎ অনুভব করে, তারই অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিচ্ছে আকাশ, বাতাস, নক্ষত্রপুঞ্জ, আলো এবং অন্ধকার। ঐ যে দূরের পাহাড়টি, রূপালী নদীটি, ঐ যে অবারিত মাঠ, অচেনা যে সব মানুষ চলেছে রাস্তা দিয়ে, এই যে সব গাছপালা, পশুপাখি এই সবই জন্ম নিচ্ছে তার অস্তিত্ব থেকে, লয় পাচ্ছে তারই ভিতরে। সে তার এই অনন্ত অস্তিত্বের কথা লোককে বলতে পারে না। সে রাত জেগে দাওয়ায় বসে গুড় গুড় করে তামাক খায়, আর ভাবে, আর অনুভব করে। অনাবিল এক আনন্দের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সে সেই আনন্দের ভাগ কাউকেই দিতে পারে না। সে ঘোরে ফেরে তার গাছপালাগুলির কাছে, বলে বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। সে পশুপাখি, গৃহপালিতদেরও বলে—বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। সে তার ছোট ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বলে—বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। তার দেহ থেকে সৌরভ এবং আলোর মতো ঐ কথা সমস্ত বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে যায় —বেঁচে থাকো বেড়ে ওঠো।

তারপর একদিন পড়ে থাকে তার সংসার, তার সঞ্চিত সম্পদ। সে একা একা চলে আসে পাহাড়ে। একটা গুহা খুঁজে বের করে। গুহায় ঢুকে সে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয় ভারী পাথরে। তারপর সেই নিস্তব্ধতায় বসে সে মানুষের জন্য কয়েকটি সৎ চিন্তা করে মরে যায়।

লোকটা মরে যায়, তার সেই চিন্তাগুলি কিন্তু মরে না। তারা ধীরে ধীরে তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ঘুরে ঘুরে গুহা থেকে বেরোবার মুখ খোঁজে। তারপর তারা পাহাড় ভেদ করে, পার হয় নদী, প্রান্তর, পার হয়ে যায় সমুদ্র। অদৃশ্য কয়েকটি অলীক পাখির মতো মানুষের কাছে চলে আসে। ঘুরে ঘুরে বলে—তমসার পাড়ে আছেন এক আলোকময় অনামী পুরুষ। আমরা তার কাছ থেকে এসেছি, তোমরা আমাদের গ্রহণ কর।

কিন্তু, নিজের সুখ-দুঃখে কাতর মানুষ সেই ডাক শুনতেই পায় না।

আমরা

সেবার গ্রীষ্মকালের শেষদিকে দিন চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগে উঠলেন আমার স্বামী। এমনিতেই তিনি একটু রোগা ধরনের মানুষ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর তাঁর চেহারাটা আরো খারাপ হয়ে গেল। দেখতাম তাঁর হনুর হাড় দুটো গালের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গাল বসা, চোখের নীচে গাঢ় কালি, আর তিনি মাঝে মাঝে শুকনো মুখে ঢোঁক গিলছেন—কণ্ঠাস্থিটা ঘন ঘন ওঠা নামা করছে। তাঁকে খুব অন্যমনস্ক, কাহিল আর কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া দেখাত। আমি তাঁকে খুব যত্ন করতাম। বীট গাজর সেদ্ধ, টেংরির জুস্, দু'বেলা একটু একটু মাখন, আর রোজ সম্ভব নয় বলে মাঝে মধ্যে এক-আধটা ডিমের হাফবয়েল তাঁকে খাওয়াতাম। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার এক মাস পরেও তাঁর চেহারা ভাল হল না, বরং আরো দুর্বল হয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে তিনি ভয়ঙ্কর হাঁফাতেন, রাত্রিবেলা তাঁর ভাল ঘুম হত না, অথচ দেখতাম সকালবেলা চেয়ারে বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি ঢুলছেন, কষ বেয়ে নাল গড়িয়ে পড়ছে। ডাকলে চমকে উঠে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেত যে তিনি স্বাভাবিক নেই। বরং আরো অন্যমনস্ক এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাঁকে।

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার কী হয়েছে বলো তো!

তিনি বিব্রতমুখে বললেন—অনু, আমার মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আমার এখনো সারেনি। ভিতরে ভিতরে আমার যেন জ্বর হয়, হাড়গুলো কট্ কট্ করে, জিভ তেতো-তেতো লাগে। তুমি আমার গাটা ভাল করে দেখ তো!

গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা। সে কথা বলতেই তিনি হতাশভাবে হাত উল্টে বললেন—কী যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার বোধহয় একটু একসারসাইজ করা দরকার। সকাল বিকেল একটু হাঁটলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে খুব ভোরে উঠে, আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তিনি বেড়াতে বেরোতেন। আমি আমাদের সাত বছর বয়সের ছেলে বাপিকে তাঁর

সঙ্গে দিতাম। বাপি অবশ্য বিকেলবেলা খেলা ফেলে যেতে চাইত না, যেত সকালবেলা। সে প্রায়ই এসে আমাকে বলত—বাবা একটুও বেড়ায় না মা, পার্ক পর্যন্ত গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে, আর রেলিঙে ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে। আমি বলি, চলো বাবা, লেক পর্যন্ত যাই, বাচ্ খেলা দেখে আসি, আমাদের স্কুলের ছেলেরাও ওখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করে, কিন্তু বাবা রেললাইন পারই হয় না। কেবল ঢুল-ঢুল চোখ করে বলে, তুই যা, আমি এখানে দাঁড়াই, ফেরার সময়ে আমাকে খুঁজে নিস।

আমাদের স্নান ঘরটা ভাগের। বাড়িওয়ালা আর অন্য এক ভাড়াটের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা অফিসের সময়ে অন্য ভাড়াটে শিববাবুর গিন্নী এসে চুপি চুপি বললেন—ও দিদি আপনার কর্তাটি যে বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন, তারপর আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমার কর্তাটি তেল মেখে কখন থেকে ঘোরাফেরা করছেন, এইমাত্র বললেন—দেখ তো, অজিতবাবু তো কখনো এত দেরী করে না—

শুনে ভীষণ চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি বাথরুমের দরজায় কান পাতলাম। কিন্তু বাথরুমটা একদম নিশ্চুপ। বন্ধ দরজার ওপাশে যে কেউ আছে তা মনেই হয় না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—ওগো, কী হল—

তিনি বললেন—কেন?

—এত দেরী করছ কেন?

তিনি খুব আস্তে, যেন আপনমনে বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না—তারপর হুড় মুড় করে জল ঢেলে কাক-স্নান সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

পরে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বাথরুমে কী করছিলে তুমি? তখন উনি বিরসমুখে বললেন, গাটা এমন শিরশির করছিল যে জল ঢালতে ইচ্ছে করছিল না। তাই চৌবাচ্চার ধারে উঠে বসে ছিলাম।

—বসে ছিলে কেন?

—ঠিক বসে ছিলাম না। জলে হাত ডুবিয়ে রেখে দেখছিলাম ঠাণ্ডাটা সয়ে যায় কিনা।

বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে এক সময়ে বললেন—আসলে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের ভিতরটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, জলে ভেজা অন্ধকার, আর চৌবাচ্চা ভর্তি জল ছলছল করে উপচে বয়ে যাচ্ছে খিলখিল করে—কেমন যেন লাগে!

ভয় পেয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেমন ?

উনি ম্লান একটু হাসলেন, বললেন—ঠিক বোঝানো যায় না। ঠিক যেন গাছের ঘন ছায়ায় বসে আছি, আর সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে—

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন—বুঝলে, ঠিক করলাম এবার বেশ লম্বা অনেকদিনের একটা ছুটি নেবো।

—নিয়ে ?

—কোথাও বেড়াতে যাবো। অনেকদিন কোথাও যাই না। অনু, আমার মনে হচ্ছে একটা চেঞ্জের দরকার। শরীরের জন্য না, কিন্তু আমার মনটাই কেমন যেন ভেঙে যাচ্ছে। অফিসে আমি একদম কাজকর্ম করতে পারছি না। আজ বেলা তিনটে নাগাদ আমার কলিগ সিগারেট চাইতে এসে দেখে যে আমি চোখ চেয়ে বসে আছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছি না। সে ভাবল, আমার স্ট্রোক-ফোক কিছু একটা হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডেকে আনল। কী কেলেঙ্কারী ! অথচ তখন আমি জেগেই আছি।

—জেগেছিলে ! তবে সাড়া দাওনি কেন ?

—কী জানো ! আজকাল ভীষণ অলস বোধ করি। কারো ডাকে সাড়া দিতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এমন কি মাঝে মাঝে অজিত ঘোষ নামটা যে আমার তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। কেউ কিছু বললে চেয়ে থাকি কিন্তু বুঝতে পারি না। ফাইলপত্র নাড়তে ইচ্ছে করে না, একটা কাগজ টেবিলের এধার থেকে ওধারে সরাতে, পিনকুশনটা কাছে টেনে আনতে গেলে মনে হয় পাহাড় ঠেলার মতো পরিশ্রম করছি। সিগারেটের ছাই কত সময়ে জামায় কাপড়ে উড়ে পড়ে—আগুন ধরার ভয়েও সেটাকে ঝেড়ে ফেলি না—

শুনে, আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করে উঠল। বললাম—তুমি ডাক্তার দেখাও। চলো, আজকেই আমরা মহিম ডাক্তারের কাছে যাই।

—দূর ! উনি হাসলেন, বললেন—আমার সত্যিই তেমন কোনো অসুখ নেই। অনেকদিন ধরে একই জায়গায় থাকলে, একই পরিবেশে ঘোরাফেরা করলে মাথাটা একটু জমাট বেঁধে যায়। ভেবে দেখ, আমরা প্রায় চার পাঁচ বছর কোথাও যাইনি। গতবার কেবল বিজুর পৈতেয় ব্যাণ্ডেল। আর কোথাও না। চলো, কাছাকাছি কোনো সুন্দর জায়গা থেকে মাসখানেক একটু ঘুরে আসি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন জায়গায় যাবো যেখানে একটা নদী আছে, আর অনেক গাছগাছালি—

আমার স্বামী চাকরি করেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে। কেরানী। আর কিছুদিন বাদেই তিনি সাবর্ডিনেট অ্যাকাউন্টস্ সার্ভিসের পরীক্ষা দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অঙ্কে তাঁর মাথা খুব পরিষ্কার, বন্ধুরা বলে —অজিত এক চান্সে বেরিয়ে যাবে। আমারও তাই বিশ্বাস। কিছুদিন আগেও তাঁকে পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখতাম। দেখে খুব ভাল লাগত আমার। মনে হত, ওঁর যেমন মনের জোর তাতে শক্ত পরীক্ষাটা পেরিয়ে যাবেনই। তখন সংসারের একটু ভাল ব্যবস্থা হবে। সেই পরীক্ষাটার ওপর আমাদের সংসারের অনেক পরিকল্পনা নির্ভর করে আছে। তাই চেঞ্জের কথা শুনে আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—এখন এক দেড় মাস ছুটি নিলে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না?

উনি খুব অবাক হয়ে বললেন—কিসের পড়াশুনো?

—ঐ যে এস-এ-এস না কী যেন!

শুনে ওঁর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গেল! ভীষণ হতাশ হলেন উনি। বললেন —তুমি আমার কথা ভাবো, না কি আমার চাকরি-বাকরি, উন্নতি এইসবের কথা? অনু, তোমার কাছ থেকে আমি আর একটু সিমপ্যাথি আশা করি। তুমি বুঝতে পারছ না আমি কী একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আছি!

আমি লজ্জা পেলাম, তবু মুখে বললাম—বাঃ, তোমাকে নিয়ে ভাবি বলেই তো তোমার চাকরি, পরীক্ষা, উন্নতি সব নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়। তুমি আর তোমার সংসার এ ছাড়া আমার আর কী ভাবনা আছে বলো?

উনি ছেলেমানুষের মতো রেগে চোখ-মুখ লাল করে বললেন—আমি আর আমার সংসার কি এক?

অবাক হয়ে বললাম—এক নও?

উনি ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন—না। মোটেই না। সেটা বোঝো না বলেই তুমি সব সময়ে আমাকে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে দেখ, আলাদা মানুষটাকে দেখ না।

হেসে বললাম—তাই বুঝি!

উনি মুখ ফিরিয়ে বললেন—তাই। আমি যে কেরানী তা তোমার পছন্দ না, আমি অফিসার হলে তবে তোমার শান্তি। এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি চিরকাল, এইরকম কেরানীই থাকবো, তাতে তুমি সুখ পাও আর না পাও।

—থাকো না, আমি তো কেরানীকেই ভালবেসেছি, তাই বাসবো।

কিন্তু উনি এ কথাতেও খুশী হলেন না। রাগ করে জানালার থাকের ওপর বসে বাইরের মরা বিকেলের দিকে চেয়ে রইলেন। বেড়াতে গেলেন না। দেখলাম, জ্বর আসার আগের মতো ওঁর চোখ ছলছল করছে, মাঝে মাঝে কাঁপছে ঠোঁট, হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে তুলে এমন ভাবে বসে আছেন যে রোগা দুর্বল শরীরটা দেখে হঠাৎ মনে হয় বাচ্চা একটা রোগে-ভোগা ছেলেকে কেউ কোলে করে জানালার কাছে বসিয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা পাগল। আমাদের ছেলের বয়স সাত, মেয়ের বয়স চার। আজকালকার ছেলেমেয়ে অল্প বয়সেই সেয়ানা। তার ওপর বাসায় রয়েছে ঠিকে ঝি, ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার ছেলেমেয়ে—এতজনের চোখের সামনে ভরসন্ধ্যেয় কী করে আমি ওঁর রাগ ভাঙাই! তবু পায়ের কাছটিতে মেঝেতে বসে আস্তে আস্তে বললাম—লক্ষ্মী সোনা, রাগ করে না। ঠিক আছে, চলো কিছুদিন ঘুরে আসি। পরীক্ষা না হয় এবছর না দিলে, ও তো ফি-বছর হয়—

উনি সামান্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন—তবু দেখ, পরীক্ষার কথাটা ভুলতে পারছ না। এ বছর নয় তো সামনের বার। কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি কোনোদিন আমি পরীক্ষা দেবো না—

—দিও না। কে বলছে দিতে! আমাদের অভাব কিসের! বেশ চলে যাবে। এবার ওঠো তো—

আমার স্বামীর অভিমান একটু বেশীক্ষণ থাকে। ছেলেবেলা থেকেই উনি কোথাও তেমন আদর যত্ন পাননি। অনেকদিন আগেই মা-বাবা মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই মামাবাড়িতে একটু অনাদরেই বড় হয়েছেন। বি এস-সি পরীক্ষা দিয়েই ওকে সে বাড়ি ছেড়ে মির্জাপুরের একটা মেসে আশ্রয় নিতে হয়। সেই মেসে দশ বছর থেকে চাকরি করে উনি খুব নৈরাশ্যবোধ করতে থাকেন। তখন ওর বয়স তিরিশ। ওঁর রুম-মেট ছিলেন আমার বুড়োকাকা। তিনিই মতলব করে ওঁকে একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে? উনি খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে অবশেষে বললেন—চোখ দুটি বেশ তো! তারপরই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমরা উঠলাম এসে লেক গার্ডেনসের পাশে গরীবদের পাড়া গোবিন্দপুরে। যখন এই একা বাসায় আমরা দুজন, তখন উনি

আমাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন দুরন্ত অভিমানে—এই যে আমি অফিসে চলে যাই, তারপর কি তুমি আর আমার কথা ভাবো! কী করে ভাববে, আমি ত্রিশ বছরের বুড়ো, আর তুমি কুড়ির খুকী। তুমি আজ জানালায় দাঁড়াওনি··· কাল রাতে আমি যে জেগেছিলাম কেউ কি টের পেয়েছিল! কী ঘুম বাব্বা!

ওঁর অভিমান দুরন্ত হলেও সেটা ভাঙা শক্ত না। একটু আদরেই সেটা ভাঙানো যায়। কিন্তু এবারকার অভিমান বা রাগ সেই অনাদরে বড় হওয়া মানুষটার ছেলেমানুষী নেই-আঁকড়ে ব্যাপার তো নয়! এই ব্যাপারটা যেন একটু জটিল। হয়তো উনি একেবারে অমূলক কথা বলছেন না। আমি সংসারের ভালমন্দর সঙ্গে জড়িয়েই ওঁকে দেখি। এর বাইরে যে একা মানুষটা, যার সঙ্গে অহরহ বাইরের জগতের একটা অদৃশ্য বনিবনার অভাব চলছে তার কথা তো আমি জানি না। নইলে উনি কেন লোকের ডাকে সাড়া দেন না, কেন চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন, তা আমি বুঝতে পারতাম।

রাত্রিবেলা আমাদের ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে উনি হঠাৎ চুপি চুপি আমার কাছে সরে এলেন। মুখ এবং মাথা ডুবিয়ে দিলেন আমার বুকের মধ্যে। বুঝতে পারলাম তাঁর এই ভঙ্গীর মধ্যে কোনো কাম-ইচ্ছা নেই। এ যেমন বাপি আমার বুকে মাথা গোঁজে অনেকটা সেরকম। আমি কথা না বলে ওঁকে দুহাতে আগলে নিয়ে ওঁর রুক্ষ মাথা, আর অনেকদিনের আ-ছাঁটা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গভীর আনন্দের একটি শ্বাস টেনে নিলাম। বুক ভরে গেল। উনি আস্তে আস্তে বললেন—তোমাকে মাঝে মাঝে আমার মায়ের মতো ভাবতে ইচ্ছে হয়। এরকম ভাবাটা কি পাপ?

কি জানি! আমি এর কী উত্তর দেবো? আমি বিশ্ব সংসারের রীতি-নীতি জানি না। কার সঙ্গে কী রকম সম্পর্কটা পাপ, কোনটা অন্যায় তা কী করে বুঝবো! যখন ফুলশয্যার রাতে প্রথম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেদিনও আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল বটে। কিন্তু সেটা রোমাঞ্চে নয়—শিহরণেও নয়, বরং মনে হয়েছিল—বাঁচলাম। এবার নিশ্চিন্ত। এই অচেনা, রোগা কালো কিন্তু মিষ্টি চেহারার দুর্বল মানুষটির সেই প্রথম স্পর্শেই আমার ভিতরে সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার এক মা জেগে উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা যেমন প্রেম করে, লুকোচুরি করে, সহজে ধরা দেয় না, আবার একে অন্যকে ছেড়ে যায়—আমাদের কখনো সেরকম প্রেম হয়নি।

উনি বুকে মুখ চেপে অবরুদ্ধ গলায় বললেন—তোমাকে একটা কথা বলব, কাউকে বোলো না। চলো জানালার ধারে গিয়ে বসি।

উঠলাম। ছোট্ট জানালার চৌখুপীতে তাকের ওপর মুখোমুখি বসলাম দুজন। বললাম—বলো।

উনি সিগারেট ধরালেন, বললেন—তোমার মনে আছে, বছর দুই আগে একবার কাঠের আলমারীটা কেনার সময়ে সত্যচরণের কাছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার করেছিলাম ?

—ওমা, মনে নেই ! আমি তো কতবার তোমাকে টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা বলেছি !

আমার স্বামী একটা শ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, সেই ধারটার কথা নয়, সত্যচরণের কথাই বলছি তোমাকে। সেদিন মাইনে পেয়ে মনে করলাম এ মাসে প্রিমিয়াম ডিউ-ফিউ নেই, তাছাড়া রেডিওর শেষ ইনস্টলমেণ্টটাও গতমাসে দেওয়া হয়ে গেছে, এ মাসে যাই সত্যচরণের টাকাটা দিয়ে আসি। সত্যচরণ ভদ্রলোক, তাছাড়া আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ওরই কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে—বড়লোক বলা যায় ওকে–সেই কারণেই বোধহয় ও কখনো টাকাটার কথা বলেনি আমাকে। কিন্তু এবার দিয়ে দিই। তাছাড়া ওর সঙ্গে অনেককাল দেখাও নেই, খোঁজখবর নিয়ে আসি। ভেবে-টেবে বিকেলে বেরিয়ে ছ'টা নাগাদ ওর নবীন পাল লেনের বাড়ীতে পৌঁছোলাম। ওর বাড়ির সামনেই একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল যার কাচের ওপর লাল ক্রশ আর ইংরিজিতে লেখা—ডক্‌টর। কিছু না ভেবে ওপরে উঠে যাচ্ছি, সিঁড়ি বেয়ে হাতে স্টেথস্‌কোপ ভাঁজ করে নিয়ে একজন মোটাসোটা ডাক্তার মুখোমুখি নেমে এলেন। সিঁড়ির ওপরে দরজার মুখেই সত্যর বৌ নীরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফর্সা, সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু তখন রুখু চুল, ময়লা শাড়ি, সিঁদুর ছাড়া কপাল আর কেমন একটা রাতজাগা ক্লান্তির ভারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল ওকে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই ফুঁপিয়ে উঠল—ও মারা যাচ্ছে, অজিতবাবু। শুনে বুকের ভিতরে যেন একটা কপাট হাওয়া লেগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সত্যচরণ পূবদিকে মাথা করে শুয়ে আছে, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে রোদ এসে পড়েছে ওর সাদা বিছানায়। ওর মাথার কাছে ছোটো টেবিলে কাটা ফল, ওষুধের শিশি-টিশি

রয়েছে, মেঝেয় খাটের নীচে বেডপ্যান-ট্যান। কিন্তু এগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। ঘরের মধ্যে ওর আত্মীয়-স্বজনও রয়েছেন কয়েকজন। দুজন বিধবা মাথার দুধারে ঘোমটা টেনে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা পায়ের দিকটায়। একজন বুড়ো মতো লোক খুব বিমর্ষ মুখে সিগারেট পাকাচ্ছেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, দুজন অল্পবয়সী ছেলে নিচু স্বরে কথা বলছে। দু-একটা বাচ্চাও রয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা কিছু টের পাচ্ছিল কিনা জানি না, কিন্তু সেই ঘরে পা দিয়েই আমি এমন একটা গন্ধ পেলাম—যাকে—কী বলব—যাকে বলা যায় মৃত্যুর গন্ধ। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিন্তু আমার মনে হয় মৃত্যুর একটা গন্ধ আছেই। কেউ যদি কিছু নাও বলত, তবু আমি চোখ বুজেও ঐ ঘরে ঢুকে বলে দিতে পারতাম যে ঐ ঘরে কেউ একজন মারা যাচ্ছে। যাকৃগে, আমি ঐ গন্ধটা পেয়েই বুঝতে পারলাম নীরা ঠিকই বলেছে, সত্য মারা যাচ্ছে। হয়ত এখুনি মরবে না, আরো একটু সময় নেবে। কিন্তু আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমি ঘরে ঢুকতেই মাথার কাছ থেকে একজন বিধবা উঠে গেলেন, পায়ের কাছ থেকে সধবাটিও। কে যেন একটা টুল বিছানার পাশেই এগিয়ে দিল আমাকে বসবার জন্য। তখনো সত্যর জ্ঞান আছে। মুখটা খুব ফ্যাকাশে রক্তশূন্য আর মুখের চামড়ায় একটা খড়ি-ওঠা শুষ্ক ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কে? বললাম—আমি রে, আমি অজিত। বলল—ও: অজিত! কবে এলি? বুঝলাম একটু বিকারের মতো অবস্থা হয়ে আসছে। বললাম—এইমাত্র। তুই কেমন আছিস? বলল—এই একরকম, কেটে যাচ্ছে। আমি ঠিক ওখানে আর বসে থাকতে চাইছিলাম না। তুমি তো জানো অষুধ-টষুধের গন্ধে আমার কী রকম গা গুলোয়! তাই এক সময়ে ওর কাছে নিচু হয়ে বললাম—তোর টাকাটা দিতে এসেছি। ও খুব অবাক হয়ে বলল—কত টাকা! বললাম—পঞ্চাশ। ও ঠোঁট ওল্টাল—দূর, ওতে আমার কী হবে! ওর জন্য কষ্ট করে এলি কেন? আমি কি মাত্র পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম তোর কাছে? আমি তো তার অনেক বেশী চেয়েছিলাম! আমি খুব অবাক হয়ে বললাম—তুই তো আমার কাছে চাসনি! আমি নিজে থেকেই এনেছি, অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম—তোর মনে নেই? ও বেশ চমকে উঠে বলল—না, ধারের কথা নয়। কিন্তু তোর কাছে আমি কী একটা চেয়েছিলাম না? সে তো পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশী। জিজ্ঞেস করলাম—কী চেয়েছিলি? ও

খানিকক্ষণ সাদা ছাদের দিকে চেয়ে কী ভাবল, বলল—কী যেন—ঠিক মনে পড়ছে না—ঐ যে—সব মানুষই যা চায়—আহা, কী যেন ব্যাপারটা। আচ্ছা দাঁড়া বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, মনে পড়বে। বলে ও ওঠার চেষ্টা করল। সেই বিধবাদের একজন এসে পেচ্ছাপ করার পাত্রটা ওর গায়ের ঢাকার নীচে ঢুকিয়ে ঠিক করে দিল। কিছুক্ষণ—পেচ্ছাপ করার সময়টায়, ও বিকৃত মুখে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ভোগ করল শুয়ে শুয়ে। তারপর আবার আস্তে আস্তে একটু গা ছাড়া হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—তোর কাছেই চেয়েছিলাম না কি—কার কাছে যে—মনেই পড়ছে না। কিন্তু চেয়েছিলাম—বুঝলি —কোনো ভুল নেই। খুব আবদার করে গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে চেয়েছিলাম, আবার ভিখিরির মতো হাত বাড়িয়ে ল্যাং ল্যাং করেও চেয়েছিলাম, আবার চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়েও চেয়েছিলাম —কিন্তু শালা মাইরি দিল না…। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী চেয়েছিলি! ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা চোখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে বলল—ঐ যে—কী ব্যাপারটা যেন—নীরাকে জিজ্ঞেস কর তো, ওর মনে থাকতে পারে—আচ্ছা দাঁড়া—একশ থেকে উল্টোবাগে গুণে দেখি, তাতে হয়তো মনে পড়বে। বলে ও খানিকক্ষণ গুণে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল—না, সময় নষ্ট। মনে পড়ছে না। আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম—তুই তো সবই—পেয়েছিস! ও অবাক হয়ে বলল—কী পেয়েছি—অ্যাঁ—কী? আমি মৃদু গলায় বললাম—তোর তো সবই আছে। বাড়ি, গাড়ি, ভাল চাকরি, নীরার মতো ভাল বৌ, অমন সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দার্জিলিংএ কনভেণ্টে পড়ছে। ব্যাঙ্কে টাকা, ইন্সিওরেন্স—তোর আবার কী চাই? ও অবশ্য ঠোঁটে একটু হাসল, হলুদ ময়লা দাঁতগুলো একটুও চিকমিক্ করল না, ও বলল—এ সব তো আমি পেয়েইছি। কিন্তু এর বেশী আর একটা কী যেন—বুঝলি—কিন্তু সেটার তেমন কোনো অর্থ হয় না। যেমন আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে একটা গাছের ছায়ায় বসে দেখি সারাদিন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। অথচ ঐ চাওয়াটার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না। ঠিক সেইরকম—কী যেন একটা—আমি ভেবে ছিলাম তুই সেটাই সঙ্গে করে এনেছিস! কিন্তু না তো, তুই তো মাত্র পঞ্চাশটা টাকা—তাও মাত্র যেটুকু ধার করেছিলি—কিন্তু কী ব্যাপারটা বলতো, আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না—! অথচ খুব সোজা, জানা জিনিস, সবাই চায়!

আমার স্বামীকে অন্ধকারে খুব আবছা দেখাচ্ছিল। আমি প্রাণপণে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভাবসাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। উনি একটু বিমনা গলায় বললেন—অনু সত্যচরণের ওখান থেকে বেরিয়ে সেই রাত্রে প্রথম বর্ষার জলে আমি ভিজেছিলাম—তুমি খুব বকেছিলে—আর পরদিন সকাল থেকেই আমার জ্বর—মনে আছে ?

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যচরণ তার তিনদিন পর মারা গেছে। সেই কথাটা শেষ পর্যন্ত বোধহয় তার মনে পড়েনি। কিন্তু আমি যতদিন জ্বরে পড়েছিলাম ততদিন, তারপর জ্বর থেকে উঠে এ পর্যন্ত কেবলই ভাবছি কী সেটা যা সত্যচরণ চেয়েছিল ! সবাই চায়, অথচ তবু তার মনে পড়ল না কেন?

বলতে বলতে আমার স্বামী দুহাতে আমার মুখ তুলে নিয়ে গভীরভাবে আমাকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—তবু সত্যচরণ যখন চেয়েছিল তখন আমার ইচ্ছে করছিল সত্যচরণ যা চাইছে সেটা ওকে দিই। যেমন করে হোক সেটা এনে দিই ওকে। কিন্তু তখন তো বুঝবার উপায় ছিল না ও কী চাইছে। কিন্তু এখন এতদিনে মনে হচ্ছে সেটা আমি জানি—

আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী গো সেটা ?

আমার স্বামী শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষের মধ্যে সব সময়েই একটা ইচ্ছে বরাবর চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। কোথাও কেউ একজন বসে আছেন প্রসন্ন হাসিমুখে, তিনি আমার কিছুই চান না, তবু তাঁকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার কথা। টাকা-পয়সা নয় আমার বোধ বুদ্ধি লজ্জা অপমান জীবন মৃত্যু—সব কিছু। বদলে তিনি কিছুই দেবেন না, কিন্তু দিয়ে আমি তৃপ্তি পাবো। রোজগার করতে করতে, সংসার করতে করতে মানুষ সেই দেওয়ার কথাটা ভুলে যায়। কিন্তু কখনো কখনো সত্যচরণের মতো মরবার সময়ে মানুষ দেখে সে দিতে চায়নি, কিন্তু নিয়তি কেড়ে নিচ্ছে, তখন তার মনে পড়ে —এর চেয়ে স্বেচ্ছায় দেওয়া ভাল ছিল।

শেষবেলায়

নেত্য, নেত্যগোপাল সামন্তর বাড়িটা এদিকে কোথায় জানেন? ও মশায়—

রকে এক বুড়ো বসে। একটা তেলচিটে তুলোর কম্বল থেকে মুখখানা জেগে ওঠে। বড় বেশী থানা খোঁদল মুখে, আর নারকেল ছোবড়ার মতো রুখু দাড়িগোঁফ। শিরা উপশিরা সব ভেসে উঠেছে। মরকুটে বুড়ো। চোখের কোণে মাখনের মতো পিঁচুটি জমছে।

—নেত্য?

—নেত্যগোপাল।

—সামন্ত বাড়ি? কী বললে?

—তাই বলছি। নেত্য সামন্ত। দালাল।

—হবে।

—সে থাকে কোথা?

বুড়োটা ঘোলাটে চোখে একটু চেয়ে থাকতেই কপালের চামড়ার নীচে বান মাছের মতো একটা রগ সরে গেল একটু পিছলে। মরবে। পিত্ত কফ শ্লেষ্মা তিনটেই প্রবল। গলার ঘর্ঘরটা সামলাতে পারছেন না। বুকে বাতাস ডাকছে।

—শেলেশ্‌শা। বুঝলে?

—বুঝেছি।

—অনেক নতুন নতুন লোক বসেছে নিশ্চিন্দায়। নতুন কালের মানুষ সব। সবাইকে কি চিনি?

হরেন চৌধুরী বুঝল, হবে না, বলল—কিন্তু খুব নামডাকের লোক। তিন-চার রকমের দালালী।

—রাখো তোমার দালালী। দালাল নয় কে? কী নাম বললে? নেত্য-গোপাল? নেত্যগোপাল! সামন্ত বাড়ি—

—এই বাড়িটাই দেখিয়ে দিল একজন।

—এই বাড়ি? বলে মাথা নাড়ে বুড়োটা—কিছু ঠাহর পাই না। এই মনে পড়ে। ভুলে যাই। ঝুরঝুস্ হয়ে বসে গেছি বাপ্, কে আর দেখে আমাকে! জ্বরটাও বাড়ল খুব এবার।

হরেন হাসে—আর কোথা খুড়ো মশাই? দিব্যি বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে।

—তোমার তো দিবেই। যার মাথায় হাত তার আর। শরীরে সেই কোন সকালে শীত ঢুকে বসে আছে। তাড়াই কত। যায় না।

—তো নেত্য সামন্তর খোঁজ পাই কী করে? বাড়িতে কে আছে?

—আছে অনেক। জ্ঞাতিগুষ্টি কি কম? তিষ্টোতে পারি না বাপ্, বড্ড জ্বালায় ছেলেগুলো। নিত্যগোপালের ছেলে, আমার নাতি—

হরেন ঝুঁকে সাগ্রহে বলে—কী নাম বললেন? আপনার ছেলে নিত্য-গোপাল?

বুড়ো হতচকিত চোখে চায়—তবে কার ছেলে? ভুল বললুম নাকি?

—তাহলে তো এইটেই নিত্যগোপালের বাড়ি।

—এইটাই।

—চেনেন না বললেন যে?

—চিনি। আমার ছেলে। ভুল হয়ে যায় বাপ্। আমি হচ্ছি গয়েশ সামন্ত। বলে বুড়ো মাড়ি আর মুখের কোকর দেখিয়ে হাসে—এইবার মনে পড়েছে। সব হিসেবে ঠিকঠাক। সামন্ত বাড়ি, নেত্য।

—নেত্যকে আমার দরকার।

—যাও না ভেতরে। এটা কি সকাল বাপ্? ক'টা বাজল?

—বিকেল। চারটে। এ সময়ে থাকার কথা।

—আছে বোধহয়। এখানেই থাকে। গয়েশ সামন্তর ছেলে হল নেত্য-গোপাল, নেত্যগোপাল।

—ছেলেপুলে তো কাউকে দেখছি না। কাকে দিয়ে ডাকাই! অচেনা লোক হুট্ করে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে?

—ছেলেপুলে? নেত্যর? তারা সব গর্ভস্রাব।

গালাগালটা হরেনের শোনা। বাবা দেয়।

—বলল ছেলেগুলো জ্বালায় নাকি?

—কিছু রাখে না। এক পুরিয়া চিনি লুকিয়েছি তোষকের তলায়। লোপাট। কিছু রাখে না। বড় এলাচ খেলে বুক ভাল থাকে, চিত্ত এনে দিয়েছিল এক মুঠো। কড়মড় করে চিবিয়ে খেল। বৌমারা সব যে পেটে এগুলো কী ধরেছিল, ছিঃ ছিঃ।

হরেন্ চৌধুরী দরজায় উঠে 'নেত্যবাবু' বলে ডাকতে লাগে।

—ভেতরে শোনা যায় না। বুড়োটা বলে।

—কেন?

—সব অনেক ভেতরে থাকে। ছেলেগুলো সর্বক্ষণ খাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, কিচ্ছু শোনা যায় না, ঢুকে যাও।

—মেয়েছেলে রয়েছেন, যদি কেউ কিছু মনে করেন! উটকো লোক।

—পর্দানশীন তো নয়। যখন গাল পাড়ে তখন তো ইয়ের কাপড় মাথায় উঠে যায়। মেয়েছেলে? যাও। সর্বক্ষণ লোক আসছে, এ বাড়ি হচ্ছে হাট।

তা হরেন চৌধুরী কিছুক্ষণ দোনোমোনো করে ঢুকেই পড়ে। রক্ পেরিয়ে দরজা। ভিতরে একটা বাঁধানো জায়গা, বারান্দামতো। তারপর মস্ত উঠোন: বাড়িটার কোনো প্ল্যান ছিল না নাকি? যেখান সেখান দিয়ে ঘর বারান্দা সব গজিয়েছে। দেয়ালে প্লাস্টারের বালাই নেই, ইঁট বেরিয়ে আছে। এক পাশে ভারা বাঁধা, রাজমিস্ত্রির কাজ চলছে বোধহয়। কাণ্ডটা প্রকাণ্ডই। উঠোনের চার ধারেই ঘর, ঘরের ওপর ঘর উঠেছে কোথাও। একটাই বাড়ির খানিকটা একতলা, খানিকটা দোতলা, তেতলাও আছে। উঠোনের মাঝখানে কুয়ো, কুয়োর পাশেই আবার টিউবওয়েল। বিস্তর বাচ্চা কাচ্চা, আর কয়েকটা মেয়েছেলে দেখা যায়। কুয়োপাড়ে বাসনের ডাঁই মাজতে বসেছে কুঁজো চেহারার কালো এক ছেলেমেয়ে। মাজতে মাজতে বক বক করছে। তার কাঁকালের ফাঁক দিয়ে বাঁদরের বাচ্চার মতো একটা বছর দেড়েকের মেয়ে ঝুলে আছে, তার মাথাটা বুকের মধ্যে সেঁদানো। মেয়েমানুষেরা পারেও! ভেবে একটু শিউরেও ওঠে হরেন।

হেঁকেই জিজ্ঞেস করে—নেত্যগোপালবাবুর বাড়ী তো এটা?

কেউ তাকালও না। উঠোন জুড়ে চিল চেঁচানি। খাপড়া ছুঁড়ে গুটি সাতেক ছেলেমেয়ে গঙ্গাযমুনা খেলছে। তাদের মধ্যে একজন এক ঠ্যাঙে লাফিয়ে তিন ঘর পেরিয়ে গেল, সবাই চেঁচাচ্ছে তাই।

এই হচ্ছে জয়েণ্ট ফ্যামিলির ছবি। হরেনের চোখ দুটো কর কর করে উঠল। দুঃখে। এক সময়ে সে এরকম একটা পরিবারে মানুষ হয়েছিল। সে সব ইতিহাস। আজ সামন্তমশাইয়ের কাছে এসেছে ছোট্ট একটা প্লট বা বাড়ির সন্ধানে। লোকটার হাতে বিস্তর জমির খোঁজ। কলকাতায় আর জমি নেই। যাও বা ছিল ঢাকুরে, যাদবপুর, বেহালা বা গড়িয়ায়—তাও টপটাপ ফুরিয়ে এল বলে। এরপর কলকাতার জমি বিক্রি হবে ঝুড়িতে। মানুষ তাই কিনে

ঘরে সাজিয়ে রাখবে। দেখবার মতো জিনিস হবে একটা। তা সেই দুর্লভ জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হরেন এক মুঠো চায়। ছোট্ট প্লট হলেই তার চলে যাবে। সংসার বড়ো নয়। বৌ আর দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে। কাঠা খানেক কি দেড়েক হলেই তিনতলা তুলবে। সুবিধেমতো জায়গায় হলে একতলাটা হবে দোকানঘর, দোতলায় ভাড়াটে, তিনতলায় তাদের ছোট সংসার।

ছোটো পরিবারই সুখী পরিবার বলে বটে, কিন্তু হরেনের মনে সন্দটা যায়নি। সামন্তমশাইয়ের বাড়ির দৃশ্যটা দেখে কি জানি কেন হরেনের বুকটায় মেঘ জমে ওঠে। এইরকম একটা হাটখোলায় সে মানুষ হয়েছিল। সুখে নয়, আবার তেমন সুখ আর পাবেও না।

দীর্ঘশ্বাস চেপে সে দু কদম এগোলো। বারান্দার নীচে নর্দমা, তাতে একটা লাল বল পড়ে আছে। উঠোনে ফাটা বেলুনের রবার ন্যাতার মতো, একটা ছাগল ঘাস থেকে মুখ তুলে হরেনের চোখে চোখ রাখে। কোন বিধবার রোদে-দেওয়া কাপড় অশুচি করেছে হতচ্ছাড়া কাক, বুড়ি দোতলার রেলিং ধরে ঝুঁকে চেঁচাচ্ছে—বলি নেস্তি, কাকে ছোঁয়া কাপড় মা, ঝাঁড়ি বলে তো আর মানুষের বাইরে যাইনি, তখন থেকে বলছি, ধো না হয় গঙ্গাজলের ছিটে দে···

হরেন নির্বাক দাড়িয়ে থাকে।

বোঝা যায় যে, এ বাড়িতে লোকের যাতায়াত বিস্তর। সে যে ঢুকে এসে দাঁড়িয়ে আছে কেউ গ্রাহ্যই করে না। যেন বা বাড়ির লোক। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বাড়ির লোক আর বাইরের লোক চেনা ভারী মুস্কিল। কেউ অচেনা এসে দাঁড়ালে ছোটবৌ ভাবে বড় বৌর কাছে এসেছে, বাপ ভাবে ছেলের কাছে এসেছে, ভাই ভাবে দাদার কাছে এসেছে। কেউ গা করে না।

গলা খাঁকারী দিয়ে দিয়ে গলায় ব্যথা। বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা বৃথা। তারা আরো ব্যস্ত।

মিনিট দশেক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একটা চলতি বাচ্চাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে হদিস পাওয়া গেল। নেত্য থাকে দোতলার ঘরে। 'ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান, ঘর খোলা আছে, কাকামশাই এ সময়ে অঙ্ক কষেন।' বলে বাচ্চাটা উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি চটা ওঠা। হয় সিমেন্ট পায়ে পায়ে উঠে গেছে, নয়তো লাগানোই হয়নি। গোয়াল সকলের, ধোঁয়া দেবে কে।

দোতলার ঘরে নেত্য সামন্তর অফিস কাম বেডরুম। ঘরটায় তক্তপোষ আছে, টেবিল চেয়ারও। কিন্তু দলিল দস্তাবেজ, মুসাবিদা আর মামলার কাগজে ছয়লাপ। টেবিল চেয়ারে ডাঁই, বিছানাও অর্ধেক দখল নিয়েছে কাগজেরা। থলথলে চেহারায় কালো মতো নেত্যগোপাল মেঝেয় বসে চৌকির ওপর গ্রীবা তুলে জিরাফের ভঙ্গীতে—হ্যাঁ—অঙ্কই কষছে বটে। আসলে ফর্দ। কিসের ফর্দ তা অবশ্য দেখার চেষ্টা করে না হরেন।

—কী চাই আজ্ঞে?

—নেত্যগোপাল সামন্তমশাই কি আপনি?

—আজ্ঞে।

—এসেছিলাম একটু বিষয় ব্যাপারে—

নিত্য বা নেত্যগোপাল ঘাবড়ায় না। নিত্যকর্ম। ফর্দটা মুড়ে রেখে বলে—আসুন।

—বসুন। বলে নেত্যগোপাল বিড়ি ধরায়। তারপর বলে—বলুন।

—একটু বাস্তুজমি।

—জমি?

—আজ্ঞে। হুবহু নেত্যগোপালের অনুকরণ করে হরেন বলে।

—খরচাপাতি কিরকম? এলাকা? তৈরী বা পুরোনো বাড়ি চলবে না?

—চলবে, তবে তিনতলার ভিত হওয়া চাই।

নেত্যগোপাল হাসল। হাতের বিড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একটু। তারপর বলল—যারা বাড়ি করে তারা তিন বা চারতলার ভিতই গাঁথে, সে একতলা বাড়ি করলেও। শেষ পর্যন্ত আর তিন চারতলা হয়ে ওঠে না। বেশির ভাগই টাকার অভাবে ষ-তলার ভিত তার আদ্দেক উঠে ফুরিয়ে যায়। মাটির তলায় বৃথা টাকা খরচ।

হরেন চুপ করে রইল। তিনতলাটা তার চাই-ই।

—আমাদের বাড়িরই সেই দশা। মাটির নীচে হাজার পনেরো বিশ টাকা ওপরে তে ঠেঙে ভূতে-পাওয়া বাড়ি। বলে হাসল নেত্যগোপাল।

হরেনও হাসল। কারণ নেই। তারপর হঠাৎ, দালালের সামনে বেশী হাসা উচিত নয় ভেবে গম্ভীর হয়ে বলল—তবে বাড়ির চেয়ে জমিই ভাল। পছন্দমতো করা যাবে।

—কী রকম করতে চান?

—একতলায় দুটো দোকানের প্রভিশন থাকবে, আর গ্যারেজ। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট, তিনতলাটা আমার। ওটা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল বিড়িটা মন দিয়ে দেখে। চোখ ছোটো, কপালে লম্বা কোঁচকানো দাগ।

—শুনছেন? হরেন সন্দেহবশত জিজ্ঞেস করে।

—শুনেছি। বলে নেত্যগোপাল।

—তিনতলাটায় চতুর্দিকে বারান্দা টারান্দা হবে, সিঁড়ির কোঠার পাশে চারতলায় হবে ঠাকুরঘর।

নেত্যগোপাল শ্বাস ছাড়ল।

কথাবার্তায় আরো সময় গেল খানিক। আগামপত্তর করতে হল কিছু। পেয়ে যাবে হরেন। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলতে পারবে। নেত্যগোপালের দু হাতের দশটা আঙুলের নখে নখে কলকাতার মাটি লেগে আছে। কলকাতার জমি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই এক খামচা তুলে নিতে পারবে বলে ভরসা হয় হরেনের। একতলায় দুটো দোকানঘরের একটাতে বসাবে পরেট বড় ছেলেটাকে। গ্যারেজটা অবিশ্যি খালিই পড়ে থাকবে এখন, যদি ভগবান কখনো সুদিন দেন···। গরু পুষবার বড় শখ ছিল তার। হবে না। গরু, শজ্জীক্ষেত, হাঁসমুর্গী এ সবের জন্য মফঃস্বলের দিকে কাঁদালো জায়গাই পছন্দ ছিল তার, কিন্তু গিন্নির শখ কলকাতায় থাকবে। থাকো তাই। হরেনের গরু তাই বাদ গেল। একটা শ্বাস পড়ে যায়। বাপ-দাদার সঙ্গে চিরকালের মতো ছাড়ান কাটান হয়ে যাচ্ছে। যাক। এজমালী সংসারের লোভা মুখখানার হাঁ আর বন্ধই হয় না। বাবা গত এগারো বছর বসে আছে, দাদা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে বুড়ো হয়ে গেল। পরের ভাই মোটরমিস্ত্রি, তার ওপর লাভ-ম্যারেজের দজ্জাল বৌ। থাকা যায় না একসঙ্গে। পয়সাকড়িতে, রোজগারে, ওর মধ্যে হরেনেরই যা হোক একটু চিকিমিকি। বৌ তাই রোজই সাবধান করে—এই বেলা ভিন্ন হও, নইলে সব তোমার ঘাড়েই হামলে থাকবে

বুড়োটা নীচের বারান্দায় খেতে বসেছে। বাটিতে চিঁড়ের জাউ কিংবা সাগু—কিছু একটা হবে। সপ্‌সপে জিনিসটা হাতের কোষে তুলে ভয়ঙ্কর মুখখানা হাঁ করে সড়াৎ টেনে নিচ্ছে। এই বয়সে খাওয়া বাড়ে। বাড়লেই বুঝতে হয়, দিন শেষ হয়ে আসছে। হরেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

প্রশ্নটা এসে পড়ে মুখে, সামলাতে পারে না হরেন। জিজ্ঞেস করে—তা সামন্তমশাই তো ইচ্ছে করলেই নিজের মতো একখানা বাড়ি করে ভিন্ন থাকতে পারেন। এই ক্যাঁচকেঁচির মধ্যে থাকা—

নেত্য বা নিত্যগোপাল হাত রসিদটায় চোষ কাগজ চেপে বলে—ভাবি মাঝে মাঝে বুঝলেন! সাত ভাইয়ের সংসার, ছেলেপুলে মিলে একটা পুরো পল্টন। পয়লা তিন ভাইয়ের বিয়ে দেখেশুনে হয়েছিল, পরের চারজন কোথা থেকে একে একে সব বৌ নিয়ে এসে পটাপট ঢুকিয়ে দিল বাড়িটায়। গুষ্টি বাড়ছে। ভাবি বুঝলেন!

—আপনি ইচ্ছে করলেই তো হয়।

—হয়। এক সদ্যবিধবার জমি পেয়েছিলাম সুবিধামতো। বায়না-টায়নাও হয়ে গেল। ঝপ করে দর পেয়ে ছেড়ে দিলাম। দালালী করার ঐ অসুবিধে। দামটা সব সময়ে মাথায় বিঁধে থাকে নিজের জন্য আর আমি ভাবতেই পারি না। কয়েকবার চেষ্টাও করে দেখেছি। ভাবি, চলে যাচ্ছে যখন যাক। তবে ভাবি মাঝে মাঝে, বুঝলেন! ভাবনাটা আছেই। বলে খুব হাসে নেত্য বা নিত্যগোপাল।

—আজকাল আর জয়েণ্ট ফ্যামিলি চলে না—

—সে তো বটেই। একা থাকার যুগ পড়ে গেল। ছোট্ট সংসার সুপ্‌সাপ্‌ ঘরদোর, ছোটো হাড়ি, ছোটো পাতিল। এসবই চল হয়েছে। ইচ্ছেও করে খুব।

বুড়োটা হড়হড়ে পদার্থটা তল করে গোটা দুই রুটি গুড় আর জল দিয়ে মাখছে। দাঁত নেই, তবু জলে গুলে খাবে। খাওয়াটা এই বয়সেই বাড়ে। হরেনের বাবারও বেড়েছে। দিনরাত খাওয়ার গল্প। হরেনের বৌ করে খুব বুড়োর জন্য। আলাদা হয়ে উঠে গেলে কষ্ট হবে উভয়তঃই। বাবাকে কি নিজের কাছে নিয়ে যাবে হরেন? ভেবে আপন মনেই মাথা নাড়ে। নেওয়াটা ঠিক হবে না। কেন ঠিক হবে না তা অবশ্য ভেবে পায় না সে। নিজস্ব ঘরবাড়ি, তার মায়া বড় সাংঘাতিক। বুড়ো মানুষ ঘরে হাগবে মুতবে।

তাছাড়া, হরেনের বৌ-ই একটা জীবন করে গেল হরেনের বাপের জন্ম। এবার অন্ত ভাইয়ের বৌরাও করুক। এসব ভেবেই হরেন আপন মনে মাথা নাড়ে।

নেত্য বা নিত্যগোপাল রসিদখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—কথা তখনই পাকা হয় যখন জায়গাটা হয়ে গেল। ভাববেন না চৌধুরীমশাই, টাকা যখন আগাম বায়না নিয়েছি ভাবনা এবার আমার।

হরেন ওঠে। উঠতে উঠতেই বলে—পরের ভাবনা তো ভাবলেনই। আমি ভাবছি আপনার কথা। কত জমি আপনার তাঁবে। লাখোপতি থেকে আমার মতো গরিবগুন ধর্ণা দেয়। সকলেরই জোতজমি করে দেন আপনি। অথচ নিজের বেলায়—

নেত্য বা নিত্যগোপাল ভ্রূ কোঁচকায়। সমায়িক মুখে বলে—আমিও ভাবি। শেষে ভেবেই কেটে যাক জীবনটা। আলাদা বাড়ি, আলাদা সংসার তার স্বাদই আলাদা। বৌও বলে, খুব বলে। জলে জলে হাত পা হেজে মজে যায়, ভায়েদের ছেলেপুলে টেনে কাঁখে ব্যথা, প্রলয় উনুনের ওপর বিশাল কুম্ভীপাকে রান্না করে করে মাথাধরার ব্যামো, অম্বল। সবই বুঝি মশাই। কিন্তু মাথার মধ্যে এমন এক দাঁও মারার মতলব বাসা বেঁধেছে যে কী বলব।

আরো দু চারটে কথা বলে হরেন চৌধুরী বেরোয়।

রকে এসে আবার মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে বুড়ো। হাতে বিড়ি। তাকে দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—কটা বাজে বাপ্?

হরেন হাসে। ঘড়ি ঘড়ি টাইম জানা চাই, যেন কত অফিস বা সিনেমার বেলা বয়ে যাচ্ছে! ঠাট্টা করে বলে—টাইম জেনে কি হবে খুড়োমশাই? ইষ্টচিন্তা করুন।

—সময় কি ফুরিয়েছে বাপ্?

হরেন হাসিটা গিলে বলে—বেলা তো ফুরিয়েই এল খুড়োমশাই!

—বেলা ফুরিয়েছে? বলে খুড়ো একটু থমকে চেয়ে থাকে। মুখখানা তুবড়ে অদ্ভুত দেখতে হয়। ঠোঁট দুটো ফোকলা দাঁতের মধ্যে কচ্ছপের মুখের মতো ঢুকে বেরিয়ে আসে। বুড়ো বলে—এটা কি বিকেল?

—তাই বটে।

—তবে যে মেজ বৌমা বড় চিঁড়ের জাউ খাওয়ালে ? অ্যাঁ ! জাউ তো আমি সকালে খাই। বৈকেলে আজ হালুয়া খাবো বলেছিলাম যে ? অ্যাঁ !

হরেনের একটু কষ্ট হয় বুকের মাঝখানটায়। বলে—খাবেন, তাই কি ? খাওয়া কি একদিনের ?

—চিত্ত সুজি এনে রেখেছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে তাহলে ঐ গর্ভস্রাবগুলোকে খাইয়েছে ! বাপ্, ঝুব্বুস হয়ে বসে আছি, এখন কে আর দেখে আমাকে ! চিড়ের জাউ আমার বেহান বেলায় খাওয়ার কথা—নেত্যর বৌ কিছু খেয়াল রাখে না বাপ্। সাত সাতটা বৌ ইয়ের কাপড় মাথায় তুলে দিনরাত্তির ছেলেগুলোকে গেলাচ্ছে। বিড়িটা ধরিয়ে দাও তো বাপ্, হাত বড্ড কাঁপে—

হরেন চৌধুরী গয়েসের বিড়িটা ধরিয়ে দেয় যত্ন করে। একটু হেসে বলে—হিসেব সব মেলে খুড়োমশাই ?

—হিসেব ! কোন্ হিসেবের কথা বলছ ?

—এই যে আপনি গয়েশ সামন্ত, আপনার সাতটা ছেলে, সাত বৌ, কত নাতিনাতনি, তারপর এটা বেহান বেলা না সাঁঝবেলা—এসব হিসেব ?

বুড়ো বিড়িটা টেনে কাশতে কাশতে গয়ের তোলে গলায়। হাঁপীর টান। বিড়ি খাওয়া বারণ নিশ্চয়ই, লুকিয়ে চুরিয়ে খায়। খাওয়াটা আসল।

—মেলে না বাপ্, ভুল পড়ে যায়। এই একটু আগে একজন কার খোঁজ করছিল।

—আমিই।

—হবে। বলে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে। হরেন কান পেতে শোনে। বুড়ো হিসেব মেলাচ্ছে—আমি হলুম গে গয়েশ সামন্ত···সামন্ত বাড়ি··· বড় ছেলে চিত্ত, মেজো নিত্য, আরো কতকগুলো···

হরেন ঘড়িটা দেখে নিয়ে হাঁটা দেয়। রেল লাইন বরাবর হেঁটে প্লাটফর্মে ওঠে। পাঁচটা পাঁচে ট্রেন। সিগন্যাল দেয়নি এখনো। প্লাটফর্মে কালো কালো কিছু মেয়ে পুরুষ আর বাচ্চা সংসার পেতে আছে। পোটলা পুটলি, ইঁটের উনুন, কৌটোর মগ ছত্রাকার। উকুন বাচছে, ছেলে ঠেঙাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। বিশ ত্রিশখানা রুটি রোদে শুকোতে দিয়ে একটা মেয়ে বসে কাক তাড়াচ্ছে। কেন যে রুটি শুকোয় এরা কে জানে ! একটা বাচ্চা হামা দিয়ে এসে হরেনের জুতো ধরে ফেলেছে। হরেন ঠ্যাং টেনে নেয়। সংসারটার দিকে একটু

চেয়ে থাকে। ভারী নিশ্চিন্ত হাবভাব, দুনিয়াজোড়া জমি ওদের। যেখানে সেখানে বসে যায়।

শীতের বেলা। রোদ মরে গিয়ে এ সময়টা বাতাসটা ভারী হয়ে ওঠে। মাটির ভাপ না ধোঁয়া মেঘের মতো গড়ায় মাটির ওপর। ওর ভারী বাতাস। দুঃখের শ্বাসের মতো জমে আছে পৃথিবীর ওপর।

সামন্তমশাই পাকা লোক। জমি একটা পেয়েই যাবে সুবিধে মতো। বর্ষার আগেই ভিত গেঁথে ফেলবে। ভারী একটা আনন্দ হয় হরেনের।

আবার কি জানি কেন রোদমরা বিকেলটার দিকে চেয়ে বুকটা হঠাৎ ধাঁৎ করে ওঠে। কি একটা যেন মনে হয়, একটু ভয়-ভয় করে। বুকটায় বগডা পাখির মতো কি একটা গুড়গুড় করে ডাকে। পেটটা পাকিয়ে ওঠে।

ভিখিরিদের সংসার, প্লাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দূরের সিগন্যাল—এ সবের ওপর দিয়ে আকাশ আর জমির মাঝ-বরাবর একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারি ঘনিয়ে আসছে। ট্রেন রেল-পুল পেরিয়ে আসছে। হরেন চৌধুরী গাড়ির শব্দটা ঠিক শুনতে পায় না। সেই আলো-আঁধারিটার দিকে অন্য মনে চেয়ে থাকে।

পুরনো দেয়াল

হাড় জিরজিরে রোগা ছেলের মতো ইট বের করা দেয়ালের গলি। ত্বু পাশেই শুধু দেয়াল, জানালা নেই, দরজাও না। গলিটা খুব নির্জন। জগদীশ নিঃশ্বাস টানলে গন্ধটা পায়। অত্যন্ত মৃদু মাটির গন্ধের সঙ্গে ভিজে শ্যাওলার গন্ধ। গন্ধটা মিষ্টি। শরীর অবশ করে দেওয়া নেয়ার মতো আমেজ যেন গন্ধটার সঙ্গে মিশে থাকে। যেন এইখানে দাঁড়ালে অনেক পুরনো কথাকে মনে পড়ে।

রোজ না, কিন্তু কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলা এই গলিটা দিয়ে হেঁটে আসতে জগদীশের গাটা ছমছম করে। ভয় নয়, কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতি। একটা টিমটিমে আলো গলিটার কোণে দাঁড়িয়ে জ্বলে। মাটির উপর নিজের পায়ের শব্দটা অনেক বড় হয়ে তার কানে লাগে। গলিটাকে মনে হয়, একটা প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক গুহার মতো। নিজেকে মনে হয় কোন্ এক প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো, যে অনেক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে পরিশ্রান্ত হা-ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ একটা অনাবিষ্কৃত আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। এই সেই গুহা যেন। চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু যেন অনুভব করা যায়, দেয়ালে বিচিত্র সব ছবি খোদাই করা। একটা পবিত্র শুদ্ধ হাওয়া গুহাটার ভিতর খুব মৃদু হয়ে বইছে। আর কেবলই মনে হয়, যারা এই গুহাকে পিছনে ফেলে চলে গেছে, তারা আর ফিরে আসবে না। কেন তারা ফিরে আসবে না? জগদীশ ভাবে। তারপর মনে হয়, বোধহয় প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলে আর ফিরে আসতে নেই।

জগদীশের ইচ্ছে হয়, এইখানে হাঁটু গেড়ে বসে, যারা চলে গেছে তাদের মঙ্গলের জন্য সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। সত্যিই সে প্রার্থনা করতে বসে না, কিন্তু কথাটা মনে হলেই কেন যে সে নিজেই জানে না, তার কান্না পায়। তার ষোল বছরের অপরিণত ছিপছিপে দেহটা সেই কান্নার আবেগে কাঁপতে থাকে, কুঁকড়ে যেতে চায়, আর তারপর গলার কাছে একটা দলা পাকানো দুঃখকে অনুভব করতে করতে সে দৌড়তে আরম্ভ করে। গলির শেষে বাঁ দিকে মিত্তিরদের পোড়ো বাড়িটার উঠোনটা ডিঙিয়ে বাবুপাড়ায় ঢুকে পড়ার পর সে স্বস্তি পায়।

গোপালদার মনোহারী দোকানে একটা মস্তবড় হ্যাজাক জ্বলে। রাস্তাটা সেখানেই দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। আলোটা রাস্তাটার অনেকখানি পর্যন্ত উজ্জ্বল করে রাখে। এই আলোটা দেখলে বেশ ভালো লাগে, মোড়ের মাথায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গল্প করে। গোপালদার দোকান থেকে মৃদু ধূপের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর তখন শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি অনুভব করতে করতে জগদীশের বাড়ির কথা মনে হয়।

বিকেল বেলায় বাড়ি ফিরে আসাটা বিশ্রী। বিকেল বেলাতে যেন মাকে ভীষণ গম্ভীর আর রাগী বলে মনে হয়। যেন একটু ছুঁতে গেলেই মা ভীষণ ভাবে ধমকে দেবে। বোধহয় এ-সময়টাতে মা সাজগোজ করে থাকে বলেই ওরকম মনে হয়। ভাবতে ভাবতে জগদীশ বাড়ি ঢুকল।

খিদে পেয়েছে। ভয়ঙ্কর। কলতলার দিকে যেতে যেতে জগদীশ চেঁচিয়ে বলল, খেতে দাও মা, খিদে পেয়েছে। মা কোথায় আছে না জেনে, না ভেবেই সে চেঁচাল। বিকেল বেলা মাকে সাজগোজ করতে দেখলে ভালো লাগে না। সাজগোজ করলেই মায়েরা যেন গম্ভীর হয়ে যায়! কলতলার আবছা অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার মনে হল, সে মাকে খুব ভালবাসে। খুব। হঠাৎ কেন যে কথাটা মনে হল তা সে বুঝতে পারল না। এমনি হঠাৎ হঠাৎ কতকগুলো অদ্ভুত কথা মনে হয় যে, তার হাসি পায়। মগটা জলে ডুবিয়ে তারপর তুলে তারপর আবার ডুবিয়ে জলের গুব্‌গুব্ শব্দটা শুনল সে।

সাবানটা কোথায়। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। সাবানটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতে সে ভাবলো কত অদ্ভুত ইচ্ছেই যে মনে আসে।

এই ঘর জগদীশের। ঘরটা ছোট। একটা করে খাট, চেয়ার, টেবিল।

পা দুটোকে নিয়ে অস্বস্তি। টেবিলের তলা দিয়ে পা দুটো ভালো করে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না—ওপাশের দেয়ালে গিয়ে ঠেকে যায়। শরীরটাকে কিছুতেই একভাবে রাখা যায় না। শরীরটাকে মোচড়াতে ইচ্ছে করে, ভাঁজে ভাঁজে ভাঙতে ইচ্ছে করে, আর একটা অস্থিরতা যেন ক্রমাগত বুকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। পড়ার বই খোলা থাকে, কিন্তু পড়তে ইচ্ছে করে না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ঘরটাকে শূন্য নিরর্থক মনে হয়। একটা কিছু যেন ঘটা উচিত, অথচ যা কিছুতেই ঘটছে না। একটা কিছু করা দরকার, কিছু

একটা করতে হবে ভাবতে ভাবতেই ঘুম এসে যায়। আর তারপর ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে চেয়ার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যেতে যেতে সারাদিনের ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে এক সময়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। অদ্ভুত সমস্ত স্বপ্ন।

কে যেন তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারল না কে তাকে ডেকেছে। আবছা আবছা গলার স্বরটা কানে ঢুকছিল, নিজের নামটা শুধু বুঝতে পারছিল। রাত বেশ হয়েছে, খেতে যেতে হবে। ঘুম থেকে উঠে উঠোন ডিঙিয়ে রান্নাঘরে খেতে যেতে একদম ইচ্ছে করে না। বরং রাগ হয়। বাড়ির সকলের ওপর রাগ করতে ইচ্ছে হয়। কি দরকার ছিল ডাকবার, এক রাত না খেয়েও বেশ থাকা যেত।

বাঁ পাশে বাবা, ডান পাশে মিণ্টু, বেবী, সামনে জলচৌকির ওপর মা বসে। একটা হ্যারিকেন মেঝেতে রাখা। কালি পড়ে হ্যারিকেনটা আবছা হয়ে এসেছে বলে কিংবা সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে বলে কারুর মুখ ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না জগদীশ। রান্নাঘরের দেয়ালে তাদের মস্ত মস্ত ছায়াগুলো দুলছে, কাঁপছে। জগদীশের মনে হল যেন তারা সবাই—বাবা, সে, পিণ্টু, বেবী সবাই মাকে ঘিরে বসেছে একটা গল্প শুনবে বলে। তারা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মা গল্পটা বলতে বলতে হঠাৎ থেমেছে—আবার এক্ষুণি শুরু করবে।

জিভে কোন স্বাদ পাচ্ছে না সে। পাতে ক'টা তরকারি, তাও যেন গুণতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্রী লাগছে।

—আর দুটি ভাত দেবো তোকে? মা বলল।

—না, খিদে নেই।

—বাইরে থেকে কি সমস্ত ছাই পাঁশ খেয়ে আসিস, রাতে তাই খেতে পারিস না।

পিঁড়িটা ঠিকমতো মেঝেতে বসেনি। ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাত তুলতে গেলে শব্দ হচ্ছে ঠক্, পেছন দিকে হেলে মুখের গ্রাসটাকে গিলতে গেলে শব্দ হচ্ছে ঠক্। ইচ্ছে করেই বারকয়েক সামনে পেছনে দোল খেল জগদীশ। শব্দ হল ঠক্ ঠক্, ঠুক-ঠাক ঠুক·········

—শান্ত হয়ে বসে খেতে পারো না? বাবার গলাটা ভারী আর গম্ভীর। পোড়া কেরোসিনের গন্ধটা বিশ্রী লাগল জগদীশের। সে খাওয়া বন্ধ করল।

পিণ্টু বেবীকে কি যেন ফিস ফিস করে বলল। বেবী শব্দ করে হাসল। ওরা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে কি করে—জগদীশ ভাবল।

ভাত খেয়ে উঠবার পর ঘুমটা যেন কোথায় পালিয়ে যায়। আর যেন ঘুম আসবে না। অথচ শুতে হবে, রাত জাগা চলবে না। নরম বিছানা, সাদা চাদর। জগদীশ হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে সলতেটাকে কমিয়ে দেয়। ঘরটা প্রায় অন্ধকার।

এই ঘরে যেন একটা উৎসবের গন্ধ লেগে আছে। যেন অনেকদিন আগে এইখানে এক বিত্তশালী সুখী পরিবার থেকে গেছে। বাইরে অন্ধকার জমাট। এপাশে ওপাশে বাড়িগুলো নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আর ঠিক এই সময়ে হাল্কা তন্দ্রার মধ্যে অস্পষ্টভাবে জগদীশের মনে হয়, এইখানে সে অনেকদিন আগে একবার এসেছিল। বাড়িটা বেশ বড়ো। প্রত্যেক ঘরের ছাদে আর দেয়ালে পুরনো আমলের অদ্ভুত সব নকশা কাটা। আগের দিনের বড়লোকদের বাড়ির মতোই। এখন এত বড় বাড়িটায় তারা কয়েকজন মাত্র মানুষ—পুরো বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু অনেক বছর আগে এখানে একটা মস্ত পরিবার থাকত। অনেক টাকা ছিল তাদের আর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলো হাসি-খুশী মোটাসোটা ছিল! মেয়েগুলো ছিল খুব সুন্দরী। খুব ফরশা, গোলগাল, লম্বাটে ডিমের মতো মুখ, একটু পুরু লাল ঠোঁট, অসাবধানে এসে পড়া একটু লালচে আভার চুলগুলো তাদের সাদা কপালের ওপর খেলা করত। ··ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময়ে থামে জগদীশ। ঠিক এরকম মেয়ে যেন সে কোথায় দেখেছে। কোথায় দেখেছে যেন। হাঁ, মনে পড়েছে। রাখী আর পাখী। রথতলার মেলার মাঠটা ছাড়িয়ে যেতে সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড জমিদার বাড়িটাকে তারা বহুবার সবিস্ময়ে দেখেছে। রাখী আর পাখী ও বাড়ির মেয়ে। ওরা বড়লোক, গাড়ি করে স্কুলে আসে। বেবী স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বহুবার রাখী আর পাখীর গল্প তাদের সবাইকে শুনিয়েছে। ওরা আজে বাজে মেয়ের সঙ্গে মেশে না, রোজ টিফিনে বাড়ি থেকে চাকর ওদের খাবার নিয়ে আসে, প্রত্যেকবার ছুটিতে ওরা বাইরে বেড়াতে যায় রিজার্ভ করা গাড়িতে। এমনি আরো কতো কি। বেবীটা বাড়িয়ে বলে, সত্যিই কি আর ওদের অত দেমাক! জগদীশ তো দেখেছে ওদের।

রোদটা সোজা হয়ে নেমেছে। ভেতরকার ছায়া ছায়া অন্ধকার আর নেই—গলিটাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঁচু হয়ে থাকা ইটগুলোর খাঁজে খাঁজে

ছায়া আলো দিয়ে তৈরী অদ্ভুত নকশা। বাইরে এখন গরম ধুলো ওড়া বাতাসের ঝাপটা, কিন্তু এই গলিটার ভেতরটা ঠাণ্ডা। দেয়াল দুটো দুধারে অনেক উঁচু। বাতাস ঢুকতে পারে না এই গলিটায়, তাই বোধহয় ঠাণ্ডা। পায়ের নীচে মাটিটা স্যাঁতসেঁতে। এখন এই গলিটাকে ঠিক গির্জার মতো দেখাচ্ছে। গির্জার মতো পবিত্র, শান্ত ঠাণ্ডা। গির্জার মতো মস্ত বড় আর উজ্জ্বল। ধারে কাছে কেউ নেই। কেউ আসে না। জগদীশ মাটির ওপর বসল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। একটা ইঁদুর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কোথা থেকে যেন ছুটে এলো। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াল তারপর চকচকে সরু লেজটাকে বর্শার ফলার মতো পেছন দিকে উঁচিয়ে রেখে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। ইঁদুরটা বেশ আছে জগদীশ ভাবল।

এখন ভর-দুপুর। ওপর দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশটা জ্বলছে। দুপুরটা ঝিম্ ঝিম করছে চারধারে। জগদীশ ভাবল তার ঘুম পাচ্ছে, নেশার মতো ঘুম। আচ্ছন্ন বা। সে যেন একা, ভীষণ একা। দেয়ালে অনেকগুলো শুঁয়োপোকা জড়াজড়ি করে আছে। জগদীশ তাকিয়ে রইল। বহু পুরনো একটা ছবিকে তার মনে পড়ছে। যখন আরো ছোট ছিল সে তখন এই ছবিটাকে সে বোধহয় মনে মনে তৈরী করে নিয়েছিল। ঠিক ছবি নয়—খানিকটা কল্পনা আর খানিকটা স্বপ্নের মিশেল। তার চারদিকের এখনকার চেহারাটা সেই পুরনো ছবিটাকে তার মনে জাগিয়ে তুলছে। একটা অস্পষ্ট, গম্ভীর অথচ স্থির ছবি। একটি মেয়ে, তার লাল চুল, নীল চোখ, বাদামী ঠোঁট। আর একটা গীর্জার অভ্যন্তর, লম্বা জানালা গোল খিলান, কাঁচের শার্শি, মোমবাতি। সে যেন হাঁটু গেড়ে মোমবাতি জ্বলা বদীটার সামনে বসে আছে। মেয়েটি তার কানে কানে খুব কাছ থেকে প্রার্থনার মন্ত্র বলে দিচ্ছে। সে তার গায়ের মিষ্টি কোমল গন্ধ পাচ্ছে। ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছে। মেয়েটা গানের সুরের মতো কথা বলছে। কিন্তু কথাগুলো সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। মেয়েটি আরো কাছে আসুক। আরো। কি বলছে ও? আর কেনই বা বলছে! কাঁচের শার্শিটার বাইরে শেষ বেলায় সূর্য ডুবে যাওয়া ম্লান ছাই ছাই আলো। জগদীশ চাইছে মেয়েটা আরো কাছে আসুক। সে তাকে স্পর্শ করুক।

কী বিষণ্ণ এই ছবি। জগদীশ ভাবল। ছবিটাকে তার ভালো লাগে না। কিন্তু ছবিটা আছে। থাকবে। কতদিন থাকবে কে জানে। হয়ত আজীবন। জগদীশ জানে না। সন্ধ্যাবেলা বাতি না জ্বালিয়ে

পড়ার ঘরে একা একা বসে থাকলে এই ছবিটাকে মনে পড়ে। মনটা বিষণ্ণ উদাস হয়ে যায়। ছবিটা কখনোই সত্যি হয়ে আসবে না জগদীশ সেটা বুঝতে পেরেছে বড় হয়ে।

এই গলিটা অনেক পুরনো কথাকে মনে পড়িয়ে দেয়। বোধহয় ভিজে মাটি আর শ্যাওলার ভারী গন্ধ আর পলেস্তারা খসে যাওয়া পুরনো দেয়ালগুলোর জন্যেই ওরকম হয়। এখানে এসে বসলেই মনে হয় যেন এখানে সে আর নেই, সে যেন অনেক পুরনো দিনগুলোয় ফিরে গেছে। এই দেয়ালগুলোর যদি প্রাণ থাকত কিংবা প্রাণ আছে একথা যদি জগদীশ বিশ্বাস করতে পারতো তবে বেশ হত। ছেলেবেলায় যে যখন প্রথম পড়েছিল যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে তখন কথাটা তার ভালো লেগেছিল। ঠাকুমাকে বলতেই ঠাকুমা বলেছিলেন শুধু উদ্ভিদ কেন পাথর পাহাড় নুড়ি, এ সব কিছুরই প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ আছে, ভালোমন্দের অনুভূতি আছে। ঠাকুমার কথাটা তার বিশ্বাস হয়েছিল। অনেক বাধা পেয়ে, ঘা খেয়েও সেই বিশ্বাসটা মনের কোণে তলিয়ে তিথিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে কেমন করে সে নিজেই জানে না সেই বিশ্বাসটা হারিয়ে গেল। ঠাকুমারা মরে গেলেই কিংবা হয়ত বয়স বাড়লেই এই অদ্ভুত বিশ্বাসগুলো ভেঙে যায়। কিন্তু এই বিশ্বাসগুলো যখন ভেঙে যায় তখন ভালো লাগে না, মন-খারাপ লাগে। যেন অনেক দিনের পুরনো বন্ধুরা আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে এরকম মনে হয়। মন তখন যেন চায় এই বিশ্বাসগুলো আবার চুপি চুপি ফিরে আসুক। সে বিশ্বাস করতে পারুক যে এই দেয়ালগুলো, এই মাটি, ওই মিত্তিরদের ভাঙা পোড়ো বাড়িটার ভেতরেও প্রাণ আছে। ওদেরও যেন প্রিয়জন আছে যারা চলে গেলে ওরা দুঃখ পায়। সেই প্রিয়জনদের কথা ওরা জগদীশকে বলুক।...এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই যেন জগদীশ নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেল। ছট্‌ফট্ করে উঠে দাঁড়াল। বিকেল হয়ে আসছে এক্ষুনি মাঠে যেতে হবে। দল বেঁধে তাকে খুঁজতে এসে বোধহয় ফিরে গেছে বন্ধুর দল।

সন্ধ্যাবেলা রত্না এল। রত্না বেবীর চেয়ে একটু বড়ো আর জগদীশের চেয়ে দু এক বছরের ছোট। কাছাকাছি বাড়ি, কিন্তু রত্না যে রোজ আসে তা নয়। কেন যে আসে না তা জগদীশ জানে না। আগে কিন্তু আসতো।

হ্যারিকেনটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল। রত্নাকে শাড়ি পরতে এর আগে দেখেনি জগদীশ। নীল রঙের ফ্রকটাকে ব্লাউজের মতো নীচে পরেছে, তার ওপর নীল শাড়ি। চেনা রত্নাকে অচেনা মনে হচ্ছে।

এই, বেবী কোথায় রে? রত্না জিজ্ঞেস করল। খুব ভালো করে জগদীশের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল। ওর মুখটা লাল লাল। গলার স্বরটা ক্ষীণ। লজ্জার সুরে কাঁপল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বাতাসের শরীরের সঙ্গে মিশে গেল এবং তারপরেও যেন কাঁপতে লাগল।

—কেন, বেবীকে দিয়ে কি হবে? জগদীশ অনেকক্ষণ পরে বলল

—তা দিয়ে তোর দরকার কি! ভারি সর্দার হয়েছিস আজকাল।

—হয়েছিই তো। জগদীশ হেসে হেসেই বলল।

—থাক্ তোকে বলতে হবে না। আমি মাসীমার কাছে যাচ্ছি।

—না, মাও জানে না বেবী কোথায় আছে। শেষ কথাটা কানে নিল না রত্না।

রত্না ঘুরে দাঁড়াল। দরজার দিকে। এক পা এগোলো। জগদীশ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। একটা কিছু করা দরকার না হলেও চলে যাবে।

জগদীশ বলল,—দাঁড়া, এইখানে বোস্। আমি বেবীকে খুঁজে আনছি।

—ইস্, দাঁড়াবো না, আমাকে মীরাদের বাড়ি যেতে হবে।

—বুঝতে পেরেছি, শাড়িটা দেখাতেই এসেছিলি, বেবীকে খুঁজতে নয়।

রত্না শরীরটাতে একটা মোচড় দিল। ঘুরে একটু রুখে-দাঁড়ান ভঙ্গীতে মাথাটা সোজা করে চোখের কোণ দিয়ে জগদীশের দিকে তাকাল। এই ভঙ্গীটা তার চেনা। ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে রেগে গেলে জগদীশের দিকে অমনি ভাবে রুখে দাঁড়াতে রত্না। ভঙ্গীটা দেখে জগদীশ বরাবর হাসতো, ভয় পেত না।...কিন্তু আজ রত্নাকে অচেনা মনে হচ্ছে। যেন নতুন কোন মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হচ্ছে তার। জগদীশ ভয় পেল যেন। বুকের কাছটা একটু কাঁপল। দৃষ্টিটা পিছলে নামল যেখানে শার্টিনের নীল রঙের ফ্রকটা বুকের কাছে সামান্য একটু টান খেয়েছে। শাড়ির ওপর থেকেও বোঝা যায়। জগদীশ মেঝের দিকে তাকাল।

জগদীশ চোখ না তুলেও বুঝতে পারল রত্না হাসছে। খুব মৃদু সে হাসিটা। হাসিটা অদ্ভুত—যেন অনেক কথা ঐ হাসিটার ভেতর বলা থাকে কিন্তু সেগুলো যে কি তা জগদীশ বুঝতে পারে না। রত্নার পায়ের শব্দটা এগিয়ে এল। জগদীশ মুখ তুলল।

রত্না হাসছে না। রত্না ভীষণ গম্ভীর।

জগদীশ তাকাল। তাকিয়ে রইল।

রত্না বলল,—লজ্জা করল না ও কথা বলতে? বাঁদর কোথাকার!

জগদীশ ভীষণ অবাক হল। হঠাৎ কোথা থেকে এত সাহস পেল রত্না। জগদীশের হাত দুটো নিস্‌পিস্ করে উঠল। দাঁতে দাঁত চাপল জগদীশ। আর একটা কিছু বললেই···। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে রত্না তার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো হয়ে গেছে। যেন রত্নার কাছে সত্যিই সে ছেলে-মানুষ। ও এত বড় হয়ে গেল কেমন করে? নিজেকে খুব অসহায় লাগল তার। কিছু একটা করতে হবে ভেবেও সে চুপ করে বসে রইল। না, রত্নার গায়ে হাত দেওয়া যায় না। ওকে অনেক বড়ো মনে হচ্ছে। বড়ো মেয়েদের গায়ে হাত দিতে নেই। ওর বেণী দুটো সামনের দিকে ছাড়া রয়েছে। ইচ্ছে করলে জগদীশ ওই বেণী দুটোতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু কেন যেন জগদীশের ইচ্ছে হল না।

রত্না চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। জগদীশ অবাক হলেও কথা বলল না। রত্না ওর বেণী দুটো নিয়ে নাড়া চাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হাসল। সেই অদ্ভুত হাসিটা—যেন অনেক কথা ঐ হাসিটার ভেতর বলা থাকে, কিন্তু সেগুলো যে কি তা জগদীশ বুঝতে পারে না। জগদীশ চুপ করে রইল।

—কিরে কথা বলছিস না যে! রত্না বলল।

—এমনিই।

—ইস্ এমনি বইকি! নিশ্চয়ই তুই—

রত্নার চোখের দিকে এবার স্পষ্ট করে তাকাল জগদীশ। রত্না যেন ভীষণ অবাক হয়েছে। খুব বড়ো বড়ো চোখে তার দিকে তাকিয়ে সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসছে রত্না। অবাক হওয়ার সঙ্গে সব-বুঝে-ফেলেছি ধরণের একটা ভাব। জগদীশ ভাবল, বোধহয় রত্না আশা করেছিল যে সে রেগে যাবে। রেগে গিয়ে ঠিক আগের মতোই ওর বেণী ধরে টেনে কিংবা হাত মুচড়ে দিয়ে কিংবা চড় মেরে শোধ নেবে জগদীশ। কিন্তু তা করেনি বলেই যেন অবাক হয়েছে ও। কিন্তু ওতো জানে না ওকে আজ কতো বড়ো আর অস্পষ্ট দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রত্না বলল, বোকার মতো মুখ করে বসে আছিস্ কেন?

জগদীশ চুপ করে রইল। রত্না এগিয়ে এল আর তারপর জগদীশের চেয়ারের মুখোমুখী খাটের একপাশে খুব সন্তর্পণে বসল।

—ইস্, রাগ হয়েছে বাবুর। রত্না আবার বলল। জগদীশ খুব স্পষ্টভাবে একটা সুগন্ধ পেল। পাউডার স্নো আর বোধহয় তেলের গন্ধ। গন্ধটা চেনা। তবু যেন জগদীশ অস্বস্তি বোধ করল। কেমন যেন সঙ্কোচে, জড়োসড়ো হয়ে বসল সে। রত্নাটা এত কাছাকাছি এসে বসেছে যে ওর দিকে ভালো করে তাকাতে পারছে না জগদীশ।

যেন খুব গোপন একটা কথা কানে কানে বলবে এইভাবে মুখটা জগদীশের কাছে এগিয়ে আনল রত্না। রত্নার মুখটা খুব কাছাকাছি যেন তাকে ছোঁয়-ছোঁয়। জগদীশ একটা ঠাণ্ডা ভয়কে তার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যেতে অনুভব করল। কেমন জ্বালা করল বুকটা। বুকটা জ্বালা করল আর কাঁপতে লাগল। রত্নার মুখটা হাসি হাসি। রত্না বলল—এই, একটা কথা বলবি ?

নিজের মুখটা দূরে সরিয়ে নেবার জন্য একটু পেছন দিকে হেলে জগদীশ প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল—কি ?

রত্না বলল—কাছে আয় না, অমন হেলছিস কেন ?

হ্যারিকেনটা বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। জগদীশ ভাবল। আলোটা আরো কম হলে—আরো কম হলে কি যে হত সে ভেবে পেল না। রত্নার মুখটা লাল লাল। যেন কি একটা কথা নিয়ে মনে মনেই ও লজ্জা পাচ্ছে। জগদীশ সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকল ; প্রায় কাঁপা গলায় বলল—কি বলছিস্ বল্ না।

—ঠিক বলবি তো ?

—হ্যাঁ।

—আজকে,—আজকে আমায় কি রকম দেখাচ্ছে রে !

জগদীশের হঠাৎ হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। খুব জোরে। হাসিটাকে সে বুকের ভেতর অনুভবও করলো, কিন্তু কিছুতেই সেটা ঠোঁটে এলো না। হাসিটা বুকের ভেতরই কাঁপতে কাঁপতে মরে গেল। জগদীশ উজ্জ্বল চোখে রত্নার দিকে তাকাল। যেন রত্না তাকে অনেক সম্মান দিয়েছে। এই যেন প্রথম নিজের মূল্য বুঝতে পারল জগদীশ। জগদীশ খুশী হল। সঙ্গে সঙ্গে তার এল মনে হল—রত্নাটা কি ছেলেমানুষ।

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল জগদীশ। বারান্দায় পায়ের শব্দ। মা আসছে। মার পায়ের শব্দটা জগদীশের চেনা। একটু যেন চমকে উঠল জগদীশ। অথচ চমকানোর কোন দরকারই ছিল না, কেননা সে এমন কিছু করছে না যে—। মনে মনে তার নিজের ওপর রাগ হল। সে কিছুই বলল না রত্নাকে।

—একি, রত্না কখন এলি? ঘরের দরজা থেকেই মা জিজ্ঞেস করল।

—এই মাত্র। রত্নার উত্তর।

কি মিথ্যুক—জগদীশ মনে মনে ভাবল। মিথ্যে কথা বলবার কোন দরকার ছিল কি রত্নার। ও তো অনেকক্ষণ এসেছে; —সেকথা বললেই বা কি হত।

মা ঘরে এল। হাতে এক রাশ ধোয়া শুকনো জামাকাপড়। সেগুলো আলনায় ভাঁজ করে রাখবার জন্য এগিয়ে যেতে যেতেই মা রত্নাকে বলল— তুই ও ঘরে যা, আমি আসছি।

রত্না চলে গেল। যাওয়ার সময় দরজা থেকে ঘুরে জগদীশের দিকে তাকাল। ওর তাকানোর মধ্যে একটু হাসি ছিল। জগদীশ ভাবল।

মার মুখটা গম্ভীর, রাগ রাগ। রোজ এই সময়টাতে যেন মাকে ভীষণ রাগী, আর গম্ভীর বলে মনে হয়। যেন একটু ছুঁতে গেলেই মা ধমকে দেবে। বিকেলবেলা গা ধুয়েছে মা। সাবানের মৃদু গন্ধ। খোঁপাটা পরিপাটি করে বাঁধা, পরনের শাড়িটা ধপ্‌ধপে পরিষ্কার। এইরকম সাজপোশাকে মাকে যেন ভাল লাগে না, যেন মা মা মনেই হয় না। যেন অন্য বাড়ি থেকে কোন ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছে। কাজ করতে করতে যখন মার চুল এলোমেলো হয়ে যায়, কাপড়টা নোংরা আর হলুদের ছোপধরা হয়, আর মুখে ঘাম জব্‌জব্‌ করতে থাকে, তখন যেন মাকে ভীষণ ভালো লাগে, আদর করতে ইচ্ছে হয়। বারবার মনে হয় মার বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে কাজ করতে। বোধহয় মার কষ্টের জন্যেই তখন মাকে অত ভাল লাগে।

মা জগদীশের দিকে তাকাল। বলল,—তুই পড়্‌ না। রাতদিন বসে বসে কি যে ভাবিস ছাইভস্ম।

—মা, তুমি আমার কাছে একটু বসবে? জগদীশ বলল।

—কেন রে!

—এমনিই। ভাল লাগছে না। বোসো না।

—বসবো কি করে, ও ঘরে রত্না বসে আছে একা একা।

—কেন, বেবী আসে নি ?

—কোথায়, দেখছি না তো। তার তো আড্ডার শেষ নেই।

—তাহ'লে রত্নাকেও এই ঘরে ডাকো।

মা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকাল তার দিকে। যেন হঠাৎ তাকে নতুন করে দেখছে মা। কেমন যেন একটা সন্দেহ মার চোখে। যদিও হ্যারিকেনের আলোতে মার মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, তবুও জগদীশের মনে হল মার মুখটা যেন বদলে গেল। মা খুব গম্ভীর হলো। মা খুব আস্তে বলল,—না। তুমি পড়ো।

মা চলে গেল।

নিজেকে ভীষণ বোকা বলে মনে হল জগদীশের। মাকে যেন সে বুঝতেই পারল না। তারপর আস্তে আস্তে সে অনুভব করল যে, একটা বিরক্তি মেশানো ক্ষোভ আর লজ্জা তার মন জুড়ে বসেছে। তার রাগ হল। ইচ্ছে হল একটা কিছু ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে রাগটা মেটায়। তারপর কেমন একটা হতাশায় ভেঙে পড়তে পড়তে সে টেবিলের ওপর দুহাত রেখে মুখ গুঁজল। একবার ইচ্ছে হল এ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বারান্দায় কিংবা ও ঘরে। তারপর একটা সঙ্কোচ এলো। না, যাওয়া যায় না। একটা যেন আলিখিত অকথিত আইন আছে। সে আইনটা আঙুল উঁচিয়ে বলল, না তুমি যাবে না। সে অনুভব করল, খানিকটা স্বাধীনতা সে হারিয়ে ফেলেছে। বুকটা জ্বালা করছে। আজকের বিকেলটা যেন খুব ভালো হতে গিয়ে খুব খারাপ হয়ে গেল।

জগদীশ ভেবেছিল রত্না চলে গেছে। কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল তা সে জানে না। খুব বেশীক্ষণ নয় নিশ্চয়ই। পিঠে কিল খেয়ে উঠে দেখল, রত্না। রত্ন হাসছে।

পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে জগদীশ বলল,—মারলি কেন ?

—এমনিই।

—হাসছিস কেন ?

—এমনিই।

—তোকে মারলে কেমন হয় ?

—ইস্। মারা এতো সোজা !

রত্না ঘুরে দাঁড়াল। রত্না চলে যাবে। দরজাটা খোলা। হ্যারিকেনটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। জগদীশের মনে হল রত্নার সঙ্গে কার যেন মিল আছে। ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গী আর হাসিটার সঙ্গে কার যেন মিল আছে। কার? কে জানে। কে জানে কেন শরীরে কাঁটা দিল তার।

—কালকে সকালে আবার আসব আমি। বেবীকে থাকতে বলিস্। বলতে বলতে দরজার চৌকাঠের ওপাশে একটা পা বাড়াল রত্না।

—দাঁড়া, তোকে একটা কথা বলা হয়নি। জগদীশ তাড়াতাড়ি বলল।

—কি?

—রাখী আর পাখীদের চিনিস?

—হ্যাঁ। কেন?

—তোকে দেখতে ঠিক রাখীর মতো লাগছে। কেন যে হঠাৎ কথাটা বলল জগদীশ তা সে নিজেই বুঝল না।

রত্না বলল, যাঃ।

রত্না লাল হ'ল একটু, যেন খুশী হ'ল। তারপর একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—রাখীর বিয়ে জানিস?

জগদীশ চমকে উঠল। কথা বলল না, বলতে পারল না। রত্না নিজেই আবার বলল,—এ মাসের সাতাশে।

—তুই কি ক'রে জানলি? জগদীশ অবিশ্বাসের সুরে বলল।

—বলব কেন? রত্না যেন মজা পেয়ে হাসল। চলে গেল।

তার বুকের ওপর দিয়ে খুব ভারী পায়ে কে যেন মাড়িয়ে গেল! বুকটা মোচড় দিল, তারপর শূন্য হয়ে গেল। দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। খুব জোরে চিৎকার দিতে গিয়েও পারল না সে। সে যেন মরে যাচ্ছে আর মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েও সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার চারপাশে অনেক লোক। তাদের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না। তারা সব অশরীরী মূর্তির মতো নিঃশব্দে তার চারপাশে ঘুরছে ফিরছে, আর চাপা গলায় কথা বলছে। কি এত কথা ওদের। কোথা থেকে যেন মৃদু আর গভীর নীল আলো ঘরটার মধ্যে এসে পড়েছে। ঘরটা ভীষণ ঠাণ্ডা। কে যেন খুব কাছে এল আর চাপা গলায় তাকে জানাল যে, তার মা-ও মরে গেছে। জগদীশের ভীষণ কান্না পেল। কিন্তু সে কাঁদতে পারছে না। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দরজা খুলে কারা যেন ঘরে ঢুকল একটা দেহকে বহন করে

নিয়ে। জগদীশ টের পেল ঐ দেহটা তার মার। মা মরে গেছে। ওরা মার দেহটা ঠিক তার পাশেই শুইয়ে রাখল। জগদীশ ভাবল, তার যেন বিশ্বাস হ'ল মা আবার বেঁচে উঠবে। ঠাকুমা যখন মরে গিয়েছিল তখনো জগদীশ ঠিক এ কথাটাই ভেবেছিল, ঠাকুমা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে আবার। যেমন করেই হ'ক। কিন্তু ঠাকুমা বাঁচেনি। তার শিয়রে বসে কারা যেন কাঁদছে। জগদীশ চোখ তুলল। রাখী আর পাখী। আর তার পায়ের কাছে বসে রত্না। ওরা সবাই কাঁদছে। জগদীশ একটুও অবাক হল না। যেন সে এরকমটাই ভেবেছিল। জগদীশের কান্না পাচ্ছে। যেন কাঁদতে পারলেই সব দুঃখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু কে যেন তার গলাটা চেপে ধরে আছে। কিছুতেই সে কাঁদতে পারছে না। রাখী পাখী রত্না তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা জগদীশকে মরে যেতে দেখছে। জগদীশ দাঁতে দাঁত চাপল। সে মরবে না, কিছুতেই না……

ঘুম ভেঙে তড়বড় করে উঠে বসল জগদীশ। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকটা ধড়ফড় করছে। হ্যারিকেনটা তেমনি জ্বলছে। বইগুলো খোলা। জগদীশ উঠে দাঁড়াল। খুব আশ্বস্ত হয়ে সে অনুভব করল, মা-বাবা-পিণ্টু-বেবী সবাই জেগে আছে। বেঁচে আছে। এখনো খাওয়ার ডাক পড়েনি।

মা ডাকছে। জগদীশ উত্তর দিল না। মা এ ঘরে এল,—ওমা, তুই জেগে আছিস। আমি ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিস্। খেতে যাবি না!

—হুঁ।

—আয়, সবাই বসে আছে তোর জন্যে।

—তুমি আমার কাছে এসো একটু।

মা কাছে এল,—কেন রে; শরীর-টরীর খারাপ নয় ত'?

জগদীশ মাকে ছুঁলো। মাকে খুব ভাল লাগছে। মা বেঁচে আছে। মা হাসছে। জগদীশ মার কাঁধে মুখটা গুঁজে দিল,—মা, মা, মা, মাগো, মামণি-গো। তার চোখে জল এল হঠাৎ। কেন যে কান্না পাচ্ছে তার তা সে বুঝতে পারল না। কান্নাটা বুক ছাপিয়ে, গলা ছাড়িয়ে, শিরায় শিরায় আলোড়ন তুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গলাটা বুজে আসতে চাইছে।

—কি হ'ল তোর হঠাৎ?

জগদীশ কথা বলতে পারল না। জগদীশ কান্নাটাকে প্রাণপণে চেপে রাখল।

দুপুর। ঘরটা বিশ্রী গরম। ঘর থেকে জগদীশ বাইরে এল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল।

মিত্তিরদের নির্জন পোড়ো ভিটেটা প্রায় নিঃশব্দে ডিঙিয়ে গলিটার ভিতর এসে দাঁড়াল সে। মাটির উপর বসলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে। একটা নরম ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস যেন তাকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরল। খুব ভাল লাগল তার। দুপুরের রোদ্দুরটা চোখ রাঙিয়ে তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। গলিটা স্নেহশীলা ঠাকুমার মতো, মায়ের মতো তাকে আগলে নিল। দুপুরটা গলির বাইরে দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে।

জগদীশ চুপ করে বসে রইল। জগদীশের মনে হ'ল এই দেয়াল দুটো একদিন ভেঙে পড়বে, কিংবা কেউ এসে ভেঙে ফেলবে। কোন কিছুই চিরকাল থাকে না। থাকবে না। যেদিন এ দেয়াল দুটো ভেঙে পড়বে সেদিন জগদীশ খুব দুঃখ পাবে, খুব কষ্ট হবে তার। এই দেয়াল দুটো তাকে অনেকদিন আশ্রয় দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। পোষা কুকুরছানা মরে গেলে সকলের সামনে কাঁদতে না পেরে এইখানে এসে কেঁদেছে ছেলেবেলায়। কতবার ডাঁশা পেয়ারা, কাঁচা আম কিংবা মা-বাবার চোখের বিষ তার ধনুকটা ছেলেবেলায় এইখানে এসে লুকিয়ে রেখেছে সে। কেউ টের পায়নি। এই দেয়াল দুটো তার বিশ্বস্ত আত্মীয়ের মতো, সমবয়স্ক বন্ধুর মতো তাকে সঙ্গ দিয়েছে। কিন্তু একদিন এই গলিটাও ধ্বংস হয়ে যাবে, মরে যাবে। যেভাবে তার ঠাকুমা মরে গেছে। কেউ বেঁচে থাকবে না। মা, বাবা, বেবী, পিন্টু, রত্না, রাখী, পাখী—এরা সবাই একদিন মরে যাবে। শেষ হয়ে যাবে।

ঠাকুমাকে সে ভয়ঙ্কর ভালবাসতো। একদিন রাত্রিবেলা কে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। সবাই কাঁদছিল, জগদীশকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মা কাঁদছিল। জগদীশ ভেবেছিল ওরা বোকার মতো কাঁদছে। আসলে ঠাকুমা বেঁচে উঠবেই। ঠাকুমা কি মরে যেতে পারে? দূর তাই কখনো হয়! ঠাকুমার ফিরে আসার অপেক্ষায় জগদীশ অনেকদিন উৎকণ্ঠ হয়েছিল।

কেন যে এমন হয়! ঠাকুমা মরে যায়, রাখী-পাখীদের বিয়ে হয়ে যায়, দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ে।

অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া অনুভূতির সঙ্গে সিরসিরে বাতাসের মতো কিছু যেন একটা বুঝতে পারল জগদীশ। যেন বুঝতে পারল এগুলোকে হতেই হয়।

রত্না-রাখী-পাখীরা একদিন বড় হবে তারপর বড় হতে হতে একদিন ঠাকুমার মতো বুড়ি হয়ে একদিন মরে যাবে। মনে হতেই যেন কেমন খারাপ লাগল তার।

গলিটা শূন্য। জগদীশের মনে হ'ল তার চারদিকের জগৎটা যেন একটা খোলস ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে নতুন হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। চোখ বুজে সে দেখতে পাচ্ছে পুরনো পৃথিবীটা যেন দূরে দূরে সরে যেতে যেতে তার দিকে বিষন্ন চোখে তাকিয়ে আছে। জগদীশের ঘুম পেল।

সে যেন সেই গির্জাটার ভেতর বসে আছে। সামনে মোমবাতি-জ্বলা বেদী। খুব কাছ থেকে সেই মেয়েটি তার কানে কানে প্রার্থনার মন্ত্র বলে দিচ্ছে। আজ তার আর ঘুম আসছে না। সে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি রত্না! না, রত্না নয়, বোধ হয় রাখী। হ্যাঁ, রাখীই, যার বিয়ে হয়ে যাবে এ মাসের সাতাশে। জগদীশের দুঃখ হ'ল। মেয়েটি হাসছে। হাসতেই মেয়েটার মুখটা যেন তার মায়ের মতো হয়ে গেল। জগদীশ আশ্চর্য হয়ে দেখল মেয়েটির মুখে রত্না-রাখী-পাখী আর তার মা—সকলেরই মুখের আদল যেন আছে। সবাই মিলে যেন এই মেয়েটি।

মেয়েটা আরো কাছে এল। তাকে ছুঁল। জগদীশ চমকে উঠল। তার চোখের সামনে থেকে একটা মস্ত পর্দা যেন হঠাৎ সরে গেল। তখন রাখী পাখী আর রত্নাদের সব রহস্য যেন তার সব জানা হয়ে গেছে। এখন যেন অনেক অনেক কিছু, জগদীশ যা এতদিন বুঝতে পারত না। তা যেন বুঝতে পারছে। জগদীশকে ভেঙে ধ্বংস করে আবার যেন কে তাকে বাঁচিয়ে তুলছে।

জগদীশ জেগে উঠল। প্রবল যন্ত্রণার মতো একটা কান্না তার বুক থেকে উঠে আসছে। এই কান্নাটাকে জগদীশ এতদিন চেপে রেখেছিল। ইটের খাঁজে হাত দুটোকে চেপে ধরল সে। ঝুর ঝুর করে বালি পড়ল। বালি পড়তেই লাগল,—জগদীশের মাথায়, গায়ে চোখে।

জগদীশ ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সেই কান্নার মধ্যে খুব সামান্য, ছুঁচের মুখের মতো ছোট্ট একটু সুখ ছিল।

দুপুরটা ঘন হয়ে তার রক্তের মধ্যে জ্বলতে লাগল।

চিহ্ন

অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে জ্বলন্ত মোমবাতি।

হলুদ আলোয় যেন জলের মধ্যে জেগে আছে ইভার মুখ। মুখখানা এখন ভৌতিক। একটু নীচুতে আলো, শিখাটা হেলছে দুলছে, কাঁপছে। ইভার মুখে সেই আলো। গালের গর্তে, চোখের গর্তে, কপালের ভাঁজে ছায়া। মুখখানা যেন বা এখন ইভার নয়। ইভা এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। মাঝখানের পর্দা উড়ছে হাওয়ায়।

অমিত বলে—সাবধান। পর্দায় আগুন না লাগে!

ইভা কিছু বলল না। জলে ক্লান্ত সাঁতারু যেমন শ্লথ গতিতে ভেসে যায়, তেমনি এ ঘর থেকে ও ঘরে চলে গেল।

অন্ধকারে চৌকিতে বসে আছে অমিত। তার কোল ঘেঁসে পাঁচ বছরের ছেলে টুবলু আর তিন বছরের মেয়ে অনিতা। যখনই কারেণ্ট চলে যায় তখনই অমিত তার দুই ছেলেমেয়েকে ডেকে নিয়ে বিছানায় বসে থাকে। বড্ড ভীতু অমিত। অন্ধকারে কোথায় কোন পোকামাকড় কামড়ায় কিংবা আসবাবপত্রে হোঁচট লাগে। কিংবা খোলা, পড়ে-থাকা ব্লেড বা ইভার পেতে-রাখা অসাবধান বঁটিতে গিয়ে পড়ে। কিংবা এরকম আর কিছু হয় সেই ভয় তার। বুক ঘেঁষে ছেলেমেয়েরা বসে আছে বুকের দুই পাঁজরে দুজনের মাথা। অমিত ঘামছে।

—একটা মোমবাতি এ ঘরে দেবে না? অমিত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

রান্নাঘর থেকে ইভার উত্তর আসে না। ইভা ও রকমই। আজকাল দু'তিনবার জিজ্ঞেস না করলে উত্তর দেয় না।

—কী গো? অমিত বলল।

ইভা আস্তে বলে—মোমবাতি দিয়ে কি হবে? তোমরা তো বসেই থাকবে এখন!

—অন্ধকারে কি ভাল লাগে?

—না লাগলেও কিছু করার নেই। মোমবাতি একটাই ছিল।

—ওঃ। অমিত সিগারেট ধরাল।

অনিতার মাথাটা বুক থেকে স্খলিত হয়ে কোলে নেমে গেল। তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হয়। ঘুমিয়ে পড়বে মেয়েটা।

অমিত নীচু হয়ে ডাকল—অনি, ও অনি!

—উঁ। ক্ষীণ পাখী-গলায় সাড়া দেয় অনিতা।

—এখন ঘুমোয় না মা, ভাত খেয়ে ঘুমোবে।

—খাবো না।

—খাবে না কি? খেতে হয়। গল্পটা শোন।

ঘুমগলাতেই অনিতা বলে—বল তাহলে।

এইটুকু বয়সেই কি টনটনে উচ্চারণ মেয়েটার! পরিষ্কার কথা বলে, এতটুকু শিশুসুলভ আধো-কথার জড়তা নেই। অমিত মাঝে মাঝে ইভাকে বলে—আমরা ছেলেবয়সে এত পাকা কথা বলতে পারতামই না। এখনকার ছেলেমেয়েরা কীরকম অল্প বয়সেই পাকা হয়ে যায়।

ঘুমন্ত মেয়েটাকে টেনে বসায় অমিত। মাথাটা আবার পাঁজরে লাগে। অনেকক্ষণ চুপচাপ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে টুবলু বলে—আমি ঘুমোই না। ঘুমোই বাবা?

—না তো। তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

ছেলেটার জন্য কত মায়া অমিতের, ভারী ভীতু ছেলে, ঘরকুনো। এ বয়সে যেমন দুরন্ত হয় বাচ্চারা, তেমন নয়। রোগা দুর্বল ন্যাতানো। স্টেশন রোড-এর এক বুড়ো হোমিওপ্যাথ গত বছরখানেক যাবৎ ওষুধ দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটার তেমন বাড়ন নেই। খেতে চায় না, কখনো ওর তেষ্টা পায় না, খেলে না। ইভার ইচ্ছে একজন চাইল্ড-স্পেশালিস্টকে দেখায়। সেটা হয়ত ধারকর্জ করে দেখাতেও পারত অমিত। কিন্তু তার কলেজের একজন কলিগ ছেলেকে স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখানোর পর যে খাওয়ার চার্ট আর ওষুধ-বিষুধের ফিরিস্তি দিয়েছিল তাতে অমিত ভড়কে যায়। তাই গত একবছর যাবৎ ইভা বিস্তর অনুযোগ করা সত্ত্বেও অমিত গা করেনি। যাক গে, কৃষ্ণের জীব, টিক্ টিক্ বেঁচে থাক। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে বয়সে অমিতও তো কত ভুগেছে, মাসেক ধরে রক্ত-আমাশা, চিকিৎসা ফিকিৎসা নিয়ে সেই মাথা ঘামাত না। গ্যাঁদাল পাতা বাটা, থানকুনীর ঝোল, পুরোনো আতপ চালের গলা ভাত, পাড়ার এল-এম-এফ ডাক্তারের দেওয়া ক্যাস্টর অয়েল ইমালশান, এই খেয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে আজও বেঁচে আছে। তার ছেলেটাই বা তাহলে বাঁচবে না কেন?

সিগারেটের আগুন ফুলকি ছড়াচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়ে অ্যাসট্রেটা ঠাহর করে অমিত। সাবধানে ছাই ঝাড়ে। বলে—একদিন একটা টিয়াপাখী উড়ে এল খরগোশের বাড়ীতে, বলল—খরগোশ ভাই, আমি তোমার কাছে থাকব। খরগোশ—থাকবে তো। কিন্তু ঘর কোথায়! আমার তো ছোট্ট একটু খুপড়ি! টিয়াপাখী বলে—আমার বাসা পড়ে ভেঙে গেছে, এখন আমার ডিম পাড়বার সময়, তাহলে উপায়? তখন খরগোশটার দয়া হল, একটা ছোট্ট খুপড়ি বানিয়ে দিল টিয়াপাখীটাকে। টিয়াপাখী থাকে, ডিম পাড়ে, তা দেয় মনে ভারী আনন্দ, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে। কত আদর করবে বাচ্চাকে, উড়তে শেখাবে, খেতে শেখাবে, শিকার করতে শেখাবে। খরগোশ একদিন খাবার আনতে বাইরে গেছে, এমন সময়ে এক মস্ত ইঁদুর এসে হাজির। বলল—এই টিয়াপাখী, দে তো তোর দুটো ডিম। টিয়া বলল, কেন দেবো? ডিম দুটি আমার বাচ্চা হবে, কত আদর করব, তোকে দেব কেন? ইঁদুর বলল—দিবি না তো। তবে রে বলে দাঁত বের করে কামড়াতে গেল…অনি ও অনি।

—উঁ।

—আবার ঘুমোচ্ছিস? বলে অমিত গলা ছেড়ে বলে—ইভা, ভাত হয়েছে? অনি ঘুমিয়ে পড়ছে যে।

—বাবা, তারপর? জিজ্ঞেস করে টুবলু।

—বলছি দাঁড়া। দ্যাখ্ না, বোন ঘুমিয়ে পড়ছে! ও অনি!

হঠাৎ অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো আসে ইভা। কথা বলে না। নড়া ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয় মেয়েটাকে। ছেলেটাকে টানতে হয় না। ভীতু ছেলে। অন্ধকারেই টের পায় মার মেজাজ ভাল নেই। সে রোগা পায়ে লাফ দিয়ে নামে চৌকি থেকে। মার পিছু পিছু বাধ্য ছেলের মতো যায়।

দু' ঘরের মাঝখানে পর্দা উড়ছে। ওপাশেরটা আসলে ঘর নয়। রান্নাঘর। সেখানে মোমের আলোর আভা। অন্ধকারে বসে অমিত সেই মৃদু আভার দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটা খেতে চাইছে না। ইভা তার হাতের চুড়ির শব্দ তুলে দুটো চড় কষাল। মেয়েটা কাঁদছে। ইভা চাপা স্বরে মেয়েকে বকছে এবং মেয়েকে বকতে বকতেই বকার ঝাঁঝটা নিজের কপালের এবং ভাগ্যের প্রসঙ্গে বলে যাচ্ছে। অমিত চুপ করে বসে শোনে। ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে একটা লাথিতে মেয়েমানুষটিকে চুপ করায়।

লাথি যে কখনো মারেনি অমিত তা নয়। লাথি বা চড় চাপড় কয়েকবারই মেরে দেখেছে। লাভ হয় না। সদ্য সদ্য একটু ফল হয় বটে কিন্তু ইভা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

অবিকল ছাগলের মতো একটা লোক গলা পরিষ্কার করছে কোথায় যেন। 'হ্যা-ক্' 'হ্যা-ক্' শব্দটা শুনলে নিজেরও যেন বমি তুলতে ইচ্ছে করে।

কান্না থামিয়ে ছেলেমেয়েরা এখন খাচ্ছে। গুণ্ গুণ্ করে এখন আবার সোহাগের গলায় ওদের গল্প শোনাচ্ছে ইভা। ইভাকে নিয়েই দিনের অধিকাংশ সময় ভাবে অমিত। বিয়ে করে তারা সুখী না অসুখী তা ঠিক বুঝতে পারে না। কেউই বোধ হয় পারে না। মেয়েমানুষ জাতটার মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই। যখন তারা খুবই সুখে আছে তখনো পুরোনো দুঃখের কথা তুলে খোঁটা দেবেই।

খেয়ে দেয়ে ওরা এল। ইভা মশারি টাঙাল। ওরা গল্পের বাকী অর্ধেকটা না শুনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কারেন্ট এখনো আসে নি। পৃথিবী জোড়া অন্ধকার।

মোমবাতিটা মাঝখানে রেখে দুধারে নিঃশব্দে খেতে বসে ইভা আর অমিত, সম্পর্কটা সহজ নেই যেন। একধারে ছেলেমেয়েদের এঁটো থালা পড়ে আছে। তাতে ডাল-ঝোল মাখা কিছু ভাত। অমিত আড়চোখে চেয়ে দেখল। এখন দু' টাকা আশি কেজি যাচ্ছে চাল। তাদের রেশন কার্ড নেই। বলল—ভাত নষ্ট করো কেন!

—কী করব? শেষ কয়েকটা গরাস্ খেল না।

—কম করে নেবে। গুচ্ছের গেলাতে চাইলেই কি হয়। ওদের পেটে জায়গা কত!

—দুটো ভাতই তো, আর কি ভালমন্দ খায়! ঘি মাখন মাছ মাংস কি যায় ওদের পেটে?

—গরীবের সন্তান, যা জোটে তাই খেয়ে বাঁচবে।

—মুরোদ না থাকলেই ওসব কথা বলে লোকে।

—চালের দাম জানো?

—জানতে চাই না।

মেয়েমানুষটা ঝগড়া পাকিয়ে তুলছে। রোগা, দুর্বল, রক্তহীন। তবু গলা এতটুকু ক্ষীণ নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ইভার। বিয়ের সাত বছর ধরে

প্রতিদিন অমিত যত অন্যায় করেছে, যত অবহেলা, যত অপমান সব হুবহু মুখস্থ বলে যায়। মেজাজ ভাল থাকলে মাঝে মাঝে বলে—এরকম মেমারী নিয়ে লেখাপড়া করলে না ইভা, কেবল স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে বসে রইলে।

জ্বলন্ত মোমবাতির উপর দিয়ে বাঘের চোখে ইভার দিকে চেয়ে থাকে অমিত। ইভাও চেয়ে থাকে রাগী বনবেড়ালের মতো। একটুও ভয় পায় না। ভিতরটা হতাশায় ভরে যায় অমিতের। কী রকম করলে কী ভাবে তাকালে সেও একটু ভয় পাবে। একটু সমীহ করবে তাকে। অমিত আবার পাতের উপর মুখ নামায়। লাল রুটিগুলো দেখে এবং ভাবতে থাকে সে হিপনোটিজম শিখবে। কিংবা আরো রাগী হয়ে যাবে! কিংবা একদিন কিছু না বলেকয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

নিরুদ্দেশও একবার হয়েছিল অমিত এক রাতের জন্য। পরদিন ফিরে দেখে ইভার কি করুণ অবস্থা। পাড়াশুদ্ধ মেয়েপুরুষে ঘর ভর্তি, মাঝখানে পাথর হয়ে ইভা বসে, দু' চোখে অবিরল ধারা। তাকে দেখে সাতজন্মের হারানো ধন ফিরে পাওয়ার মতো উড়ে এসেছিল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও বুক ব্যথা করে। ইভার ভালবাসাও তো নিখাদ। অমিতও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। তেরাত্রি ইভাকে ছেড়ে থাকলে নিজেকে অনাথ বালকের মতো লাগে। সেই জন্যই ইভা বহুকাল বাপের বাড়ী যায় না। অমিতের জন্য।

চালওলা দুঃখিত মুখখানি তুলল। ভ্রাম্যমাণ পুরুত কপালে চন্দনের আর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে গোঁজা বিল্বপত্র। শ্বাস ফেলে বলে—তিন টাকা দশ।

—বলো কি? অমিত চমকায়। তার মাস মাইনে একশো আশি প্লাস কলেজ ডি-এ। রেশন কার্ড নেই।

করুণ একটু হাসে চালওলা—আজ তো এই দর। কাল আবার কি হবে কে জানে।

—গত সপ্তাহে দু' টাকা আশি করে নিয়েছি।

—গত সপ্তাহ! সে তো বাবু গত সপ্তাহ। বলে পাল্লা তুলে বলে—কতটা দেবো।

দশ কেজি নেওয়ার কথা বলে দিয়েছিল ইভা। কিন্তু সাহস পেল না অমিত। বলল—চার কেজি।

—গত সপ্তাহে আপনাকে বলেছিলাম, কিছু বেশী করে নিয়ে রাখুন। এ সময়টায় দর চড়ে। চাল ওজন করতে করতে চালওলা বলে। তারপর বিড় বিড় করতে থাকে—রাম…রাম…দুই…দুই…তিন…তিন…

ক' বছর আগেও চাল কিনলে এক আঁজলা কি এক মুঠো ফাউ দিত। এখন আঙুলের ডগায় গোনাগুনতি দশ কি বারোটা চাল বাড়তি দিল।

ঘামে পিছলে নেমে এসেছিল চশমাটা। অমিত ঠেলে সেটা সেট করল। ইভাকে ধমকে দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের পাতে যেন আর ভাত না নষ্ট হয়। আর, এবার থেকে ইভা আর অমিতের মতো ওরাও রাতে রুটি খাবে। পেটে সহ্য হয় না বললে চলবে না। সকলের ছেলেমেয়ে রুটি খায় ওদের ছেলেমেয়ে খাবে না কেন? খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে। ইভা হয়তো ঝগড়া করবে, তেড়ে আসবে, তবু বলতে ছাড়বে না অমিত।

বাজার আর চালের বোঝা দু' হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অমিত ইভা কী বলবে এবং সে তার কী উত্তর দেবে তা ভাবতে ভাবতে যায়। এবং মনে মনে সে ঝগড়া করতে থাকে। প্রচণ্ড ঝগড়া। রাগে ফেটে পড়ে। ইভাকে লাথি মারে, চুলের ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে টেনে বের করে দেয় ঘর থেকে, বলে—ইঃ নবাবের মেয়ে!

কিন্তু সবই ঘটে মনে মনে। একটু অন্যমনস্কভাবে সে রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকে। আজকাল ইভার কথা ভাবলেই তার মাথা আগুন হয়ে উঠে। মনে মনে সে যে কত গাল দেয় ইভাকে! ভালও কি বাসে না? বাসে। ভীষণ। এবং এই দুটি অনুভূতিই তাকে দু' ভাগে ভাগ করে খেয়ে নিচ্ছে।

ইভা রাগ করল না। মন দিয়ে অমিতের কাছে চালের দর, দেশের দুর্দিনের কথা শুনল। তারপর সংক্ষেপে বলে—দেখি।

—হ্যাঁ। দেখ। গাঁয়ে মাষ্টারী করতাম, সে বরং ভাল ছিল। শহরে নতুন প্রফেসারী নিয়ে এসে ফেঁসে গেছি। চেনাজানা লোকও তেমন নেই যে টপ্ করে হাত পাতব, দোকানেও ধারবাকী আনার মতো চেনা হয়নি। বুঝলে?

ইভা বুঝেছে। মাথা নাড়ল। এবং একটু পরে এক কাপ অপ্রত্যাশিত চা-ও করে দিল।

ইকনমিক্স-এর সাহা বেঁটে এবং কালো, মুখখানা সব সময়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সহজেই উত্তেজিত হয় লোকটা, সহজেই আনন্দিত হয়। তার সঙ্গে মোটামুটি ভালই ভাব হয়ে গেছে অমিতের। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর দেখা হতেই লোকটা খুব উত্তেজিতভাবে বলল—এ হচ্ছে অঘোষিত দুর্ভিক্ষ। ফেমিন ইন ফুল ফর্ম।

—তাহলে সেটা ওরা ডিক্লেয়ার করুক।

তাই করে? ইজ্জতের প্রশ্ন আছে না? আমি সেদিন ঠাট্টা করে একজন ছাত্রকে বোঝাচ্ছিলাম, ইনফ্লেশন কাকে বলে। বলছিলাম, এখন দেখছো বাবা পকেটে টাকা নিয়ে যায় আর থলি ভরে বাজার করে নিয়ে আসে। যখন দেখবে বাবা থলি ভরে টাকা নিয়ে যায় আর পকেট ভরে বাজার করে নিয়ে আসে তখনই বুঝবে ইনফ্লেশন। জারমানিতে বিশ্বযুদ্ধের পর ওরকমই হয়েছিল। এখন দেখছি ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা দিনকে দিন তাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের তুলনায় টাকার ভ্যালু…

কিন্তু এও ঠিক, সকালে তিন টাকা দশ কিলো দর-এ চাল কিনলেও অমিত টেরিকটনের হাওয়াই শার্ট পরে কলেজে এসেছে। পরনে জলপাইরঙা টেরিনের প্যান্ট, পায়ে বাটার জুতো, গাল কামানো। এখনো অধ্যাপকদের পরণে এরকমই পোশাক; কিংবা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী আর ভাল তাঁতের ধুতী। কিছু ক্লেশের চিহ্ন নেই।

একজন অধ্যাপক বলে—দক্ষিণ ভারত থেকে এক সন্ন্যাসী ডিক্লেয়ার করেছে সেভেনটি ফোর ইজ দি ব্লাকেস্ট ইয়ার ইন দি হিস্টোরী অফ ম্যানকাইণ্ড—

এ সবই হচ্ছে হাই-তোলা কথা। গায়ে লাগে না কারো। অধিকাংশ অধ্যাপকই অধ্যাপকসুলভ গম্ভীর, বিদ্যাভারাক্রান্ত চিন্তাশীল। দু'চারজন ছোকরা প্রফেসর একটু কথা চালাচালি করে হাল্কাভাবে। সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করে অমিত এখনো। দশ বছর স্কুল মাস্টারী করার পর হঠাৎ চাকরিটা পেয়েছে সে। অধ্যাপকদের মেলায় এখনো নিজেকে একটু ছোট লাগে তার। যেন বা দয়ার পাত্র সকলের। কিন্তু তা নয়। এখানে কেউ কাউকে তেমন লক্ষ্যই করে না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গাঁয়ে থেকে নোনা বাতাসে অমিত একটু কালো হয়ে গেছে, একটু গ্রাম্যও। তাই বোধ হয় সে একাই বসে বসে সকালে শোনা অবিশ্বাস্য চালের কথা ভাবে। সেই মহার্ঘ ভাত এখনো তার পেটে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

কলকাতায় এসেই রেশন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছিল। এখনো এনকোয়ারী হয় নি। কবে যে হবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আশুতোষ মুরুব্বি গোছের লোক পলিটিকস করে, নেতাদের সঙ্গে ভালবাসা আছে। সে অভয় দিয়েছিল।

কলেজের পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অমিত গেল তার কাছে।

—একটু দেরি হতে পারে বুঝলে পেঁপেচোর! আশু বলে—রিসেণ্টলি একগাদা ভূয়া কার্ড ধরা পড়েছে। এনকোয়ারী না করে নতুন কার্ড ইস্যু করবে না।

—তুমি তো জানোই ভাই, আমার লুকোছাপা কিছুই নেই। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর দুটো মাইনর—

—হয়ে যাবে। ভেবো না।

—চালের দর আজ—

—জানি, আমিও তো ভাত খাই।

—আর দু'চারদিন খোলা বাজারে চাল কিনলে আমার থ্রম্বসিস হয়ে যাবে।

আশু হাসল। বলল তুমি—তো তবু পেঁপেচোর। আমি যে কেন্নো!

আশু বোধ হয় প্রফেসরিটাকে তেমন ভাল চোখে দেখে না। অমিত চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই আশু তাকে প্রফেসরের বদলে পেঁপেচোর বলে ডেকে আসছে। কেরানী হল গে কেন্নো।

—দেখো ভাই। বলে অমিত।

আশু তাকে খাতির করল। ক্যাণ্টিনে নিয়ে ফ্রুট স্যালাড খাওয়াল। কফিও খাওয়াতে খাওয়াতে বলল—দুর্দিনের জন্য তৈরি হও। সারা দুনিয়ায় এবার ফলন কম। রাশিয়া, চীন সবাই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছে।

পিওর ম্যাথোম্যাটিক্সের প্রফেসর অমিত এত খোঁজ রাখে না। তার বাড়িতে খবরের কাগজ নেই। উদ্বেগের সঙ্গে বলে—সে কী?

—বলছি কী! কেবল ওই মার্কিন মুলুকেই যা ফলার ফলেছে। কিন্তু বাংলা দেশ ইস্যুতে অ্যামেরিকার সঙ্গে বাম্ হয়ে গেছে আমাদের।

—দুনিয়ার মাটি কি শুকিয়ে যাচ্ছে আশু?

—শুকোবে না? যুবতীও তো বুড়ি হয় ভাই।

যুবতী ও বুড়ির কথায় তৎক্ষণাৎ অমিতের ইভার কথা মনে পড়ে। বাস্তবিক যুবতী যে কী বুড়ি হয় তা অমিতের চেয়ে বেশী কে আর জানে!

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সেই গাঁয়ের কিশোরী মেয়েটি কত চট্ করে বুড়ি হয়ে গেল! ব্রোঞ্জের চুড়িগুলো এত ঢল্ ঢল্ করে হাতে যে মনে হয় হঠাৎ বুঝি খসে পড়ে যাবে। হাতেটাতে শিরা উপশিরা জেগে আছে। ভেজাল তেলের জন্যই কিনা কে জানে, মাথার চুলও উঠে শেষ হয়ে এসেছে। মুখের ডৌল দেখে অমিতের চেয়েও বেশী বয়সী মনে হয়।

কত লোকের কত থাকে, কিন্তু অমিতের ঐ একটা বৈ মেয়েমানুষ নেই। রাগ সোহাগ সব ঐ একজনের উপর। যুবতী বলো যুবতী, বুড়ি বলো বুড়ি, অমিতের ঐ একটাই মেয়েমানুষ। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অমিত মনে মনে ঠিক করে, আজ ফিরে গিয়েই ছেলেমেয়ে দুটোকে শোওয়ার ঘরে কপাট আটকে রেখে রান্নাঘরে ইভাকে ঝাপটে ধরে হামলে আদর করবে। ভাবতে ভাবতে তার শরীর চনমন্ করে উঠে। সারাদিনের নানা ক্লীবত্ব ভেদ করে পৌরুষ জেগে ওঠে।

চাঁদ নয়, হেমা মালিনী। অনেক ওপরে ধর্মতলার মোড়ে বড় বাড়িটার গায়ে লট্‌কানো হোর্ডিং। হোর্ডিং জুড়ে যেন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার মতো ঝরে ঝরে পড়ছে হেমা মালিনীর হাসি। অবিরল। এবং স্থির সেই হাসি। কে সি দাশের দোকানের উল্টো দিকে যেখানে ট্রাম লাইনের কাটাকুটি সেইখানে একটু মেটে জায়গায় কে যেন জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে। সেই ভেজা মাটির উপর পড়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে। ভিখিরি শ্রেণীর। মাটির রঙেরই একখানা শাড়ি জড়ানো। কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়েনি। বুকে পাছায় কিছু মাংস এখনো আছে। একটি স্তন কাৎ হয়ে ঝুলে মাটি স্পর্শ করেছে। আশে পাশে অমিত গুণে দেখল ঠিক চারটে বাচ্চা। সবচেয়ে ছোটটা বোধ হয় বছর দুয়েকের। পুঁটো পুঁটো সেই সব বাচ্চারা উদোম ন্যাংটো। সবাই মড়ার মতো শুয়ে আছে। চোখ বোজা, কেউ নড়ছে না। শ্বাস ফেলার ওঠানামা লক্ষ্য করা যায় না। তাদের চারধারে মেলা দুই নয়া তিন নয়া ছড়িয়ে আছে। তারা কুড়িয়ে নেয় নি। কেউ কুড়িয়ে নেয় নি। দয়ালু মানুষেরাই পয়সা ফেলে গেছে। আবার এও হতে পারে ওই সব হাসি ঝরে পড়েছে হেমা মালিনীর হাসি থেকেই! কে জানে! অমিত চোখ তুলে দেখল, ভুল নয়, দশমী পূজোর দিন দুর্গামূর্তির হাস্যময় মুখে যেমন কান্নার চোখ ফুটে ওঠে তেমনিই হেমা মালিনীর চিত্রার্পিত মুখে দেবীদুর্লভ কারুণ্য।

দুর্ভিক্ষ? অমিত চমকে ওঠে। বড় হওয়ার পর সে আর দুর্ভিক্ষের কথা ভাবে নি। ধারণা ছিল, দুর্ভিক্ষ এখন আর হয় না। ভারতবর্ষে গম চাল

না হলে অ্যামেরিকায় হবে, থাইল্যাণ্ড, বার্মায়, অষ্ট্রেলিয়ায় হবে। পৃথিবী থেকে মানুষ দুর্ভিক্ষ তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন করে আবার বুক খামচে ধরেছে একটা ভুলে যাওয়া ভয়।

পর মুহূর্তেই ভয়টা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে সে। ঐ তো মেট্রোর আলো জ্বলছে! দপদপিয়ে উঠছে নানা বিজ্ঞাপনের নিওন সাইন! কত দামী দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চারি দিকে দামাল, উত্তেজিত, আনন্দিত কলকাতা। ভিখিরির তুলনায় ভদ্রলোক বহু গুণ বেশী।

জায়গাটা পেরিয়ে যায় অমিত দুটি নয়া ছুঁড়ে দিয়ে। কুড়িয়ে নেবে তো! না কি মরে গেছে ওরা? আত্মহত্যা করে নি তো? না না, তা করেনি ঠিকই। ভিখিরিরা কতরকম অভিনয় করে তার কি শেষ আছে। এটাও একটা কায়দা!

একটু দোটানার মধ্যে থেকে ভারি মনে অমিত বাস স্টপে এসে দাঁড়ায়। বড্ড ভীড়। সে ঠিক এই সব ভিড়ে এখনো অভ্যস্ত নয়। দাঁড়িয়েই থাকে।

দুটো বাড়ন্ত যুবা কথা বলে বাসস্টপে। অমিত শোনে। একজন বলে—কলকাতায় এই যে লোকে বাসে উঠতে পারে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে অফিস টাইমে, কিংবা ঝুলে ঝুলে যায়; ঠিক সময়ে কোথাও পৌছোতে পারে না; এর জন্যই দেখিস একদিন বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। তুম্ দাম্ ভদ্রলোকে প্যাণ্ট গুটিয়ে কাছা মেরে ইট পাটকেল ছুঁড়তে লাগবে বেমক্কা, ভাঙচুর করে সব উল্টে পাল্টে দেবে একদিন।

অন্যজন হাসে।

অমিত হাসে না। তার মনে একটা ভয়ের প্রলেপ পড়ে। চারিদিকে কি যেন একটা ধনুকের টান-টান ছিলার মতো ছিঁড়বার অপেক্ষায় আছে। যেন এক্ষুনি ছিঁড়বে এবং হুড়মুড় করে পৃথিবীটা ভেঙে পড়বে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? নাকি পৃথিবী জোড়া খরা, দুর্ভিক্ষ? নাকি মহাপ্লাবন আবার? কিংবা ছুটে আসবে অন্য একটি গ্রহ পৃথিবীর দিকে যেরকম একটা গল্প সে পড়েছিল ইণ্টারমিডিয়েটের ইংরিজি র‍্যাপিডে।

রাতে শোওয়ার পর নিজস্ব মেয়ে মানুষটাকে হাঁটকায় অমিত, হাঁটকায় কিন্তু যা ভুলতে চায় ভুলতে পারে না। কিছুই ভুলতে পারে না। ইভা তার বুক থেকে অমিতের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, সারাদিন কত খাটুনি যায় বোঝ না তো, ঘুমোতে দাও।

পাশ ফিরে শোয় ইভা।

একটামাত্র মেয়েমানুষ থাকায় ঐ একটি দোষ। সে দিলে দিল, না দিলে উপোস থাকো? অমিত এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় ভেবে পেল না। লাথি মারবে? মেরে দেখেছে অমিত, লাভ হয় না। লাভ নেই। খুব রাগ হয় অমিতের, কিন্তু রাগ চেপে শুয়ে থাকে। কিন্তু তখন বুকে একটা চাপ-বাঁধা কষ্ট হতে পারে। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে গেছে খরায়। বুড়িয়ে গেছে ফসলের পর ফসলে, এবার কালো এক দুর্ভিক্ষ এসে যাবে।

সে স্বপ্নে দেখতে পায়, কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা মরা মেয়েমানুষের স্তন ঝুলে সেই মরা মাটি ছুঁয়ে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে সে। আকাশ থেকে পয়সা বৃষ্টি হচ্ছে। শুকনো পয়সা ঠন্ ঠন্ শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। কেউ কুড়িয়ে নিচ্ছে না।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাল ইভা। বলল—ফিরে শোও। বোবায় ধরেছে।

অমিত ফিরে শুল। আর তখন হঠাৎ রোগা দু'খানা হাতে তাকে কাছে টানল ইভা। চুমু খেল। বলল—এসো।

চালওলার কপালে আজও ভ্রাম্যমান কোন পুরুত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গেছে, কানে বিল্বপত্র। মুখ তুলে হাসল চালওলা।

অমিত ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে—দর কি হে?

—কমেছে। পুরো তিন। একটু নীচে দু' টাকা আশি। বলে চালওলা পাল্লা হাতে নেয়—কত দেবো?

কমেছে! কমেছে! ঠিক বিশ্বাস হয় না অমিতের।

—দশ কেজি। বলে অমিত।

চালওলা মায়া মমতা ভরে চেয়ে হাসে। বলে—এখন কমতির দিকে।

ভারি ফুর্তি লাগে অমিতের। না না, বাজে কথা ওসব। পৃথিবী জুড়ে দুর্ভিক্ষ আসছে এ কখনো হয়? চালের দাম কমে যাবে ঠিক।

অমিত হাঁটে। দু' হাতে বোঝা। কিন্তু ভারি লাগে না। আজ ইভা বেশী চাল দেখে খুশী হবে। খুব খুশী হবে।

চারদিকে কতকরকম চিহ্ন ছড়ানো দুর্ভিক্ষের আবার প্রাচুর্যেরও। মানুষ কখন কোনটা দেখে ভয় পায় কোনটা দেখে খুশী হয় তার তো কিছু ঠিক নেই।

বন্ধুর অসুখ

অনিন্দ্যর অসুখ করেছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম।

এই প্রথম ওর বাড়িতে যাওয়া। কোন নিমন্ত্রণ ছিল না। আমরা কেবল খবর পেয়েছিলাম যে, ওর অসুখ। অনিন্দ্য রোগা টিঙটিঙে, এক মাথা চুল, খুব সিগারেট খায় আর খল্‌বল্‌ করে কথা বলে। অফিসের আমরা সবাই অনিন্দ্যকে মোটামুটি পছন্দ করি, কারণ অনিন্দ্য ঝগড়া করেই ভাব করতে পারে, সকলের সঙ্গেই তার ভাব আর ঝগড়া লেগেই থাকে, রাজনীতিতে সে উগ্র, ভগবানকে সে কাছায় বাঁধে, তবু তার মন নরম, অল্পেই সে এলিয়ে পড়ে। তাকে নিজের দুঃখের কথা শুনিয়ে বড় আরাম।

তার অসুখের খবর পেয়ে আমরা চার সহকর্মী তার বাসায় যাব ঠিক করেছিলাম। আমি, সুভাষ, সমীর আর আশুতোষ। বড় দূরে অনিন্দ্যর বাসা। শিয়ালদহ থেকে রেলগাড়িতে এক ঘণ্টা তার পরেও মাইল খানেক হাঁটা পথ। রিক্সাও যায়, তবে রাস্তা খারাপ বলে ঝাঁকুনি লাগে। তাই হেঁটেই আরাম। এ সব আমাদের শোনা ছিল।

ওর অসুখের দশ দিনের দিন এক শনিবার পড়ল। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল পাঁচজন যাবো। কিন্তু শনিবার মানু এল না বলে হলাম চারজন। হাঁটা পথে বৌবাজার থেকে চাঁদা করে আপেল কিনলাম, কয়েকটা দামী কমলা, আশুতোষ কিছু ফল কিনল নিজের পয়সায়, তারপর ঘামতে ঘামতে দুর্জয় গরমে চারজনে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠলাম। ভীড়, গরম, ধাক্কা-ধাক্কি। তার মধ্যেও চারজন দলা পাকিয়ে রইলাম। মনে হচ্ছে অসুখটা ভালই পাকিয়েছে অনিন্দ্য। নইলে দশ দিনে তার হাঁফিয়ে ওঠার কথা। জর-জারি তার লেগেই থাকে, গলায় সাত আট মাস গলাবন্ধ জড়ানো টনসিল আর ফ্যারিন্‌জাইটিসের জন্য, তবু সে বাধা মানে না। অফিসে আসে, বলে—দূর, ওই অজ পাড়াগাঁয়ে কথা বলার লোক পাই না। আমি তো রবিরারেও এসে কফি হাউসে আড্ডা মেরে যাই।

কতবার তার বাড়িতে যেতে বলেছে অনিন্দ্য। যাওয়া হয়নি। শহরে আছি বারো মাস, মাঝে মাঝে বাইরে কোথাও একটু যেতে ইচ্ছে করে। জল

জঙ্গল গাঁ গ্রামের টান। অনিন্দ্যর অসুখ হল বলেই যাওয়াটা ঘটে গেল। নইলে যাব-যাচ্ছি করে আরো সময় কেটে যেতো।

তখন প্রায় পৌনে চারটে। ঘামে ভেজা জামা কাপড় নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামতেই শরীর জুড়িয়ে বাতাস দিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে মনে হচ্ছিল জায়গাটার ভাবসাব শহুরে। সেটা কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। স্টেশনের যে দিকটায় শহরের ভাব, আমাদের যেতে হল তার উল্টোদিকে, রেল লাইন পেরিয়ে। ইঁটের এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, গাছপালার ছায়ায় আচ্ছন্ন, গরুর গাড়ি আর মন্থর রিক্সা একটা দুটো চলছে। রিক্সার ওপর ঝুড়ির পাহাড়, তার উপর ঠ্যাঙ মেলে চিৎ হয়ে আছে গ্রামীণ চাষাভুষো লোক, বিড়ি টানছে। রিক্সাওয়ালা পায়ে হেঁটে গাড়ি টেনে নিচ্ছে। বোঝা যায়, স্টেশনের এ পাশ শৌখীন সওয়ারী নেই, রিক্সাও মাল পরিবহনে কাজে লাগে।

যেন অসুখ উপলক্ষ্যে নয়, বেড়াতেই এসেছি আমরা। চেঁচামেচি করে চারজন হাঁটছিলাম, হো-হো হাসি আর কলকাতার গল্প। কলকাতার বাইরে ঠিক কলকাতার মতো কিছু নেই, তাই বাইরে এলে কলকাতার লোক কেবল কলকাতার গল্প করে। গাছের নিচু ডাল থেকে লাফিয়ে পাতা ছিঁড়ে, এটা ওটা দেখার জন্য মাঝে মাঝে থেমে, পথের হদিশ জিজ্ঞেস করে আমরা হাঁটছিলাম। ফেরার খুব তাড়া ছিল না। শুনেছি দশটায় শেষ ট্রেন যায় কলকাতায়। ইচ্ছে করলে সেটাও ধরা যাবে। বাগড়া দিচ্ছিল সুভাষ, ওর একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ, আর নিম-অরাজি ছিল সমীর। আমাদের মধ্যে একমাত্র সমীরই প্রেম করে। ত্রিশ বছরে প্রেমে পড়েছিল, এখন একত্রিশ চলছে। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো টগরের জন্যই ফেরার তাড়া। সমীর বলল যে তা নয়, ওর ভাইয়ের অসুখ। এক অসুখ রেখে আর এক অসুখ দেখতে এসেছে।

গ্রামের আবহাওয়ায় এলেই আমাদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। বিশেষত আমার। ছেলেবেলার কথা আমিই প্রথম শুরু করলাম। তারপর আর কারো কথাই থামছিল না। মা বাবার গল্প, দাদু ঠাকুরমার গল্প, আদর শাসন, সস্তার দিন আর দাঙ্গা যুদ্ধ দেশভাগের আগেকার সব কথা এসে পড়ল। দূর পথ টের পেলাম না। চারদিকে কচুবন, মাঝখানে পায়ে-হাঁটা পথ, আর অদূরে বাঁশের চেঁচা-বেড়ার ঘের-দেওয়া একটা টিনের চালওলা বাড়ির সামনে একটা লোক দেখিয়ে দিল···এই বাড়ি।

উঠোনে এসে দাঁড়াতেই গ্রাম্য চেহারার দু এক জন লোক আর বৌ ঝি নানাদিক থেকে উঁকি দিল। খালি গায়ে কালো মতো একজন আধবুড়ো লোক এসে বলল —আসুন, কলকাতা থেকে আসছেন তো ?

সম্মতি জানাতেই বলল—অনু ওই ঘরে আছে।

উঠোনের চারদিকে আলাদা আলাদা ঘর, যেন শরিকানার বাড়ি। সব ঘরেরই এক-ইটের দেওয়াল, দাওয়া, আর টিনের চাল। অদূরে খড়ের গাদা, গোয়াল ঢেঁকি-ঘর, একটা টিউব-ওয়েলের হাতলের ওপর শরীরের সমস্ত চাপ দিয়ে পাম্প্‌ করতে গিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে শূন্যে উঠে হাত পা ছড়িয়ে নেমে আসছে। দেখতে দেখতে আমরা দাওয়ায় উঠলাম। ঘরের দরজা থেকেই দেখা গেল অনিন্দ্যর রোগা মুখে শেষবেলার লাল আলো এসে পড়েছে। চোখ বুজে ছিল সে। লোকটা গিয়ে তাকে ডাকল। আমরা খবর দিয়ে আসিনি, তাই আমাদের দেখে ধড়মড় করে উঠে পড়ল অনিন্দ্য, মুখে অবিশ্বাসের হাসি, চোখ উজ্জ্বল। উঠে বসে বলল—আয় রে।

বিছানায় দুজন, আর টিনের চেয়ারে দুজন বসলাম। একথা ঠিক যে এরকম পরিবেশে অনিন্দ্যকে মানায় না। অনিন্দ্য পুরোপুরি শহুরে মেজাজের, যে টেরিলিন পরে, অল্পেই ধৈর্য হারায়, চালাক সপ্রতিভভাবে চলাফেরা করে, তাকে দেখে আন্দাজ করা শক্ত যে তাদের বাড়িতে ঢেঁকি-ঘর আছে, কিংবা খড়ের গাদা। যে লোকটা আমাদের ওর কাছে নিয়ে এল তার মুখের আর চেহারার আদলের সঙ্গে অনিন্দ্যর মিল আছে। সম্ভবত ওর বাবা। সত্যি বলতে কি ওরকম বাবাও অনিন্দ্যকে মানায় না।

ঘরের আসবাপত্র ভাল নয়। যে খাটে অনিন্দ্য শুয়ে আছে একমাত্র সেই খাটটার গায়েই কিছু সেকেলে কারুকার্য, আর যা আছে তার কোনটাকেই লোক-দেখানো বলা চলে না। শস্তা একটা আলমারিতে ঠাসা বই, একটা টেবিলের ওপর পাতা খবরের কাগজের ঢাকনা, ঘরের ওধারে আর একটা চৌকীতে বিছানা গুটিয়ে রাখা, মাদুর পাতা রয়েছে, ঘরের কোণে মেটে হাঁড়ি কলসী চাল থেকে দড়িতে ঝুলছে শীতে ব্যবহার্য লেপ কাঁথার পুঁটলি ইঁদুরের ভয়ে ঝুলন্ত দড়িতে উপুড়-করা মালসা লাগানো হয়েছে। ঢুকতে না ঢুকতেই এত সব লক্ষ্য করা গেল।

অনিন্দ্য ফুল আর ফলের বাহার দেখে বলল—তোরা যে আমাকে রোমান্টিক হিরো বানিয়ে দিলি। আহা, গাড়ির ভিড়ে ফুলগুলো ডলা খেয়ে গেছে রে!

জিজ্ঞেস করলাম—তোর কী হয়েছে ?

—সে অনেক কথা। শুনবি। আগে একটু মা বাবাকে ডাকি, আলাপ পরিচয় কর, তারপর।

অনিন্দ্যের বাবা সে লোকটা নয়। তার চেহারার ধরনটা একই। আরো বুড়ো, লম্বা, রোগা, ঠোঁটে শ্বেতীর দাগ আছে একটু। প্রণাম করতে গিয়ে দেখি ঘোর গ্রীষ্মেও তাঁর পায়ে মোজা। সম্ভবত পায়েও শ্বেতী আছে। খুব কুণ্ঠিতভাবে বিড় বিড় করে কি একটু বললেন। সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, বললেন—গাড়িতে কষ্ট হয় নাই তো!......আইচ্ছা তোমরা বস, অনুর লগে গল্প কর......আইচ্ছা বেশ......বলতে বলতে ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন। অনিন্দ্য হেসে বলল—একদম গাঁইয়া রে বাবাটা।

অনুর মা উল্টোরকম। গিন্নীবান্নির মতোই মোটাসোটা চেহারা; অল্প ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েই হাসলেন, পরিষ্কার কলকাতার টানে বললেন—তোমাদের তো অনেকদিন আগেই আসার কথা ছিল। আসোনি কেন ?

প্রায় সমস্বরে বললাম—আসা হয় না। কত কাজ বাকী থাকে আমাদের। অফিস আমাদের যে কীভাবে গ্রাস করে বসে আছে।

—রাত্রে তোমরা খেয়ে যেও। আমি রান্না করছি।

সমস্বরে বললাম—তা হয় না। বাসায় আমাদের জন্য রান্না করা থাকবে, খাবার নষ্ট হবে।

হেসে বললেন—কলকাতার লোক তো রাতে রুটি খায়। আমরা ভাত খাওয়াবো। যত ইচ্ছে। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—দেখ তো, এই দুর্দিনে কী একটা রোগ বাঁধিয়ে বসে আছে। হবে না কেন! এই কটা মাত্র খায়, মরে গেলেও এক মুঠো বেশী খাবে না। জোয়ান বয়েস, এখন তেমন খোরাক না হলে কি শরীর টেঁকে! বড্ড পিটপিটে, কালো মাছ খাবে না, দুধ খেলে বমি আসে, শাকপাতা নাকি জঞ্জাল, চিঁড়ে মুড়ি ছোঁবে না, খালি পেটে কেবল অমৃত আছে ওর—চা। যত দাও খাবে। একে আমি কি করে বাঁচাব বলো তো ? মাঝখানে ধুয়ো তুলেছিল যে কলকাতায় গিয়ে মেসে থাকবে। বলো তো তাহলে ও আর বাঁচতো ? যাতায়াতের অসুবিধে হয় তা বুঝি, কিন্তু লোকে তো যাচ্ছে। তা ছাড়া এখানকার স্কুলে ওর জন্য একটা মাষ্টারিও জুটিয়েছিল ওর বাবা। অনেক বলে কয়ে। ঘরের খেয়ে চাকরি, কিন্তু তা ওর পোষাল না। এখানে নাকি লাইফ্ নেই, কেবল নাকি ঘোঁট পাকায় লোকেরা।

অনিন্দ্য ভ্রূ কুঁচকে বলল—মা, তুমি এবার কেটে পড়ো।

উনি হাসলেন—তা তো বলবিই। বন্ধুদের কাছে সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে কিনা। তারপর একটু শ্বাস ফেলে বললেন—যেদিন সত্যিই কেটে পড়ব সেদিন আর কুল পাবি না······বলতে বলতে সামলে গেলেন, আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন তোমরা বোসো, আমি চা পাঠিয়ে দিই গে। আর কি খাবে।

—কিছু না···কিছু না······

—আচ্ছা সে আমি বুঝবো। কলকাতার লোক না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। এখানে 'কিছু না' চলে না।

স্পষ্টই বোঝা যায় অনিন্দ্য তার বাবার চেয়ে মায়েরই বেশী ভক্ত। অনিন্দ্য যখন তার মায়ের দিকে তাকায় তখন তার নিজের মুখ শিশুর মতো হয়ে যায়। ওর মা চলে গেলে ঘরে একটু নিস্তব্ধতা রইল। তখন শোনা যাচ্ছিল অজস্র পাখির কিচ্ মিচ্, খড়মের শব্দ, হুঁকো টানার শব্দ, গরুর হাম্বা। কলকাতায় ঠিক ঐরকম শব্দ হামেশা শোনা যায় না। আশুতোষ সিগারেট ধরাতে খস্ করে দেশলাই জ্বালল, জ্বেলেই বলল—অনিন্দ্য, সিনিয়াররা কেউ এসে পড়বে না তো রে! দরজাটা ভেজিয়ে দেবো।

দূর! খা না। আমিও তো মার সামনেই খাই। বাবা বড় একটা আমার ঘরে আসে না। বলে হাসল—বুড়ো আমাকে খুব সমীহ করে চলে। বোধ হয় ছেলেকে খুব লায়েক ভাবে।

সমীর বলল—মাসীমাকে বলে দে যে আমরা রাতে সত্যিই খাবো না। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

অনিন্দ্য চোখ ছোটো করে বলল—টগর রাণীর হুকুম নয় তো!

—নারে। ছোটো ভাইটার টাইফয়েড।

অনিন্দ্য কনুইয়ে ভর দিয়ে টপ করে সোজা হয়ে বসল, বলল আর, আমার যে টি, বি!

আমরা সত্যিই জানতাম না। শুনে ভয়ঙ্কর চমকে গেলাম। টি, বি! পর-মুহূর্তেই মনে পড়ল আজকাল ওষুধ আছে। টি, বি, এখন আর তেমন কিছু একটা অসুখ নয়। তবু কোথাও একটু সংস্কার রয়ে গেছে। চমকে উঠি। ওর বিছানাতেই আমি বসেছিলাম। কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল। আশ্চর্য! ও কিংবা ওর বাবা মা কেউই ওর বিছানায় বসতে আমাদের নিষেধ

করেনি। অথচ করা উচিত ছিল। এখন স্বেচ্ছায় ওর বিছানা ছেড়ে অন্যত্র বসাটাও কেমন খারাপ দেখায়। তাই অস্বস্তি নিয়েই বসে রইলাম।

অনিন্দ্য হাসল—দূর! ভুম করে বলে দিলাম। ইচ্ছে ছিল অনেকক্ষণ তা দিয়ে দিয়ে জমজমাটি একটা নাটুকে সিচুয়েশন তৈরী করে তারপর রক্তাক্ত সংলাপের মতো করে কথাটা বলব। হল না। দূর!

সবাই হাসলাম। আশুতোষ বলল—এটা কবে ধরা পড়ল?
অনিন্দ্য বলল—দিন দশেক আগে, যেদিন রিপোর্ট পেলাম সেদিন থেকেই আর অফিসে যাই না।

সুভাষ বলল—চিকিৎসা কেমন চলছে?

—ঐ যেমন চলে। ঘড়ি বেঁধে খাওয়া। সকাল বিকেল হাঁটা। গুচ্ছের ফলমূল গিলতে হচ্ছে। ঠাকুর দেবতা প্রণাম করতে হচ্ছে। সকালে এসে পুরুত ঠাকুর কপালে মঙ্গল টিপ না ঘোড়ার ডিম কি পরিয়ে যান। মাইরি অসুখ বিসুখ হলে আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না।

সুভাষ বলল—এ রোগ তো আজকাল জলভাত। আমার বোনের দেওর ভুগে উঠল কিছুদিন। আগে তোর মতোই রোগা পটকা ছিল, বিয়ে হত না চেহারার জন্য। এখন তাগড়া চেহারা হয়েছে. মন-মেজাজ ভাল হয়েছে, শিগ্‌গিরই বিয়ে হয়ে যাবে।

আশুতোষ বলল—দেখিস, দু দশ বছরের মধ্যে ক্যানসারেরও ওষুধ বেরিয়ে যাবে। সায়েন্স সব পারে। তুই তো অনেকটা সেরেই গেছিস অনিন্দ্য, তোর চোখে মুখে রোগের খুব একটা ছাপ নেই।

দূর শালা। অনিন্দ্য হাসে—আমি সুস্থ থাকলেও লোকে রোগের ছাপ দেখে আমার মুখে, আর এখন তো সত্যিকারের রোগ আমার। গ্যাস দিস না। আমি খুব রোগা হয়ে গেছি, না রে রমেন?

মাথা নাড়লাম—খুব না। তারপর তো একটু খুঁতখুঁতে আছিস, একে রোগা তার চেয়ে বেশীই রোগা ভাবি নিজেকে। কাজেই তোকে বলে লাভ নেই।

অনিন্দ্য হাসে—ঠিক। আমি শালা নিজেকে নিয়ে খুব ভাবি। সারাদিনই ভাবি। নারসিসাস যাকে বলে। বোধ হয় সেইজন্যই ভোগান্তি আমাকে ছাড়ে না। সারা বছর বারোমাস কোলের পোষা বেড়ালের মতো আমার অসুখ লেগে আছে। একটু গলা ব্যথা করলেই ভাবি ক্যানসার, পেট ব্যথা করলেই

মনে ভাবি আলসার, খুক খুক কেশেই ভয় হয়, টি, বি, হ'ল না তো! ছাখ্ শেষ কালে সেই টি, বি, তো হলই। নিজেকে নিয়ে ভাবতে নেই, কি বলিস।

হাসলাম—নিজেকে নিয়ে আমরা সবাই ভাবি।

—কেন ভাবিস্?

বোধ হয় নিজেকে ভালবাসি বলে।

অনিন্দ্য চোখ বন্ধ করে ভ্রূ কুঁচকে বলে—নিজেকে ভালবেসে কি হয়! ছাখ্ আমিও অনিন্দ্য চাটুজ্জেকে ভালবাসি। কিন্তু ভেবে দেখলে সে শালা ভালবাসার উপযুক্তই নয়। স্বার্থপর, রগচটা, দাম্ভিক, অস্থিরচিত্ত—দূর, এ শালাকে ভালবেসে হবে কি! ঠিক আমার মতোই যদি আর একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত, তবে দু কথাতেই ঝগড়া লাগত, মারামারি হয়ে যেতো, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিতুম। তবে কেন নিজেকে ভালবাসি।

—নিজেকে ভালবেসে তোর এ অসুখ হয়নি। ভাল না বেসে হয়েছে। মাসীমা যে বলে গেল তুই খেতে চাস না। খালি পেটে চা খাস, অনিয়ম করিস—এগুলো নিজেকে ভালবাসার লক্ষণ নয়।

—নীতিকথা বলছিস! বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অনিন্দ্য—আসলে কি ভাবে যে ভাল থাকি তা জানিই না।

অনিন্দ্যর মা এসে বললেন—রুগীর ঘরে খেতে নেই। বারান্দায় তোমাদের জলখাবার দেওয়া হয়েছে। এসো।

গিয়ে দেখি বারান্দায় পিঁড়ি পাতা, জামবাটিতে দুধ, বেতের ধামায় মুড়ি, প্লেটে কাটা আম, কলা আর কাঁঠালের কোয়া। অনিন্দ্য ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল—আমাকে বারান্দায় একটা চেয়ার দাও। আমি ওদের খাওয়া দেখব।

সমীর আর একবার বলতে চেষ্টা করল—আমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে মাসীমা। আমার ভাইয়ের অসুখ ওরা বরং একটু থাকুক, আমি ফিরে যাই।

—কি অসুখ?

—টাইফয়েড?

আ হা! তবে ওতো আজকাল তাড়াতাড়িতেই সেরে যায়। কত ওষুধ বেরিয়েছে। আমাদের আমলের সান্নিপাতিক সারতোই না। ঠিক আছে,

আমি তোমাকে সাতটার মধ্যে খাইয়ে দেবো। সাতটা পঞ্চাশে একটা গাড়ি আছে—না রে অন্তু? সেই গাড়িতে ফিরে যেও।

বাচ্চা একটা মেয়ে আমাদের হাত পাখায় বাতাস করছিল। অনিন্দ্য তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই আমার ছোটো বোন পুটলি। দিনরাত বেড়ালছানা ছেনে বেড়ায়। কি বলে রে তোকে সবাই পুটলি!

ষষ্ঠী ঠাকরুণ। বলেই জিব কাটল।

উঠোনে অনেক কাচ্চা বাচ্চা বৌ, দু'-একজন মুনিশ। গৃহস্থের সংসার।

অনিন্দ্যর মা বলল—শান্তি পাই না বাবা। এই দুর্দিনে ছেলেটা রোগ বাঁধাল।

অনিন্দ্য হাসে—ধানের দাম পড়ে গেলে তোমাদের দুর্দিন, কিন্তু ওদের তো দুর্দিন নয়। ওসব বোলো না, ওরা বুঝবে না।

—কী যে বলিস। বলেই অনিন্দ্যর মা হেসে প্রসঙ্গ পাল্টে নিলেন—তোমরা সবাই মাংস খাবে তো!

সুভাষ আমিষ খায় না। ছেলেবেলাতে বাবা মারা গিয়েছিল, তারপর থেকে বিধবা মায়ের আওতায় ও মানুষ। মাছ মাংসর স্বাদই জানে না। সে কথা জানাতে মাসীমা বললেন—তোমাকে ছানার ডালনা খাওয়াবো।

ঠিক হল রাত সাতটা পঞ্চাশের গাড়িতেই সবাই একসঙ্গে ফিরে যাবো। হাতে সময় ছিল। আমরা পাঁচজন কাছে পিঠে একটু ঘুরে এলাম। পুরোনো মন্দির, দীঘি, বটগাছ, কিংবদন্তীর কবর—এই রকম কিছু না কিছু সব গ্রামেই থাকে। সে সব দেখা হল। ওদের বাড়ির পিছনেই পুকুর। তার বাঁধানো চাতালে বসলাম পাঁচজনে। অনিন্দ্য বলল—একটা সিগারেট খাওয়া। অসুখ হওয়ার পর খুব রেস্ট্রিক্‌শন যাচ্ছে। খেতে দেয় না। সিগারেট ধরিয়েই বলল—বোধ হয় জর আসছে রে। গা'টা ছাখ দেখি।

দেখে বললাম—একটু আছে। চল ঘরে যাই।

অনিন্দ্য মাথা নাড়ল, না থাক। একটু বসি।

গ্রীষ্মের সূর্য তখনো আকাশের প্রান্তে একটুখানি লেগে আছে। দীর্ঘ বেলা। অনিন্দ্যর রোগা মুখে আলো এসে পড়েছে। আমরা চেয়ে আছি। ও বলল—সায়েন্সের কথা কী যেন বলছিলি আশু? খুব এগিয়ে গেছে না কী যেন।

আশু হাসল—কেন শালা তুমি জান না?

—জানি, জানি আমার অসুখ সেরে যাবে, সায়েন্স আমার জন্য ওষুধ বের করেছে, সব অসুখের জন্যই করবে। তারপর হাসল অনিন্দ্য—কিন্তু আমি

শালা কোন ওষুধ বের করিনি, কারো রোগ-শোক দূর করবার কোনো যন্তর মন্তর বের করিনি। এক নম্বরের স্বার্থপর, দাম্ভিক ঝগড়াটে এই আমাকে দ্যাখ আমি কিছুই করিনি এ পর্যন্ত। আমার বাবা ক্ষেত খামার করে, জমি বাড়ায়, ধানের দাম কমলে হায় হায় করে, আমি চাকরি করি, টাকা আনি নিজের জন্য ভাবি। আমার বাবা বা আমি যে বংশ রেখে যাবো তারাও অবিকল এ রকমই কিছু করবে। সায়েন্স এগিয়ে গেল বলে আমার শালা গর্ব করার কিছু নেই। তাই না? পরের জন্য না ভাবলে সায়েন্স এগোয় না। আর আমি কেবল শালা নিজের কথা ভাবি। তোকে বলছিলাম না রমেন, নিজেকে ভালবেসে কী হয়! দূর, নিজেকে ভাল করে দেখলে ভালবাসাই যায় না। মাইরি, এ রোগটা যখন আমার সত্যিই সেরে যাবে তখন বড় লজ্জা করবে আমার।

—কি বলছিস যা তা?

—বিশ্বাস কর সত্যিই লজ্জা করবে। যার জন্য কিছু করিনি সে যদি হঠাৎ এসে আমার মস্ত উপকার করে তাহলে যে রকম লজ্জা করে ঠিক সে রকম। বুঝলি রমেন, শোধ দেওয়া না গেলে খুব লজ্জার কথা। আমি সারাদিন শুয়ে শুয়ে ভাবি আর লজ্জায় মরে যাই। মনে মনে অচেনা লোকজনের কাছে ক্ষমা চাই, বলি—দেখ আমার ভিতরে বিজ্ঞান নেই, পরোপকার নেই, সেবা নেই, ভালবাসা নেই, তবু এই আমাকে আমি সারাদিন ভেবে যাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করো।

আস্তে আস্তে বললাম—আমরা সবাই ওরকম।

—হবে। বলে চুপ করে গেল অনিন্দ্য।

আমরা উঠলাম যখন তখন অনিন্দ্যর জ্বর বেড়েছে। একটু কাশছে ও।

রাত সাতটা নাগাদ আমরা গাড়ি ধরার জন্য বেরোলাম। তখন অনিন্দ্য শুয়ে আছে ঘোরের মধ্যে। দরজা থেকেই ডেকে বললাম—চলি রে, অনিন্দ্য।

—আচ্ছা, ঘোলাটে চোখে চেয়ে ও হাসল—আবার বড় দল নিয়ে আসিস। মুর্গী খাওয়াবো। সবাইকে বলিস যে আমার ভাল হওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু সকলের জোর জবরদস্তিতে লজ্জার সঙ্গে আমি ঠিক ভাল হয়ে যাবো।

হাসলাম।

ওর কাকা লণ্ঠন ধরে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গেল।

ফেরার পথে ফাঁকা রেলগাড়ির কামরায় আমরা চার সহকর্মী বন্ধু খুব বেশী কথাবার্তা বলছিলাম না। হয়তো বেশী খাওয়ার জন্য আমাদের ঝিমুনি আসছিল। হয়তো আমরা অনিন্দ্যর কথা ভেবে বিষণ্ণ ছিলাম। কিংবা কে জানে হয়তো নিজেদের কথা ভেবেই আমরা কেন যেন শান্তি পাচ্ছিলাম না।

কয়েকজন ক্লান্ত ভাঁড়

প্রথমে ভূপতি ঢুকল। তারপর অনিমেষ। সব শেষ সুকুমার।

ভূপতির হাত সামান্য কাঁপছিল, যেন এই ঘরে ও প্রথম আসছে। ইণ্টারভিউ দেওয়ার মতো উত্তেজনা। মুখের হাসিটা ছিলই। সেটাকেই শেষ অবলম্বন করে চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে শব্দ করে হাসল ভূপতি।

অনিমেষ পর্দাটিকে অনেকটা সরিয়ে দিল যেন ওটা যে এ ঘরের আব্রু সেটা তার মনে হয়নি। ভ্রূ কুঁচকে নিজের মুখে কয়েকটা ভাবনা চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলল। ওর মনে হল ওকে দেখেই সবাই হেসে ফেলবে।

সুকুমার সবচেয়ে আস্তে ঢুকল, যেন ওর ঢোকাটা কেউ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। খুব মেপে মেপে পা ফেলল আর যতদূর সম্ভব শিরদাঁড়াকে টান রাখল। ও জানে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলে ওকে সুন্দর দেখায়।

তিনজনের কেউ আগে কেউ পেছনে দাঁড়াল। প্রত্যেকেরই নিজের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে মনোযোগ।

ঘরটা ছোট, নিখুঁত চৌকোণা। কেউ যেন খুব সাবধানে মেপে একটা সাদা পাথর খুঁজে ঘরটা তৈরী করেছে। তিনটে জানালা দিয়ে বিকেলের আলো আসছে—ঘরটা এত ছোট যে মনে হয় এত আলোর দরকার ছিল না। পাতলা মিহি সাদা গোলাপী রঙের পর্দা জানালায়। নতুন কেনা টেবিলের ওপর কিছু বই, উপহারের দোয়াতদানী, বাসী ফুল এলোমেলো, নতুন খাটের ওপর নতুন বিছানার চাদর, পাটভাঙা নতুন শাড়ী, শার্ট, সিল্কের পাঞ্জাবী এলোমেলো। একটা ছোট আলমারী আয়না দেওয়া। মেঝেতে খোলা ট্রাঙ্ক, পাশে খবরের কাগজ বিছিয়ে কেউ থাক করে লাল, হলদে এবং মিশ্রিত অদ্ভুত রঙের অনেকগুলো শাড়ী সাজিয়ে রেখেছে। যেন শাড়ীগুলো গোনা হচ্ছিল, তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে কেউ উঠে গেছে।

—এসে ডিস্টার্ব করা গেল। ভূপতি বলল। সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। অনিমেষ নিজের কাঁধ দেখছিল। সুকুমার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল যেন কেউ না ডাকলে মুখ ফেরাবে না।

—ওরা বোধ হয় বেরোতো। অনিমেষ বলল।

—বাঃ, আমাদের আসতে বলা হয়েছিল যে—সুকুমার মুখ না ফিরিয়ে ফিস ফিস করে বলে।

ভূপতি হাসে। অনিমেষ খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে পাটভাঙা নতুন শাড়ীটা সরিয়ে দিয়ে বসবে কিনা ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে চিন্তিত প্রবীণের মতো দেখায়। যেন এই ঘরের কোনো জিনিসপত্র বা বিষয়-বস্তুর ওপর তার সমর্থন নেই।

ভূপতি এই ঘরের অবস্থা দেখে মনে মনে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করে। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটাকে দেখে। নতুন চূণের গন্ধ পায়। কোরা কাপড়ের গন্ধ। ইউ-ডি-কোলোন। জানালা দরজার বার্নিশ।

—ওঃ খুব হাঁটা হয়েছে। অনিমেষ বলে।

—তোর জন্যেই তো। সুকুমার গলায় ঝাঁজ নিয়ে অনিমেষের দিকে তাকায়—আমরা একঘণ্টা আগে বেরিয়েছি। তখন ট্রামে বাসে ভীড় ছিল না।

—তোদের কি, সরকারী অফিসে কাজ করলে অফিসে ঢুকবার আগেই বেরোনো যায়।

—প্লীজ। ভূপতি বলে: সুকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে জানালার বইরে তাকায়।

—ক'দিন হল বলতে পারিস? ভূপতি থুতনির দাড়ি চুলকোলো।

—কিসের? সুকুমার মুখ ফেরায়।

—ওদের বিয়ে।

—ওঃ। সুকুমারকে নিরুৎসুক দেখায়।

অনিমেষ মনে মনে হিসেব করে।

—একমাস বোধহয়।

—কি হয়েছে! সুকুমার লাল হয়।

—বাঃ বাবা, তোর সবতাতেই লজ্জা। ভূপতি বলে,—একটু আওয়াজ দে। নইলে কখন বেরোবে ঠিক কি?

ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে রজত ঢুকল। ঢুকতে ঢুকতেই চেঁচিয়ে বলল,—এই যে, এসে গেছিস তোরা, সুকু, গৌরীপ্রসন্ন অ্যাণ্ড দি ওল্ডম্যান! বাট ইউ আর লেট্ পল্‌স্। চারটের সময় দেওয়া ছিল যে! এখন সাড়ে পাঁচ!

সুকুমার ভূপতির পাশে দাঁড়াল। ভূপতি বলল,—বেশ লোক!

অনিমেষ পকেট থেকে রুমাল বের করে বলল,—লুক হিয়ার, ইয়ংম্যান, নাউ ওয়াচ হোয়াট ইউ সে। আমরা মেহনত করে খাই—

রজত জোরে হাসল। মসৃণভাবে কামানো গাল, ফর্সা পায়জামা আর গেঞ্জীতে ওকে খুব তাজা দেখায়। হাতে নতুন ঘড়ি। বলল—সরি।

রজত দ্রুত হাতে খাটের ওপর থেকে জামাকাপড়গুলো সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে দিল। বলল,—বোস।

অনিমেষ খাটের রেলিঙে হেলান দিল। ওর পায়ের কাছে সুকুমার পা ঝুলিয়ে বসল; ও পাশের বেঞ্চিতে ভূপতি হেলান দিয়ে বসল। রজত টেবিল থেকে বই নামালো মেঝেতে। তারপর টেবিলটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে তার ওপর হাঁটু তুলে বসল।

—তারপর? রজত বলল।

—দেখতে এলাম। অনিমেষ গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে।

রজত হাসল। সুকুমার নীচের ঠোঁট কামড়াল। সিগারেটের প্যাকেট বের করল ভূপতি।

—তোদের খবর আগে বল। রজত বলে।

—নো নো। ভূপতি সিগারেট ঠোঁটে চেপে সাহেবী কায়দায় বলল!

—দেখতে এলাম। অনিমেষ তেমনি গম্ভীরভাবে বলে।

—কি? রজত বলে।

—পাখিটা আর কি ছটফট করে? উড়িবার জন্য আর কি ডানা ঝাপটায়? নড়িতে চড়িতে পায়ের শিকলটা কি ঠুন্ ঠুন্ করিয়া বাজে? উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দি পোয়েট, সেটা কি আদৌ শিকল? অনিমেষ থামে।

—আসল কথা তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা বল। ভূপতি ধোঁয়া ছাড়ল মেঝেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে।

—ইয়ার্কী করিস না, এটা কফি হাউস নয়! সুকুমার খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল।

অনিমেষ সোজা হয়ে রজতের দিকে তাকাল। রজত হাসছিল। অনিমেষ ফাঁপা গলায় বলল,—এসো রজত আমরা অ্যালায়েন্স করি। আমরা ব্যাচেলরদের সঙ্গে কোনো করুণ ব্যবহার করব না। পুওর সোল্স দে ডোণ্ট ডিজার্ভ ইট।

ভূপতি অবিচলভাবে বলল, সুকুমারের যেখানে হার্ট থাকা উচিত সেখানে একটি ভগবদ্গীতা আছে। সেই গীতাই ওকে খেলো।

—গীতা? আই সি! অনিমেষ ভ্রূ কোঁচকাল।

সুকুমার নিজের রাগ চাপা দিয়ে হাসতে চাইল। মুখ তুলে তিনজনের দিকে তাকাল। ভূপতি নির্বিকার। অনিমেষ যেন চিন্তিত। রজত হাসছে। সুকুমার লাল হয়ে হাসে।

রজত কোমরের ভাঁজ থেকে ক্যাপস্ট্যানের প্যাকেট বের করে একটা নিয়ে প্যাকেটটা তিনজনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অনিমেষ আর সুকুমার একটা করে সিগারেট নেয়। ভূপতি বলে—'থ্যাঙ্ক্স্'।

রজত সিগারেট ধরিয়ে বলল—আসলে কি জানিস ছাপা-বাঁধাই মন্দ নয়, প্রচ্ছদপটও ভালো, তবে—

—বাজে উপমা। অশ্লীল। সুকুমার বলল খুব আস্তে। ভূপতি উদাস গলায় বলল—বলে ফেল। তবে—

—তবে আগের লাভার টাভার আছে কিনা জানতে হলে পুরো উপন্যাসটা পড়তে হয়। সেটা সময়সাপেক্ষ। রজত ধোঁয়া ছেড়ে অনিমেষের দিকে তাকায়।

—আগে কহ আর। অনিমেষ বলে।

রজত হাসে,—ওল্ডম্যান, তুমি রোমান্টিক নও সুকুমারের মতো। সুকুমার অভিজ্ঞ নয় তোমার মতো। ও এখনো ছেলেমানুষ—

—হুঁ, আমাদের দায়িত্ব—অনিমেষ বলে।

ভূপতি চুপ করে ধোঁয়া ছাড়ে। সুকুমার বলল—ক্যারি অন্।

রজত সুকুমারের দিকে তাকায়,—তোমাকে নষ্ট করতে চাই না।

—তোমরা ওকে অপমান করছ। ভূপতি বলে কোনোদিকে না তাকিয়ে সুকুমার হয়ে থাকাটাই ওর ধর্ম, যেমন জলের ধর্ম তারল্য তেমনি শিশুর ধর্ম সারল্য। বিবাহিত হলে ওর ধর্ম পালটাবে, যেমন জল জমে বরফ হয় শিশু পক্ক হলে অনিমেষ কিংবা ভূপতি হয়।

ওঃ, অনিমেষ ধোঁয়া ছাড়ে,—শিশু এবং বৃদ্ধদের সামনে লজ্জা করতে নেই।

সুকুমার কথা বলল না। সন্তর্পণে সিগারেটের ছাই মেঝেতে ঝেড়ে পা দোলাতে লাগল। অনিমেষ পা ছড়িয়ে শরীরটাকে ছেড়ে দিল যেন এটা

ওর নিজের ঘর। রজত টেবিল থেকে পা নামিয়ে চটিতে পা ঢোকাল। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,—বৃদ্ধদের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। গোল দিঘীতে বিকেলবেলায় এক বুড়ো আর এক বুড়োকে নিজের দেশী ভাষায় বলছিল—'বয়সকালে আমরাও দুই চাইরটা মাইয়া নষ্ট করছি, কিন্তু রায়মশায়, এখনও যখন দেখি বয়সের মাইয়াগুলা বুকটান কইর‍্যা রাস্তা দিয়া হাঁটে তখনও ইচ্ছা করে যে—'

অনিমেষ সোজা হয়ে বসে দ্রুত প্রশ্ন করে—কি ইচ্ছে করে?

রজত হাসল,—প্লীজ, আর এগোতে পারবো না। সুকুকে কনসিডার কর।

সুকুমার হাসি চেপে গম্ভীর থাকতে চাইল। ভূপতি অবহেলায় একটু হাসল। অনিমেষ চিন্তিতভাবে গালে হাত দিল।

সুকুমার খুব আস্তে প্রায় নিশ্বাসের সঙ্গে রজতকে বলে,—তোকে দেখে মনে হচ্ছে না যে তুই সদ্য বিবাহিত!

—আ হা, আমি সদ্য বিবাহিত! রজত প্রথমে অনিমেষ তারপর ভূপতির দিকে তাকায়। হাসে হি হি করে।

—সদ্য বিবাহিত! অ্যাঁ?—অনিমেষ হাত ঘষে সিনেমার কোনো ভিলেনকে নকল করে হাসল।

ভূপতি গম্ভীরভাবে সুকুমারের দিকে তাকায়,—প্রিয় সাহিত্যিক, তোমার মন তোমার লেখনীর অনুধর্ম নয়। তুমি ভাবো এক লেখো অন্য।

—কলমের আব্রু ঘোচাও, কবি। রজত হাসে।

অনিমেষ হাতের ছোট হয়ে আসা সিগারেটের দিকে তাকিয়ে বলে,—সেই কারণেই পৃথিবীর কোনো কোনো জিনিসকে আমি ঘেন্না করি। যেমন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রেমিক, রজনীগন্ধা এবং বিলিতি কুকুর।

—যাঃ ভাল লাগে না। সুকুমার ঠোঁট বেঁকায়।

ভূপতি আর অনিমেষ দুজনে দুজনের দিকে তাকাল।

—তুই কবি। অনিমেষ বলে।

—তুই সাহিত্যিক। ভূপতি বলে।

—তুই শিল্পী।

—তুই প্রেমিক।

—তুই রজনীগন্ধা।

—তুই···

ভূপতি হঠাৎ থামে। অনিমেষের পা নাচানো বন্ধ হয়। রজত দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাই তুলে বলে—টা-ন্না-র্ড্।

—ও:। সুকুমার দূরের জানালা দিয়ে আকাশে তাকায়।

—কথাটা হচ্ছে কাওয়ার্ড্স্ ডাই মেনি টাইম্স বিফোর—ভূপতি একটু থামে। তারপর উদাস গলায় বলে—দেয়ার ডেথ্। অর্থাৎ বিবাহিত হওয়ার আগেই আমরা মনে মনে বহু বিবাহ করে থাকি। মনের হারেম কখনো শূন্য থাকে না। কবি। সেদিক দিয়ে আমরা কুলীন।

রজত খাটের তলা থেকে একটা গ্যাটাপার্চারের কালো অ্যাশট্রে বের করে সিগারেট ফেলে বলে—স্বাধীন ব্যক্তিরা কখনো অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে না। এখন অভ্যেস করতে হচ্ছে। তার মানে—

—ও: জমেছে। ভূপতি বলে। রজত বলল—তার মানে জম্ছে। আমি জমে যাচ্ছি।

সুকুমার অ্যাশট্রেটার জন্য হাত বাড়ায়।

—কেমন জম্ছে বল। অনিমেষ কৃত্রিম স্বরে বলে।

—সুপার্ব। রজত হাসল,—ও ছেলেবেলা থেকেই উত্তরপ্রদেশে। সে জন্যে কথায় একটু টান আছে, তাতে আবহাওয়াটা আরো মিষ্টি হয়।

—যথা—? ভূপতি সুর টানে।

—যেমন পড়ে গেল-কে বলে গিরে গেল 'বাসন'-কে বলে 'বর্তন', 'তুমি দুষ্টু না-বলে বলে 'তুমি দুষ্টু হচ্ছ'।

অনিমেষ বুকে হাত চেপে চাপা চীৎকার করল,—উ: তোকে চাকু মারছে।

রজত হাসে। সুকুমার মাথা ওঠায় না। ভূপতি আর একটা সিগারেট ধরায়।

রজত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—রেডি হয়ে নে। ডাকছি।

রজত ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে পর্দাটা ছুঁয়ে ফিরে তাকাল। হেসে বলল,—অন্ ইওর মার্ক্। রেডি। সুকু, স্মাইল প্লীজ, একটু চোখ তুলে তাকিও, মেয়েদের দিকে না তাকানো মানে ইনসাল্ট। তারপর অনিমেষকে বলল,—ওল্ডম্যান, তুমি সব দেখবে জানি কিন্তু কথা শুনে হেসোনা।

—সুকু হইতে সাবধান। ভূপতি বলে।

রজত হাসল,—আমি ওকে বলে রেখেছি যারা আসছে তাদের মধ্যে একজন সাহিত্যিক আছে। সেই শুনে ও ভয় পেয়েছিল। সাহিত্যকরা নাকি

ক্যামেরার চোখের মতন, ফাঁকি দেওয়া যায়না। সে জন্যেই মেয়েরা সাহিত্যিকদের ভয় পায়।

—সুকু, তোমার কেস খারাপ। অনিমেষ মাথা নাড়ল।

—বাঃ, তাতে আমার কি? সুকুমার মাথা তুলে বলে, আমি সাহিত্যিক নই, বিলিতি কুকুরও না। কেউ যদি বানিয়ে বলে—

—তুমি সাহিত্যিক নও? অনিমেষ প্রশ্ন করে।

—আমি মনে করি না। সুকুমার ঝাঁঝালো গলায় বলে।

রজত দরজার কাছ থেকে বলে—তোরা কতক্ষণ চালাবি? আবহাওয়া অনুকূল না হলে আমি সাহস পাচ্ছি না। প্লীজ্—

—আমরা একযোগে সুকুমারকে ক্ষমা করছি। অনিমেষ হাসে। ওর মুখে রাগের চিহ্ন নেই।

সুকুমার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ঠোঁট দুটো সাদা আর অল্প কাঁপছে।

—তুই রেগেছিস। অনিমেষ বলে। সুকুমার উত্তর দেয়না।

রজত পর্দা সরিয়ে ভেতরে যায়। পর্দার ওপাশ থেকে ওর গলা শোনা যায়,—অন্ ইওর মার্ক, ফেলাজ। রেডি।

—বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ। ভূপতি উত্তর দিল।

—একটা সিগারেট খা'। অনিমেষ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুকুমারের দিকে এগিয়ে দিল। সুকুমার সিগারেট নিয়ে হাসল, বলল, —ধন্যবাদ। কিন্তু খাবোনা, নট্ বিফোর লেডিজ্।

—বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ। ভূপতি আবার বলল।

অনিমেষ সুকুমারের হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা ফেরৎ নিয়ে বলল —ভূপতি, অশ্ব সংবরণ কর। ওকে রাগিও না। এই সিচুয়েশনে ওর নার্ভ্ ফেল করলে কেলেঙ্কারী। ওকে শান্ত থাকতে দাও। শান্ত হয়েও কোনো সুন্দর মেয়েমানুষের কথা ভাবুক।

—আঃ কি হচ্ছে! ভূপতি উঠে সোজা হয়ে পা নামিয়ে বলল। বলল, —ইউ আর আউট্ টু-ডে। বিনা মদেই মাতাল।

অনিমেষের মুখটা বোকা বোকা হয়ে গেল। ও সোজা হয়ে বসে পা নামালো,—কি করব? উঠে দাঁড়িয়ে বাও করব না হাতজোড় করে—

—ফুঃ—ভূপতি বলে,—তুমি বাও করবে, আমি কুর্ণিশ, আর সুকু অর্ধেক উঠে এবং অর্ধেক ব'সে ঘরেও নহে পারেও নহে গোছের মুখ করে মিষ্টি হেসে বলবে ন-ম-স্কা-র।

ভূপতি চুপ করল। অনিমেষ একটু হাসল। সুকুমার কথা বলল না। পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে চুপ করে রইল।

ঘরের কোথাও ঘড়ি ছিল না। কিন্তু সুকুমারের মনে হল কানের কাছে অবিশ্রান্তভাবে প্রতিটি সেকেণ্ড টিপ্ টিপ্ করে কলের জলের মতো বয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতঘড়িটা কানের কাছে তুলে খুব ক্ষীণ শব্দ শুনল। ভাবল প্রতিটি সেকেণ্ডই প্রয়োজন নয়। কয়েকটি সেকেণ্ড মূল্যবান কখনো কিছু ঘটলে। বাদবাকী সময় প্রতীক্ষাশূন্য, ঘটনাবিরল, অর্থহীন। এই ঘরে এমন কিছু নেই যাতে মনোযোগ দেওয়া যায়। তবে এই ঘরের ভেতরই খুব অস্পষ্ট মৃদু লয়ে কি যেন একটা বদলে যাচ্ছে কার যেন একটা রূপান্তর—

রজত ভেতরে যাওয়ার পর পাঁচ মিনিট হয়েছে। ভূপতির মনে হ'ল রজত বহুক্ষণ গত। যেন চেষ্টা করলেও রজতের মুখটা মনে আসবে না। তবু সময় স্থির হয়ে আছে। অনড়, অচল, নিষ্ঠুর। কেউ এলেও কিছু না, কেউ গেলেও কিছু না। আসলে কিছুতেই কিছু না—

সাতটা সতেরোতে একটা ট্রেন তারপর সাড়ে আটটায়। ভাবল অনিমেষ। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। এখন ছ'টা। পদ্মপাতায় পা ফেলে ফেলে আসবার মতো আস্তে আস্তে রজতের বৌ আসবে। আস্তে কথা বলবে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। অনেকক্ষণ সময়ে চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়বে আর নিজের হাতের নতুন সোনার চুড়ির শব্দ শুনবে ঠুন্ ঠুন্। ঘড়ি দেখতে ভাল লাগে না। কেমন যেন মন-খারাপ হয়। তবু সাড়ে আটটায় একটা ট্রেন, তারপর কখন কে জানে—

—রজতটা দেরি করছে। অনিমেষ বলে।

—আমাদের শুধু শুধুই আসা। আসলে - ভূপতি থামে।

—আঃ, আস্তে। পায়ের শব্দ—সুকুমার বলল।

পর্দা সরিয়ে রজত ঘরে ঢুকল—এই যে! ওঃ অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। তারপর রজত পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকিয়ে অন্তরালবর্তী কাউকে বলল —বুলা, এরা আমার বন্ধু। এসো।

একটা মোমের আলোর মতো নরম হলুদ হাত নীল পর্দাটাকে সরিয়ে দিল। সোনার চুড়ির শব্দ হল ঠুং করে। চাবির শব্দ। প্রথমে ফুলের

গন্ধের মতো একটা কোনো গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে গেল। তারপর বুলা এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। পরনে হলুদ শাড়ী হলুদ ব্লাউজ।

রজত বুলার দিকে তাকাল তারপর তিনজনের দিকে। তারপর আবার বুলার দিকে তাকাল। শেষ পর্যন্ত তিনজনের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে বল্‌ল,—এই হচ্ছে বুলা। আমার—

অনিমেষ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার বসল। ওর পায়ের চটির শব্দ হ'ল। হাত জোড় করে বলল—নমস্কার।

ভূপতি দেখল বুলা ওকে দেখছে না। বুলা কোনো দিকেই তাকিয়ে নেই। ভূপতি একটা হাত সেলামের ভঙ্গিতে মাথার কাছে তুলল তারপর কি ভেবে সেই হাতটা দিয়েই কপালটা চুলকোলো।

সুকুমার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল। মুখে কিছু বলল না। বসল।

রজত নাটকীয় ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিকে বলল,—ইনি অনিমেষ সেন

বুলা বলল,—নমস্কার।

—ইনি সুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

—নমস্কার। বুলা বলল।

—ইনি ভূপতি রায়চৌধুরী।

বুলা বলল,—নমস্কার।

—আর আমি অধম শ্রী—

বুলা বলল—থাক—চিনি—

বুলা মিষ্টি করে হাসল। যেন ও সকলের চেয়ে আলাদা। বলল,—ওর কাছে আপনাদের কথা শুনেছি। আপনাদের প্রায় চিনি।

বুলার গলায় এতটুকু জড়তা নেই, কথার টান পরিষ্কার, তবে ও 'র' কে 'ড়' উচ্চারণ করে সুকুমার লক্ষ্য করল। ওর গায়ের রঙ লালচে আভা মেশানো হলুদ। সম্ভবত ও হলুদ মেখে চান করে। হাতে মেহেদী পাতার অস্পষ্ট রঙ। আঙুল সুঠাম হাতের আঙুলের মতো সুদৃশ—সম্ভবত কথক নাচের যে কোনো মুদ্রা অনায়াসে আঙুলে ঢেউ তুলতে পারে—এমন লীলায়িত,—হাড়, বোঝা যায় না। ওর মুখ গোল, চোখ টানা, চোখের তারা একটু চঞ্চল কালো সপ্রতিভ। কপাল ছোট, মাথার চুল টান করে বাঁধা। শাড়ীর রঙ পুজোর সময়ে গ্রামে দেখা কোনো মেয়েকে মনে করিয়ে দেয়।

বুলা রজতের কাছে থেকে আলাদা হয়ে একটু দূরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওকে রজতের চেয়ে লম্বা বলে মনে হ'ল ভূপতির। সম্ভবত আলাদা করে দেখেছে বলেই এমন মনে হল। পাশাপাশি দাঁড়ালে ও রজতের কান ছাড়িয়ে যাবে না। ওর দেহ-কেপ্রায় লতার মতো বলা যায়—পেলব এবং ভারাক্রান্ত। মেয়েদের দেহের যে যে জায়গাগুলো উঁচু কিংবা নীচু বা সমতল হওয়া ভাল—ওর দেহও ঠিক তেমনভাবেই ভাল। পাতলা শাড়ীর আড়াল থেকে ওর পরিমিত স্তন কিংবা কোমর কিংবা বাহুমূলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভূপতি মাথা নামিয়ে একটা অচেনা গন্ধ পেল। কোনো ফুলের।

পদ্মের পাপড়ির মতো পাতলা পায়ের পাতা মেঝের সঙ্গে মিশে আছে, আঙুরের মতো টুসটুসে ছোট আঙুল যেন চুলের মতো সরু কাঠি দিয়ে পায়ের সঙ্গে লাগানো। পাতলা কোমল মাংস বিস্তৃত হয়ে আছে, যেন হাঁটলে শব্দ হবে না—মেঝেতে কান রাখলেও শোনা যাবে না কেউ হেঁটে যাচ্ছে। অনিমেষ ধ্বনি, কয়েকটা কথার অংশ একটু শব্দ তরঙ্গ শুনেছিল। বুলার গলায় কোনো কৃত্রিম স্বর নেই,—যেন ও কখনো অভিনয় করে নি। ওর দাঁত সুন্দর।

—আমাদের সময় হয় না। নইলে পরিচয়টা আগেই সেরে নেওয়া যেতো। ভূপতি বলল।

—বিয়ের সময়ে আপনাকে দেখেছি। কিন্তু—অনিমেষ কথা শেষ করল না!

বুলা হাসল, বলল,—বিয়ের সময়ে ভারি জবর জঙ দেখায়। আমি এমনিতে অত শাড়ী গয়না পরি·না। কেমন যেন চেনা যায় না—

সুকুমার একদৃষ্টে দেয়াল দেখছিল। ওর মুখটা কোনো অহঙ্কারী ছেলের মতো যাকে সম্প্রতি অপমান করা হয়েছে।

—বৌ আর কনেতে অনেক তফাৎ। কোন ছদ্মবেশটা ভাল কে জানে রজত জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে।

—আঃ হা—বুলা ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে গতি না থামিয়েই বলল।

—তোমরা যাদুকরী। রজত হতাশ হয়ে বসে।

বুলা হাসল। তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারা একটু বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি এক্ষুনি, দেরী হবে না—

বুলা দরজার কাছে গেল।

রজত ডাকল,—শোনো। বুলা ফিরে তাকায়। রজত আঙুল দিয়ে সুকুমারকে দেখাল—আমার সাহিত্যিক বন্ধু। সুকুমার এবং লাজুক। তোমাকে বলেছিলাম—

—ও!, বুলা হাসল যেন এর আগে ও উত্তরপ্রদেশে কোনো সাহিত্যিককে দেখে নি। ভ্রূ কোঁচকালো যেন ও এর আগে সুকুমারের কথা শুনেছে কিনা মনে করতে পারল না।

—তুমি ওর সঙ্গে ভাব জমাও। হয়ত ও কোনদিন তোমাকে নিয়ে একটু কিছু লিখবে নিদেন চার লাইনের কবিতা কিংবা রবিবারের গল্প—

সুকুমার প্রথমে হাসল, তারপর অন্য সবাই।

বুলা হাসতে হাসতেই পর্দার ও পাশে চলে গেল।

সুকুমার বলল—ইডিয়ট।

রজত হাসল,—ও অত সিরিয়াস্ নয় তোর মতো। ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

—স্টুপিড্। সুকুমার বলল।

—আঃ নন্‌সেন্স। কেমন লাগল বল। রজত হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে কোমরের ভাঁজ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাকাল।

—ইউ আর এ লাকি ডগ। অনিমেষ হাত বাড়াল,—কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্।

—থ্যাঙ্কস্। রজত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে।

—কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্—ভূপতি অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলে।

—তোর—? রজত সুকুমারের দিকে তাকায়।

সুকুমার ঠোঁট চেপে হাসে। বলে,—নির্জন দ্বীপে নির্বাসিতা করুণ কোনো মহিলার মতো। কোনো পুরুষের সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে।

—অ্যাঁ? মস্ত বড় হাঁ করল অনিমেষ।

—দি বেষ্ট কম্‌প্লিমেণ্ট্। থ্যাঙ্কস্—রজত জোরে শ্বাস টেনে হাসতে হাসতে হাত বাড়াল,—ওকে বলব।

—কবি, আমরা পরাভূত। ভূপতি বলে। তারপর হাসতে থাকে।

—ইউ উইন্ দি রেস্। অশোক বনে সীতার ইমেজ—ভাবা যায়না। অনিমেষ জোরে হাসে। সুকুমার মুখ নামায়।

তিন জনের হাসির শব্দ।

তারপর বুলা মাত্র একবার এই ঘরে এল। চা নিয়ে, সঙ্গে খাবারের প্লেট হাতে বাচ্চা চাকর। কয়েকটি মামুলী কথা, কিছু ওজর আপত্তি। এবং

তারপর একসময়ে ওরা তিনজন উঠে দাঁড়াল। ভূপতি হাতজোড় করে বলল, —আজ চলি বৌদি. আর কোনো সময়ে আবার দেখা হবে।

—আজ গৃহিণীপনা দেখে গেলাম। আমরা অতিথিরা তুষ্ট। অনিমেষ কপালে হাত ছোঁয়াল।

সুকুমার হাতজোড় করে বলল,—আমি সত্যিই লিখি না। ওরা বানিয়ে বলে—

—তাতো বলেই। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। বুলা হাসতে হাসতে বলল, যেন কোনো বাচ্চা ছেলেকে ভোলাচ্ছে! ওর গলা চতুর শোনালো।

অনিমেষ রজতের দিকে তাকাল—দেখছো রজত। কপালে কত অপবাদ লেখা আছে।

রজত বেরোবে বলে ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে নিচ্ছিল। প্যান্টের শেষ বোতামটা আটকানো আছে কিনা দেখে নিয়ে বলল,—দেখছি। স্থকুর দিন—

ওরা দরজার কাছে এগিয়ে একবার ঘাড় ফেরালো।

—আবার আসবেন।

—আসবো নিশ্চয়ই। বাঃ—

—আসবো—সময় পেলে—

—মনে থাকে যেন—

—দেখবেন রজত তো দূরের কেউ না—

—আচ্ছা. দেখব কেমন—

—এরপর তাড়াতে চাইবেন কিন্তু—

—ইস। দেখা যাক।

—আজ যাই—

—চলি—

—দেখবেন, সিঁড়িটা যা অন্ধকার—

—যেতে পারবো—

—সাবধানে যেও—

—হুঁ

—চলি—

—আচ্ছা

—চললাম—

—আ-চ্ছা।

পর্দা সরানোর শব্দ। জুতোর শব্দ। সিঁড়িতে।

ওরা চারজন রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

—কোথায় যাওয়া যায়? রজত বলল।

—কফি হাউস। সুকুমার খুব আস্তে বলল।

—ওঃ—অনিমেষ ঠোঁট ওলটাল,—সেই ছবি আঁকা, সেই কবিতা লেখা, সেই নতুন রীতির গল্প—

—সেই কাফ্‌কা-কামু-জয়েস-মান-রিল্কে। ভূপতি বলে—

—সেই বোদলেয়ার-এলুয়ার-লোরকা-পাউণ্ড—

—সেই গর্গ্যা-গম্যা-গঁগ-সেজাঁ-পিকাসো—

—এবং রবীন্দ্রনাথ—

এবং সিগারেটের ধোঁয়া, কয়েকটি শুকনো ছেলে, কিছু বাসী মেয়ে—

—হরিবল্।

—তবে কোথায় যাওয়া যায়? রজত আবার প্রশ্ন করল।

সুকুমার দাঁত দিয়ে নোখ কাটতে কাটতে বলল,—কফি হাউসে এখন ভীড় নেই।

—দূর। ভূপতি বলে।

—শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। একটু তাজা হওয়া দরকার। অনিমেষ বলে।

—আমারও গলাটা খুশখুশ—কেমন ব্যথা। ক'দিন রাত জেগে,—রজত গলায় হাত দিয়ে বলল।

—হুঁ, সন্ধ্যেটা মাটি না করে—ভূপতি রজতের দিকে তাকাল তারপর সুকুমারের দিকে।

—তবে যাওয়া যাক। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ না এস্‌প্ল্যানেড—রজত বলে।

—কিন্তু সুকু—ভূপতি প্রশ্ন করে!

—তোমরা যাও। আমি ওর মধ্যে নেই। সুকুমার এক পা পিছু হটল।

—পাগল, রজত হাত বাড়িয়ে সুকুমারের জামাটা ধরল, সুকুও সঙ্গে যাবে। ও লাইম্ জুস্ খাবে—আমরা খাবো জিন্ উইথ ফ্রেস্ লাইম্—কেমন জুঁইফুলের গন্ধ,—বিয়ার দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?

—নট এ ব্যাড্ আইডিয়া—অনিমেষ বলল,—আমার ট্রেন সাড়ে আটটায়। বেশী খাবো না, বৌ মুখে গন্ধ টন্ধ পেলে—

—বৌ একটা আমারও আছে, অত ঘাবড়ায় না—ভূপতি বলে।

—সে সব কথা থাক, এখন কোথায় যাওয়া যায়? রজত সুকুমারের জামাটা ধরে থেকেই বলে।

—যেটা কাছে হয়। তাড়াতাড়ি অনিমেষ বলে।

—কিন্তু সুকু? ভূপতি বলে।

—এবং সুকু? অনিমেষ বলে।

সুকু যাবে। রজত হাসল,—ওকে পাকানো দরকার।

—পাকাতে হলে ওর বিয়ে দাও। মদ খেয়ে ছেলেরা পাকে না। ভূপতি বলে গম্ভীরভাবে।

—হুঁ ওর বিয়ে দাও। ওর দরকার—অনিমেষ বলে।

—হুঁ বয়স হয়ে যাওয়ার আগেই বিয়ে দাও। ভূপতি বলে।

—কেন না,—অনিমেষ বলে,—বৃদ্ধ বয়সে বিবাহে বিবিধ বাধা।

সকলে জোরে হাসল। তারপর চলতে লাগল। সুকুমারের একটা হাত রজতের হাতে, অন্যটা ধরল অনিমেষ। ভূপতি ওদের পেছনে।

ঘরের ভেতর ঘর। ছোট্ট পার্টিশান দেয়া। কাঠের দেওয়াল বার্নিশ না করা, পুরোনো রঙ! গোপন নির্জন। টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার। ঠিক চারটে চেয়ার, যেন কথা ছিল ওরা চারজনেই আসবে। বেশী না, কম না। যেন কথা দেওয়া ছিল যে আমরা আসব, সুকুমার ভাবল—চার জনের জন্য চারটে চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল, দাগ ধরা নোংরা সাদা টেবিলক্লথ যার ওপর আমরা হাত এবং হাতের ওপর কখনো মুখ রাখব—তারা অপেক্ষা করছিল। সব টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার থাকে না—চেয়ারের সংখ্যা কখনো বাড়ে কমে। কিন্তু সাধারণত চারটে চেয়ারই থাকে যেন কারো তিনজনের বেশী সঙ্গী থাকা ভাল নয়। যদি আসতে চাও তিন জনকে নিয়ে এসো—যে কোনো তিনজন কিন্তু তিনজন। বেশী না, কম না।

চেয়ারের শব্দ হল। ওরা বসল। পর্দা সরিয়ে একজন বেয়ারার মুখ উঁকি দিল। ওর মুখটা কালো, নির্বিকার এবং বৈশিষ্ট্যহীন। একটু যান্ত্রিক হাসি ঠোঁটে।

—জী সাব? বেয়ারা বলল।

—দুটো বিয়ার—বেশ ঠাণ্ডা দেখে। চারটে গ্লাস রজত বলে।

—আউর? বেয়ারা প্রশ্ন করে। রজত বিয়ারের নাম বলল।

পরে আরো বলছি। রজত বসে। বেয়ারা চলে গেল। পর্দাটা আবার নিভাঁজ!

চারদিকে পার্টিশানের ও পাশে বিচিত্র শব্দ হচ্ছে। কখনো হাসির টুকরো, কথার বা কাচের শব্দ। এ ঘরটা নিঃশব্দ। ভূপতি রুমাল বের করে মুখ মুছল। অনিমেষ টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে বাজাল, সুকুমারের হাত ওর কোলে, রজত চুপচাপ মেনুটার দিকে চোখ রাখে।

—আমি কিন্তু খাব না। সুকুমার বলে।

—ওঃ, একটু—প্লীজ, আমার বৌ-এর স্বাস্থ্য পান করব—রজত হাসল।

—তোর ভাবনা কি,—অনিমেষ বলল সুকুমারকে,—তুই তো মেস্-এ থাকিস। কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

—আর তোর তো নতুন কিংবা পুরোনো কোনো বউ নেই,—ভূপতি বলে, —তোর চিন্তা কি?

—কিন্তু,—সুকুমারকে চিন্তিত দেখায়,—লজ্জা কিংবা ভয় করছে। কেমন অপরাধবোধ—

—কেন? রজত প্রশ্ন করে।

—বেয়ারাটার মুখটা আমার চেনা-চেনা। ঠিক আমার জ্যাঠামশাইয়ের মতো মুখ—কেমন যেন লাগে। অস্বস্তি—

ভূপতি আর অনিমেষ শব্দ করে হাসে। অনিমেষ হাসি চাপতে কুঁকড়ে যায়। রজত স্থির থাকে।

—এ রকম হয়, রজত বলে—এটা কোনো পাপ নয়।

—আঃ জ্যাঠামশাই—ভূপতি বলে!

—দ্যাটস্ এ প্রবলেম্—অনিমেষ হাসে।

—আঃ, জ্যাঠামশাই মদ সার্ভ করছে,—এ সুপারফিসিয়াল ইমেজ। ভূপতি চোখ বন্ধ করে বলল।

বেয়ারা ঘরে ঢুকল। চারটে গ্লাশ রেখে বিয়ার ভাগ করে দিল। দুটো প্লেটে চাক চাক করে কাটা শসা, পেঁয়াজ আস্ত পাঁপর ভাজা।

—খুব ফেনা—সুকুমার বলে।

বেশ ঠাণ্ডা। খা—রজত বলে।

—আঃ—চুমুক দিয়ে অনিমেষ বলে।

—এই সময়ে সুকুর একটা কবিতা শুনতে বেশ লাগত। ভূপতি সিগারেট ধরিয়ে বলে।

—বেশ, তাই হোক,—রজত হাসে।

—জমবে। হুঁ—অনিমেষ ঠোঁটের কাছে গ্রাশ তোলে।

—দূর—সুকুমার বিয়ারের রঙটার দিকে চোখ রাখে।

—প্লীজ,···ভূপতি বলে, তোর সেই কবিতাটা—

কোনটা ?

—যেটা রজতের বৌকে শোনাবি বলে লিখেছিলি। তোর পকেটে ছিল তুই লজ্জা পাবি বলে আমি চেপে গেছি। ভূপতি আন্তরিকভাবে চাপা সুরে বলে।

—ওঃ! অনিমেষ বলে।

—বোঝা গেল রজত হাসল,—বেশ, এবার পড়ো, পড়তেই হবে।

সুকুমার ভূপতি পাশাপাশি! মুখোমুখি রজত অনিমেষ দাঁড়িয়ে উঠে সুকুমারের পকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে,—বের করো।

সুকুমার চেয়ার শুদ্ধ পেছনে হেলল,—যাঃ এটা কবিতা পড়ার জায়গা নয়, কে কখন উঁকি মারবে।

—বয়ে গেল—রজত ঠোঁট ওলটায়।

—পড়তেই হবে,—অনিমেষ বলে, আমাদের দাবী—

মানতে হবে.—ভূপতি হাসল। হেসে সুকুমারের কাঁধে হাত রাখল।

পকেট থেকে নিঃশব্দে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল সুকুমার। ভাঁজ খুলে তিনজনের দিকে তাকাল। হাসল।

না, বসে বসে চলবে না,—অনিমেষ বলে,—উঠে দাঁড়াও।

—যাঃ এটা নাটক করবার জায়গা নয় সুকুমার বলল।

—আঃ এটা পরেশনাথের মন্দিরও নয়। মদের দোকানের লোকেরা। ন্যাংটো মেয়ের নাচও দেখে। অনিমেষ বলে।

—লজ্জা কি ? দাঁড়ানা—রজত হাই তোলে।

—দাঁড়া। কিছু হবে না—ভূপতি হাসে।

সুকুমার উঠে দাঁড়ায়।

—অ্যাটেনশন প্লীজ। সুকু, জ্যাঠামশাই উঁকি মারলে ঘাবড়ে যেওনা;
—অনিমেষ বলল।

সুকুমারের মুখটা সম্পূর্ণ লাল। ও তিনজনের দিকে তাকায়। অল্প আলোয় তিনজনের মুখ ঝাপসা-ঝাপসা ওয়াশ-এর ছবির মতন। সুকুমার একটু কেশে বলল—কবিতার নাম 'বন্ধুরা প্রবীণ হলে'।

তিনজন টেবিলের ওপর ঝুঁকল।

সুকুমার পড়ল,—বন্ধুরা প্রবীণ হ'ল,

বন্ধুপত্নী হ'ল চৌকীদার,
সাতটায় বাড়ী ফিরে চলো,
না হলে ঘরের বন্ধ দ্বার।

অনিমেষ টেবিলে হাত চাপড়ে বলল,—ই-উ-নিক।

—ওকে পড়তে দে—ভূপতি সিগারেটে টান দেয়। রজত চুপ।

সুকুমার পড়ল,—এতদিন কাফে রেস্তোরাঁয়

ভ্রমর করিত গুঞ্জন—
যে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়···

অনিমেষ অস্ফুট করে বলল—যে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়—

রজত চোখ বুজে হেলান দিয়ে হাসল—চমৎকার! যে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়। আবার পড়ো, কবি।

সুকুমার পড়ল,—যে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়

সে স্বর্গ এখন গৃহকোণ!

যে স্বর্গ-সুষমায়···এখন গৃহকোণ অনিমেষ আবৃত্তি ক'রে হাসতে হাসতে বলল—তুলনা নেই—

আস্তে। রজত বলে পড়তে দাও।

সুকুমার হাতের কাগজ থেকে চোখ ওঠাল। পর্দা সরিয়ে বেয়ারা উঁকি দিল। বলল,—আউর কুছ, সাব?

—ওঃ, রজত সোজা হয়ে বসে বলল, চারটে ড্রাই জিন আর ক্রেস লাইম।

বেয়ারা চলে গেল।

—পড়। ভূপতি বলে।

সুকুমার পড়ল—বালিশের ওয়াড়ে নাম লিখে

বন্ধুপত্নী অবসর পেলে,
বন্ধুর পুঁজির নিরীখে
অসামান্য প্রেম দেন ঢেলে।

—আঃ, তুমি একজন পেসিমিস্ট, কবি। অনিমেষ চোখ বুজে বলে।

—পড়তে দাও। রজত বলে।

সুকুমার পড়ল,—বন্ধু তাতেই খুশী হয়ে
দুই হাতে পেয়ে যান চাঁদ।

—কবি, ইউ আর ক্রুয়েল্। দাউ স্ট্রিকেথ এ ড্যাগার ইন্ মি—

আঃ ক্লান্ত কোরানো—ভূপতি বলে।

—তারপর? রজত প্রশ্ন করে।

সুকুমার পড়ল, বন্ধুরা প্রবীণ ঘুঘু সব,
বন্ধুপত্নী ঘুঘুধরা ফাঁদ।

সুকুমার প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বসল। ওর মুখটা লাল।

—কংগ্র্যাচুলেশ্‌সন্—অনিমেষ সুকুমারের দিকে হাত বাড়ায়। সুকুমার একহাত দিয়ে ওর হাত ধরল, অন্য হাতে বিয়ারের গ্লাসটা তুলে নিঃশেষ করল।

—হুঁ—রজত তেমনি চোখ বুজে হেলান দিয়ে বলে—তোর আর একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে। 'চরিত্রগুণ মানিব্যাগে থাকে, জীবনটা অতি বাহ্য। মাথার খোঁপাটি খোঁপার মালাটি সবই তো চিতায় দাহ্য।' রজত একটু হাসে।

—এ হ্যাণ্ডসাম পোয়েট। ভূপতি বলে।

—ওঃ—অনিমেষ বলে।

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। ভূপতি রজতের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল,—তুমি সুকুমারের কবিতার স্টেট্‌মেণ্ট বিশ্বাস কর? তোমার মুখ থেকে শোনা যাক—যেটা সত্যি কথা। যা রিয়্যাল—

—ওয়েল—রজত হাসল।

—না, বল। ইউ হ্যাভ টু সে—ভূপতি উত্তেজিতভাবে বলল।

বেয়ারা পর্দা সরিয়ে এল। করিডোরের উজ্জ্বল আলোর একটু আভাস ঘরে ঢুকল। চারটে গ্লাশ সাজিয়ে রেখে বেয়ারা বেরিয়ে গেল। চারটে গ্লাশ, প্লেটের ওপর কাটা লেবুর টুকরো, চামচ। জুঁই ফুলের গন্ধ।

—তুমি আনরিয়্যাল—ভূপতি সুকুমারকে বলল।

একটু আগে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ার জন্য সুকমার লজ্জিত ছিল। এখন মুখ তুলল—বলল,—রিয়্যালিটি অনেকটা নগ্নতার মতো অশ্লীল। আমি ইমাজিনেশন দিয়ে তাকে এড়িয়ে যাই—

—কত আর পালাবে? ভূপতি প্রশ্ন করে।

—হুঁ, মনের দিক দিয়ে তোমার ন্যাংটো হওয়া দরকার। অনিমেষ বলে।

—কমপ্লিট্‌লি নেকেড। ভূপতি রজতের দিকে তাকায়।

—বেশ,—সুকুমার বলে,—রজতকে বলতে দাও।

রজত জোরে হাসল,—নেভার বিন্‌ ইন্‌ সাচ এ জ্যাম্‌ বিফোর।

—অর্থাৎ? অনিমেষ প্রশ্ন করে।

—আমি অত ভাবি না—রজত সিগারেট ধরিয়ে বলে। ওর কথা অল্প এড়িয়ে যাচ্ছে।

—সুকু কবিতা লিখে আমাদের—অর্থাৎ আমরা যারা বিবাহোত্তর জীবনে প্রেম-বিবর্জিত এবং যারা অসামান্য প্রেমের জন্য উদ্বাহু বামন এবং যারা কোনো মহিলার,—এটুকু বলে অনিমেষ হিহি করে হাসল যেন ওর ইতিমধ্যেই নেশা হয়েছে, তারপর সামনে ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল,—যারা কোন মহিলার নগ্নতায় অভিজ্ঞ, তাদের গাল দিয়েছে। নাউ প্লীজ ডিফেণ্ড। বস্তুত ও খোঁপা, খোঁপার মালা এবং চিতার সংযোগে কি বোঝাতে চায় জানিনা।

—আমি নিজের অভিজ্ঞতাকে জানি,—রজত অস্বাভাবিকভাবে হেসে বলল,—সেটা কিছুটা রিয়্যাল কিছুটা আনরিয়্যাল। যদি শুনতে চাও—

—অফকোর্স, শুনব। বল—ভূপতি গ্লাশ তুলে চুমুক দেয়।

—বলব, তোমাদের কাছে বলব—রজত মাতালের মতো হাসল,—ওল্ডম্যান, ছেলেবেলা থেকেই আমার নগ্নতার সাধ। যা অনেকের কাছে বলা যায় না, ভেবেছিলাম তা বুলার কাছে বলা যায় না। যা বলতে চাই তাই সাজিয়ে বলা হয়ে যায়—

—ওটা স্বাভাবিক,—সুকুমার ভীত গলায় বলল গ্লাশের দিকে তাকিয়ে,—কিন্তু আমি আর শুনতে চাই না, আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে—

—আঃ,—অনিমেষ প্রায় ধমক দিল,—রজতকে বলতে দাও।

—রজতকে বলতে দাও,—ভূপতি মাথা নাড়ল,—আমরা ওল্ড ফসিল। ওর নিউ ব্লাড।

রজত শুরু করল। প্রথমে আড়ষ্ট। আস্তে আস্তে বলল...হুঁ, তারপর মনে হল আমি একজন ভিলেন। তদুপরি অন্ধকার আমাকে সাহস দিচ্ছিল।

কিন্তু ওর চোখ দুটো আধ-বোজা চোখ দুটো বাতি জ্বেলে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু লজ্জা—সেটা প্রথম দিন। তোমরা জানো···কী গভীর ঘন শ্বাস যেন স্পর্শ করা যায়···

আঃ, প্লীজ প্লীজ—সুকুমার হাত বাড়িয়ে রজতকে ছুঁল।

রজত হাসল। তারপর গ্লাশে চুমুক দিয়ে ভাবল আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছে। গ্লাশটা নিঃশেষ করে রজত বুলার দেহের কয়েকটি বিচিত্র কারুকার্যের উপমা দিল।

—রজত! সুকুমার বলল। রজত ওর হাত সরিয়ে দেয়।

—আমাকে ন্যাংটো হতে দাও—রজত হাসল।

ওরা ভেবেছিল রজত থামবে। ভূপতি আর অনিমেষ বোকার মতো হাসল।

রজত বেছে বেছে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ জিভে তুলে আনল। রজত বলতে লাগল এমনভাবে যেন বুলা ওর কেউ নয়।

সুকুমারের দুটো কান ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পেল। ওর চোখের সামনে বুলার ছবিটাকে যেন দু'হাতে নাড়া দিল রজত। সুকুমার ভাবল ওর যেন নেশা হয়েছে। রজত থামল না—

সুকুমার উত্তেজিত হয়ে বলল,—প্লীজ—প্লীজ, আমাকে একা হতে দাও, অনি—ভূপতি—প্লীজ—

—ইউ মাস্ট স্টপ। অনিমেষকে কেমন গভীর দেখাল।

—ইউ আর আউট—আউট-টু-ডে। ভূপতি চেয়ারের শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়ে রজতের কাঁধে হাত রাখে,—বি সিরিয়াস,—আমরা—

রজত হাসল,—আঃ—

—না, আর নয়—অনিমেষ বলল,—আর শুনতে চাইনা।

বেয়ারা উঁকি দিল। বলল—সা'ব?

—ড্রিঙ্কস্,—রজত হাসল,—চারটে হুইস্কি কিংবা রাম—

বেয়ারা মাথা নাড়ল,—দশটার পর ড্রিঙ্কস্ বন্ধ—

—ওঃ—রজত মার-খাওয়া বোকা ছেলের মতো অসহায়ভাবে তাকাল।

—কিছু চাই না,—সুকুমার বেয়ারাটকে—যার মুখ ওর জ্যাঠামশাইয়ের মতো, তাকে বলল।

বেয়ারা পর্দা নামালো, চলে গেল।

—আমরা এবার যাবো,—অনিমেষের মুখ চিন্তিত দেখায় যেন কোনো আকস্মিক আঘাতে নেশা কেটে যাওয়ার পর ও এখন ট্রেনের কথা ভাবছে!

—তার মানে—তা'হলে,—রজত সম্পূর্ণ মাতালের মতো হেসে বলল। তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

—তা হলে? ভূপতি প্রশ্ন করে।

রজত উঠে দাঁড়িয়ে এমন বোকার মতো হাসল যে মনে হল তাকে কেউ অন্যায়ভাবে অপমান করেছে। হাসিটা মুখে রেখে বলল,—তাহলে স্বীকার করতে হবে সুকুমারের কবিতাটা মন্দ হয়নি,—আর—

সুকুমার আর অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে কি করতে হবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রজত আবার বোকার মতো হাসল সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে টাল খেতে খেতে বলল,—আর তার মানে, আমাদের কারুর নিষ্পাপ নগ্ন মন নেই। নিষ্পাপ এবং নগ্ন—নেই—নেই—

বলতে বলতে ও দাঁড়াবার জন্য টেবিলের ওপর হাতের ভর দিয়ে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করে আবার বসে পড়ল। বলল,—তা হ'লে সুকুমারের কবিতাটা মন্দ হয়নি—। ও ক্লান্তভাবে হেলান দিল। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকে যেন ওরা খুব অবাক হয়েছে।

রজতের মনে হল, কেউ ধরে না নিয়ে গেলে ওর পক্ষে বাড়ি যাওয়া অসম্ভব।

ছবি

পলাশের ঘরে দুটো বড় জানালা, পুবের জানালা দিয়ে দেখা যায় উঁচু রেল-লাইন, মাথার উপর ইলেকট্রিকের তার, সন্ধ্যেবেলায় প্ল্যাটফর্মে নিয়নের আলো জ্বললে স্টেশনের পাশের নোংরা পুকুরটায় অদ্ভুত সুন্দর ছায়াছবি দেখা যায়, জাতীয় সড়ক রেল-লাইন ভেদ করে চলে গেছে, সেই সুন্দর রাস্তার দু-পাশে ইঁটের খাঁচায় যত্নে লালিত হয়েছে গাছের চারা। একদিন জাতীয় সড়ক আরো সুন্দর হবে। এখনো ছোট্ট স্টেশনটায় দূরপাল্লার ট্রেন থামে না। না থামুক, কিন্তু জনবসতি বাড়ছে আশে-পাশে। স্টেশনটা ক্রমশ হয়ে উঠছে জমজমাট। জাতীয় সড়কের দুধারে উঠছে বাড়ি, দোকানপাট, পেট্রোল-পাম্প, পুবের জানালা খুললে পলাশ তাই সভ্যতার অগ্রগতির চিহ্নগুলো দেখতে পায়।

আশ্চর্য এই, পশ্চিমের জানালার ঠিক বিপরীতে একটি ছবি টাঙানো। এদিকে ঘুরঘেের খাটাল, প্রকাণ্ড চাতাল জুড়ে গোবরের কালচে রং, অনেক গাছ-গাছালির ছায়ায় গরুমোষের জলপাত্র, খাবারের চারি। কচুপাতার জঙ্গল, কাঁটাগাছের হলুদ ফুলে চারিদিকে আকীর্ণ, মাঝে মাঝে জলঢোঁড়া বা হেলে সাপ ব্যাং ধরলে মর্মান্তিক শব্দ ভেসে আসে। সন্ধ্যের পর টেমি হাতে ঘুরঘের বাড়ির লোক উঠোনে ঘোরে। রাতে গরুমোষের দাপানোর শব্দ পাওয়া যায়। মানু পশ্চিমের জানালাটা তাই সহজে খুলতে চায় না। বলে—মাগো, কী বিশ্রী গন্ধ! যা মশা!

পলাশ মানুর সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করার সুযোগ পায় না। তার সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। গতবছরও ছিল একটা বড় কাগজের প্রেস ফটোগ্রাফার, বেশ নাম করেছিল পলাশ। তার দু একটা স্টিল ছবি প্রাইজও পায়। একটা ছবি ছিল এইরকম—খুব বৃষ্টির মধ্যে আবছা একটা গোলপোস্টের সমকোণ দেখা যাচ্ছে, পেছন দিকটা ওয়াশ-এর ছবির মত ধোঁয়াটে, সেই ধোঁয়াটে রহস্যময় পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বয়স্ক এক গোলকীপার, কালো পুরোহাতার জামা গায়ে, হাতে কালো দস্তানা, পায়ে হোস, বুট। সে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, তার সামনে একটা সাদা বল পড়ে আছে। বলটার দিকে তার বাড়ানো হাত, আর মুখে সীমাহীন ক্লান্তি। এই ছবি। ছবিটায় কিছু নেই,

কিন্তু তবু একটি মানুষের সারাজীবনের লড়াইয়ের গল্পটি যেন বলা আছে পলাশের এই ছবি অনেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে একদিন। এইসব ছবি তুলেছিল পলাশ, আর তুলেছিল কিছু বিপজ্জনক ছবি। পুলিসের লাঠি-গুলির ছবি নেতাদের অবসর মুহূর্তের ছবি। দুর্ঘটনার ছবি। ছবির চোখ ছিল বটে পলাশের। কাগজের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল ভালই। কিন্তু অতিরিক্ত স্পর্শকাতর লোকেরা চাকরি টিকিয়ে রাখতে পারে না। পলাশ গতবছর চাকরিটা ছেড়েছে। মানু তার স্বামী সম্বন্ধে যখন আশাবাদী হয়ে উঠেছিল ঠিক তখনই এই অঘটন। ভারী হতাশ হয়ে মানু বলেছিল—

—চাকরিটা ছেড়ে দিলে? এখন কী হবে?

—চাকরিটা করা যাচ্ছে না মানু। আমি ছবি তুলি, সেই ছবিগুলো লোকে দেখুক আমি তাই চাই। কিন্তু ওরা ছাপছে না। ছবিগুলো ওদের পলিসির উল্টোদিকে যাচ্ছে।

মানু সব কথা বোঝে না। সে কেবল বোঝে কিছু ছবি ছাপা হয়, কিছু হয় না। যেগুলো ছাপা হয় না সেগুলো হতে নেই বলেই হয় না, সব ছবি কি ছাপা হতে আছে? মা গো! পলাপ বিয়ের পর মানুর অনেক ছবি তুলেছিল, তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল যাতে মানুর গায়ে একবিন্দু পোশাক নেই। কখনো বনদেবী, কখনো বা ভেনাস সাজিয়েছিল তাকে পলাশ। সে সব ছবি কি তারা দুজন ছাড়া আর কারো দেখতে আছে? তবে!

পলাশ বড় একগুঁয়ে। সে বাড়িতে ফিরে তার ক্যামেরা খুলে ফিল্ম বের করে। বাথরুমের পাশের ছোট্ট ঘরটা ডার্করুম করেছে সে। সেইখানে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। তারপর একদিন ছবিগুলো বের করে এনে বিছানার ওপর তাসের মত বিছিয়ে দেয় সে। কখনো কাছ থেকে, কখনো দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলো দেখে। একা একা কথা বলে তখন। সেইসব ছবি অনেক দেখেছে মানু। পলাশ মগ্ন হয়ে নিজের তোলা ছবি থেকে চোখ তুলে কখনো কখনো অচেনা মানুষকে দেখার চোখে মানুকে দেখেছে। অন্যমনে বলেছে—ছাখো, ছাখো তো—এ সবই কি এই দেশের সত্য ছবি নয়?

হবেও বা, মানু অত জানে না, শেষ দিকে পলাশের তোলা বেশীর ভাগ ছবিই চচ হয়ে যাচ্ছিল। ছাপা হচ্ছিল না। কিন্তু তাতে কী? স্থায়ী চাকরির মাইনেটা পলাশ পেয়ে যাচ্ছিল ঠিকই। কোন গোলমাল ছিল না সেখানে। কিন্তু চাকরির চেয়ে ছবির নেশা পলাশের অনেক বেশী।

—এই সবই এই দেশের সত্য ছবি। মান্নু, খবরের কাজের জন্য শিল্প নয়। তার ছবি আলাদা। আমি থাকতে পারব না।

মান্নু চমকে বলেছে—তা কেন? চাকরি চাকরিই, তোমার ছবি তুমি তুলে বেড়াও না। কে দেখতে যাচ্ছে?

পলাশ মাথা নেড়েছে—আমি বুঝতে পারছি, চাকরি ছাড়লেই আমি এক বিশাল ছবির রাজ্যে চলে যেতে পারব। ছবি ছাড়া আমি যে আর কিছু বুঝি না।

মান্নু খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে, তাদের বাড়িতে কেউ কোন শিল্পচর্চা করে নি। বাবা একসময়ে শৌখিন থিয়েটার করতেন, ছোটভাইটা তবলা ঠোকে। বাস্, এর বেশী কিছু না! পলাশের মত মানুষ মান্নু তাই আর দেখে নি। ফলে সে পলাশের দুঃখটুঃখগুলো সঠিক বুঝতে পারে না কোনদিনই, কখনো বা পলাশকে তার ভয় হয়, কখনো বা পলাশের ওপর খুব রাগ হয় তার।

পলাশ তাকে এই বলে ভোলাত—দেখো মান্নু, আমি ফ্রি ল্যান্সে অনেক বেশী রোজগার করব।

মান্নু তাতে ভোলে নি, কিন্তু পলাশ গতবছর চাকরিটা ছেড়েছিল ঠিকই। বড্ড দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ পলাশ। তাদের এখন দু দুটো বাচ্চা। বড়টা ছেলে, তার নাম চিত্রার্পিত—পলাশেরই রাখা নাম। চিত্রার্পিতর ছয় বছর বয়স চলছে। ছোটটি মেয়ে—নাম সোনারেখা—তার বয়স তিন। এই বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের বাবা কোন আক্কেলে যে চাকরি ছাড়ে।

এখন আর পলাশের সময় নেই। কোন সকালে ক্যামেরা ঘাড়ে করে বেরোয়, রোদে রোদে ঘোরে সারাদিন। তার মুখ হয়ে যাচ্ছে রুক্ষ, গায়ে লাবণ্য কমে যাচ্ছে। গায়ে প্রায়দিনই ময়লা পোশাক থাকে, গালে দাড়ি বেড়ে যায়, সানগ্লাস পরে থাকে বলে ওর চোখের চারপাশে একটা সাদাটে ভাব। ভারী ক্লান্ত হয়ে রাতে ফেরে পলাশ। কারো দিকে তাকায় না। জামাকাপড় ছেড়ে একটা কালো অ্যাপ্রন পরে ডার্করুমে ঢুকে যায়। লাল আলো জ্বেলে ক্যামেরা আনলোড করে, সেখানে বসেই এককাপ চা খায়, তারপর আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় তার ডার্করুমে। মান্নুর সঙ্গে তার মেলামেশা নেই-ই প্রায়, চিত্র আর সোনাও ক্রমেই বাপকে ভুলে যাচ্ছে। কখনো ভুলেও তাদের কাছে ডাকে না পলাশ, আদর করে না। মান্নু মাঝে মাঝে বলে—তুমি কি আমার পেয়িং গেস্ট?

পলাশ কথাটার অর্থ না বুঝে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর কোনদিন বা হাসে, কোনদিন নিজের মধ্যে ডুবে থাকে।

এক একদিন পলাশ বাড়িতে থাকে। সারাদিন অজস্র ছবি ডার্করুম থেকে বের করে বিছানার ওপর তাসের মত সাজায়। কখনো দূর থেকে, কখনো কাছ থেকে দেখে। ছবি দেখায় এক সময়ে নিশ্চয়ই ক্লান্তি আসে পলাশের। তখন সে মাঝে মাঝে পুবের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। মানু বুঝতে পারে, এই জানালাটা পলাশের প্রিয় নয়। এ জানালা দিয়ে যখন তাকিয়ে থাকে পলাশ, পুব আকাশের উজ্জ্বল আলোর আভা যখন তার মুখে এসে পড়ে, তখন তাকে ভারী নির্জীব দেখায়। হতাশা ফুটে ওঠে তার রুক্ষ মুখে। সে মাঝে মাঝে মানুকে ডেকে বলে—এ জায়গাটা খুব কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ! কত দোকানপাট উঠছে!

মানু বলে ভালই তো।

—ভাল কেন?

—বাঃ। কলকাতার এত কাছে একটা জায়গা, চিরকাল কি তা গ্রাম হয়ে থাকতে পারে? কলকাতার প্রভাব আছে না? আমার বাপু, দোকানপাট, আলো, মানুষজন ভাল লাগে।

পলাশ অন্যমনে জানালাটা দিয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে আস্তে বলে—জায়গাটা মরে যাচ্ছে।

তারপর শ্বাস ফেলে আবার নিজের তোলা অজস্র ছবির মধ্যে হারিয়ে যায়।

এ কথা ঠিক যে পলাশের রোজগার অনেক কমে গেছে। যত তার ঘোরাঘুরি তত তার রোজগার নয়। বাড়িতে ছবি জমে পাহাড় হচ্ছে, তার ক'টাই বা বিক্রী হয়? তার ওপর আছে সরঞ্জামের খরচ। সব কিছুরই দাম বেড়ে যাচ্ছে। তবু সংসার চলে যায়। এক এক সময়ে বেশ কিছু টাকা এনে ফেলে পলাশ, এক এক সময়ে দিনের পর দিন টাকার ছবি দেখা যায় না। পলাশের চারটে দামী ক্যামেরায় অজস্র ছবি আসে, টাকা আসে না। সেজন্ত পলাশের তাপ উত্তাপ নেই, মানুর আছে। কিন্তু মানু ঝগড়া করে না। পলাশকে সে কখনো ভয় পায়, কখনো বুঝতে পারে না, কখনো পলাশের ওপর রাগ করে গুম্ হয়ে থাকে।

যেদিন পলাশ বাড়িতে থাকে সেদিন প্রায়সময়েই দুপুরবেলা সে পশ্চিমের জানালাটা খুলে একটা চেয়ার টেনে বসে থাকে। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস

পলাশের নেই। কিন্তু তখন মাহু ঘুমোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করে। কারণ, পশ্চিমের জানালা দিয়ে আসে খাটালের বিশ্রী গন্ধ, উড়ে আসে মশা, পোকামাকড়, খড় কাটার শব্দ। কিন্তু তবু পশ্চিমের জানালাটা পলাশের প্রিয়। জানালার ওপর একটা মহানিমের ছায়া নিবিড় হয়ে থাকে। সেই ছায়ার স্নিগ্ধ দেখায় পলাশের মুখ। তার মুখের রুক্ষ রেখাগুলি কোথায় মিলিয়ে যায়। দুই ঘুমহীন চোখে স্বপ্নেরা ভীড় করে আসে। চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে জানালার চৌকাঠে পা তুলে বসে পলাশ। চেয়ে থাকে। তার মাথার উপর দেয়ালে সেই গোলকীপারের বিখ্যাত বাঁধানো ছবিটা দেখা যায়। সামনে সাদা বলের দিকে হাত বাড়িয়ে এক ধোঁয়াটে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বয়স্ক গোলকীপার, তার মুখের ওপর দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মত নেমে আসছে, কপালের ওপর লেপটে আছে চুল, তার মুখে গভীর হতাশা। পশ্চিমের মহানিমের শান্ত ছায়া পড়ে সেই গোলকীপারের মুখেও, বড় অদ্ভুত দেখায় তাকে। সে যেন একটি মুহূর্তের ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে তার সারা জীবনের গল্প নীরবে বলে যাচ্ছে। বড় কষ্ট হয় মাহুর, সে গোলকীপারের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়, পলাশের মুখ থেকেও। ঘুমঘোরে সে মনে আনতে চেষ্টা করে—সে ভেনাসের সুন্দর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। ঠোঁট টিপে একা হাসে মাহু। মনের বিষাদ উড়ে যায়।

আস্তে আস্তে গড়িয়ে যায় শান্ত দুপুর। বিকেলে চায়ের সময় হয়ে আসে। মাহু শ্লথ শরীরে আধোঘুম থেকে উঠে তখনো দেখে পলাশ পশ্চিমের জানালার কাছে চুপ করে বসে আছে। গাছগাছালির ভিতর দিয়ে রাঙা রোদ এসে পড়েছে তার রুক্ষ মুখে। মুখটা কোমল দেখাচ্ছে।

—কী দেখছ সারা দুপুর বসে বসে? মাহু জিজ্ঞেস করে।

পলাশ মুখ ফিরিয়ে হাসে। বলে—কী জানি! এদিকটা দেখতে আমার বেশ লাগে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়।

যখন মাহু চা এনে পলাশের হাতে দেয়, তখনো পলাশের ঘোর কাটে নি, স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে। চা নিয়ে মাহুর দিকে চেয়ে বলে—আমাদের গ্রামের বাড়িতে এইরকম একটা উঠোন ছিল। তার পশ্চিমে গোয়ালঘর, দক্ষিণে ঢেঁকিঘর, ঢেঁকিঘরের পিছনে পুকুর। আমরা এরকম বিকেলে উঠোনে খেলতে খেলতে শুনতাম ঢেঁকিঘরে পাড় দেওয়ার শব্দ। উঠোনে খুব আলো-ছায়ার খেলা ছিল। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভরভর করত বাতাসে, গোবর-নিকানো উঠোন থেকে সিঁদুর তুলে নেওয়া যেত। মাহু, এই পশ্চিমের জানালাটা আমার

অতীত, আমার নস্ট্যালজিয়া। এই জানালা খুললেই আমি আমার দাদুকে দেখি—ঐ দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক টানতে টানতে সুনীলদের বকছেন, বাবাকে দেখি—দুপুরে ছিপ ফেলে মাথায় গামছা দিয়ে পুকুরপাড়ে বসে আছেন, মাকে দেখি—স্নান সেরে ভেজা পায়ের ছাপ উঠোনে ফেলে ঘরে যাচ্ছেন, ঠোঁটে আত্মার স্তব—ভেজা শাড়ি থেকে জলকণা ছড়িয়ে পড়ছে—কী ঠাণ্ডা গা ছিল মায়ের। পৃথিবীতে কত ছবি মুছে গেছে—সব ক্যামেরায় আসে না—কিছুতেই আসে না—

পশ্চিমের জানালার আলো মরে যায়। টিমটিমে টেমি জলে ওঠে হরষের খাটালে। তাতে মহানিমের ছায়ায় অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে জমে ওঠে। রাত্রির চোখ গড়িয়ে নামে। পুবের জানালায় তখন নিয়নের আলো দেখা যায়, জাতীয় সড়কের দোকানপাট ঝকমকিয়ে ওঠে, পেট্রোল-পাম্পের আলো জলতে এবং নিভতে থাকে, আলো জেলে দৌড়ে যায় লরী। পুবের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁতে ফিতে চেপে চুল বাঁধে মান্নু। দেখে দোকানপাট, প্ল্যাটফর্ম, ইলেকট্রিক ট্রেন, লোকজন। তখন এক এক সময়ে মান্নু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে—আর, এ দিকটা দেখলে তোমার কিছু মনে হয় না?

পলাশ আধো-অন্ধকারে মুখ ফেরায়। তার মুখে স্টেশন আর জাতীয় সড়কের আলোর আভা এসে পড়ে, দ্রুত তার মুখে আবছা আলোর আভা ফেলে দৌড়ে যায় লরী, পলাশ মাথা নেড়ে বলে—হয়। মনে হয়, আমি ঐ জগতের কেউ না। আমি বাইরের লোক।

—কেন এরকম মনে হয়?

—কী জানি!

মান্নু হাসে—আমি জানি। যা নড়ে চড়ে, যা জীবন্ত, তার কিছুই তোমার ভাল লাগে না। তুমি ছবির রাজ্যে বাস করতে করতে এখন আর যার গতি আছে এমন কিছু পছন্দ করো না।

পলাশ হাসে, বলে—বাঃ মান্নু, তুমি কী সুন্দর সাজিয়ে বললে! বাঃ!

তারপর অন্ধকার ঘরে বসে পলাশ আবার পশ্চিমের জানালা দিয়ে বাইরে গাঢ় অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে।

রাস্তা। একটা বাস-স্টপ। খুব ভীড়। একটা ডবল-ডেকার থেমে আছে। তার পাদানীতে মানুষজনের প্রচণ্ড জড়াজড়ি। উদ্যত হাত আর পা বাড়িয়ে বাস-স্টপের মানুষেরা সেই ভীড় ভেদ করার চেষ্টা করছে। তাদের মুখে উগ্রতা:

ব্যগ্র, নিষ্ঠুর চেষ্টায় তাদের সকলের মুখই প্রায় একরকম দেখাচ্ছে। এই দৃশ্যটা পটভূমি। সামনে রাস্তার ধারে বসে আছে উনিশ-কুড়ি বছরের একটা ময়লা কাগজ-কুড়নি ছেলে। জরাজীর্ণ তার চেহারা। ক্ষুধার্ত মুখ। পাশে বস্তাটা নামিয়ে রেখে সে বসে দেখছে রাস্তার পীচের ওপর কারা যেন এঁটো খাবার অজস্র ফেলে গেছে। লুচির টুকরো, মাংসের হাড়, ভাতের স্তূপ। ছেলেটা উবু হয়ে বসে তার ব্যগ্র একখানা হাত বাড়িয়েছে সেই রাস্তার ওপরকার খাবারের দিকে। ছবিটা এই।

ডার্করুমে ঢোকা দিয়ে চা দিতে ঢুকে মান্নু দেখল, টেবিল-ল্যাম্পের উজ্জল আলো জেলে পলাশ ছবিটা দেখছে। পলাশের ঘাড়ের ওপর দিয়ে মান্নুও দেখল। এরকম নগ্ন দৃশ্য মান্নু বাস্তবে কখনো দেখেনি। দেখতে দেখতে তার বুক ব্যথিয়ে উঠল। চোখে জল এসে গেল।

সে প্রায় রুদ্ধগলায় বলল—ইস্ গো, কী অদ্ভুত ছবিটা!

পলাশ মুখ তুলল। তার মুখে স্পষ্ট হতাশা। হাত বাড়িয়ে চা নিল সে। দু একটা চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল আপনমনে। বিড় বিড় করল। তারপর মান্নুর দিকে চেয়ে বলল—তবু এ ছবিতে সত্য দৃশ্যটা নেই।

—নেই কী গো! ছবিটা দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। কান্না আসে।

পলাশ অনেকক্ষণ চুপ করে চা খেয়ে গেল। তারপর আবার মাথা নেড়ে বলল—নেই। ছবিটায় কী যেন নেই।

—কী নেই?

পলাশ আবার চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—যখন এই দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম তখন কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না এই দৃশ্যের মধ্যে কোন বিষয়টা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট। ঐ ব্যগ্র অফিস-যাত্রীরা, না ঐ ছেলেটা, না কি ঐ রাস্তার ওপরকার খাবারের স্তূপটা—কোনটাকে ছবির মাঝখানে রাখব, কোনটা হবে বিষয়, আর কোনটাই বা পটভূমি! সময় হাতে নেই, কারণ, দৃশ্যটা ক্ষণস্থায়ী, ফটোগ্রাফারের জন্য কেউ কোন দৃশ্য ধরে রাখেনা বেশীক্ষণ। তাই আমি দৌড়ে চারপাশে ঘুরছিলাম, বার বার ক্যামেরা তুলে দেখছিলাম ভিউ-ফাইণ্ডারে কোনটাকে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যাণ্ট দেখায়। সবচেয়ে যেটা ভাল মনে হল সেটা তুলে নিলাম। তারপরই বাসটা ছেড়ে দিল, দৃশ্যটা ভেঙে গেল। ছবিটা উঠলও সুন্দর। তবু মান্নু, ছবিটাতে কি যেন নেই।

—কী সেটা? মান্নু ব্যগ্র প্রশ্ন করে।

পলাশ চুপ করে কপালে এসে পড়া চুলে ঘুরলি পাকায় আঙুল দিয়ে। অস্থির বোধ করে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দেয়।

অন্ধকারে পলাশ হাত বাড়িয়ে মান্নুর হাত ধরে।

বলে—মান্নু চারিদিক এই যে অন্ধকার, সেটা কেমন?

ভীষণ।

—এই অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়না। অথচ আমরা টের পাচ্ছি যে আমি আছি তুমিও আছ। না?

—আছি তো।

এই অন্ধকারের কি ছবি হয়? সেই ছবিতে কি বোঝান যায় যে তার ভিতরে আমি এবং তুমি দুজনেই আছি?

মান্নু চুপ করে থাকে।

পলাশ আবার আলোটা জ্বেলে হতাশার হাসি হাসে—হয় না। মান্নু ওরকম ছবি হয় না। ছবিটার ওপর আলোটা নামিয়ে আনে পলাশ। বলে—এই ছবিতে একটা অন্ধকার রয়েছে। তার মধ্যে আছে আরো কিছু। কিন্তু তা ছবিতে ধরা পড়ে নি।

হাতের কাছেই পড়ে আছে একটা জাইস্-ইকন। সেটা তুলে নিয়ে ঝাঁকায় পলাশ। তারপর সেটা অবহেলায় ফেলে দিয়ে বলে—ক্যামেরার সাধ্য বড় কম। কেন কম মান্নু?

মান্নু চুপ করে থাকে।

পলাশ ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে যায় আবার। আপনমনে বে-খেয়ালে বলে—আমার বুকে কত ছবি জমে আছে।

মাঝে মাঝে হাওয়া দিলে দেয়ালে গোলকীপারের ছবিটা দোল খায়। দুপুরের আধো-ঘুমঘোরে মান্নু চেয়ে দেখে। বয়স্ক মানুষটা সাদা বলের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে। মাঝখানে অনন্ত দূরত্ব। অবিরল বৃষ্টি ধারায় ভিজে যাচ্ছে সে, মুখে অফুরান হতাশা। ছবিতে ঐ বৃষ্টি থেমে কোনদিন রোদ উঠবে না। অনন্ত দূরত্ব থেকে যাবে বলটির সঙ্গে বয়স্ক মানুষটার। ছবিটা দোল খায়। একটা গল্প বলতে থাকে।

সেখান থেকে ঝুপ করে মান্নুর চোখ নেমে আসে। পশ্চিমের খোলা জানালায় পা তুলে নিঃঝুম বসে আছে পলাশ। মহানিমের নিবিড় ছায়া তাকে

ঘিরে আছে। পলাশের রুক্ষ মুখের রেখাগুলি মিলিয়ে গেছে। তার ঘুমহীন চোখে স্বপ্নের ভীড়।

মান্তু টের পায়, পলাশের শরীরের ভিতরকার অন্ধকারে অজস্র ছবির জন্ম হচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে আবার। তাই মহানিমের ছায়া কোলে করে ও বসে আছে অমন। কারণ, ও জানে, সব ছবিই পৃথিবীর আলোতে আসে না। পুবের জানালা দিয়ে দেখা যায় অগ্রসরমান পৃথিবীর ছবি, জাতীয় সড়ক, দোকানপাট, দৌড়ে যাওয়া লরী। পশ্চিমের জানালায় মহানিমের ছায়া। দেয়ালে বয়স্ক গোলকীপারের ছবি। তার নীচেই পলাশ।

চেয়ে থাকতে থাকতে কখনো কখনো মান্তুর চোখে জল চলে আসে। সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জোর করে মনে করার চেষ্টা করে তার সেই ভেনাসের সুন্দর বিভঙ্গ। আধো-ঘুমে সে মুখ টিপে হাসে।

দূরত্ব

মন্দার টেবিলের ওপর শুয়ে ছিল। থার্ড পিরিয়ড তার অফ্। মাথার নিচে হাত, হাতের নিচে টেবিলের শক্ত কাঠ। বুকের ওপর ফ্যান ঘুরছে। শরীরটা ভাল নেই কদিন। সর্দি। ফ্যানের হাওয়াটা তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু বন্ধ করে দিলে গরম লাগবে ঠিক। শার্টের গলার বোতামটা আটকে সে শুয়ে ছিল। ক্রমে ঘুম এসে গেল। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন, কখনো স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোয় না মন্দার।

স্বপ্নের মধ্যে দেখল তার বৌ অঞ্জলিকে। খুব ভীড়ের একটা ডবলডেকার থেকে নামবার চেষ্টা করছে অঞ্জলি। অঞ্জলির কোলে একটা কাঁথা-জড়ানো আঁতুড়ের বাচ্চা। নিচের মানুষরা অঞ্জলিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে পিছনের মানুষরা নামবার জন্ম অঞ্জলিকে ধাক্কা দিচ্ছে, চারিদিকের লোকেরা অঞ্জলিকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, সরিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা মারছে, তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো, কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে, কোনদিকেই যেতে পারছে না সে। নামতেও না, উঠতেও না, বাচ্চাটা অঞ্জলির শরীর ভাসিয়ে বমি ক'রে দিল, পায়খানা করল, পেচ্ছাপ করছে। চারিদিকে রাগী, বিরক্ত, ব্যস্ত মানুষরা চেঁচাচ্ছে, গাল দিচ্ছে, যেন বাচ্চাশুদ্ধু অঞ্জলি জাহান্নামে যাক, না গেলে তারাই পাঠাবে। ঘুমের মধ্যেই মন্দার ভীড় ঠেলে অঞ্জলির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আকুলভাবে। কিন্তু প্রতিটি লোকই পাথর। কাউকে ঠেলে সরাতে পারছে না মন্দার। সে চেঁচিয়ে বলছিল—আমি কিন্তু নেমে পড়েছি অঞ্জলি, তোমাকেও নামতে হবে-এ। নামো শিগগির নামো বাস ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই স্বর এত দুর্বল যে ফিস্‌ফিসের মত শোনা গেল। ক্রুদ্ধ কণ্ডাক্টার ডবল ঘণ্টি বাজিয়ে দিচ্ছে···অঞ্জলির কী যে হবে!

দুঃস্বপ্ন। চোখ খুলে মন্দার বুকের ওপর ঘুরন্ত পাখাটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়।

অঞ্জলি এখন আর তার ঠিক বৌ নয়। মাস ছয়েক আগে মন্দার মামলা দায়ের করেছিল। আপসের মামলা। সেপারেশন হয়ে গেছে। অঞ্জলি যখন

চলে যায় তখন তার পেটে মাস দুয়েকের বাচ্চা। এতদিনে বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, মন্দার খবর রাখে না। দেখে নি। ছেলে না মেয়ে, তা জানতে ইচ্ছেও হয় নি। কারণ, বাচ্চাটা তার নয়।

বিয়ের সাতদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারল মন্দার। তখনই মাস দুয়েকের বাচ্চা পেটে অঞ্জলির। তা ছাড়া অঞ্জলির ব্যবহারটাও ছিল খাপছাড়া। কথার উত্তর দিতে চাইত না, ভালবাসার সময়গুলিতে কাঁটা হয়ে থাকত। তবু দিন সাতেক ধরে অঞ্জলিকে ভালবেসেছিল মন্দার। মেয়েদের সংস্পর্শহীন জীবনে অঞ্জলি ছিল প্রথম রহস্য। দিন সাতেকের মধ্যেই বাড়িতে অঞ্জলিকে নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। মন্দারের কানে কথাটা তোলে তার ছোটো বোন। শুনে মন্দারের জীবনে এক স্তব্ধতা নেমে আসে। অঞ্জলি অস্বীকার করে নি। মন্দার সোজা গিয়ে যখন অঞ্জলির বাবার সঙ্গে দেখা করে তখন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধটি কেঁদে ফেলেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে একটিও কথা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন—ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দরকার ছিল, আমি সেটুকুর জন্য তোমাকে এই নোংরামিতে টেনে নামিয়েছি। ওকে তুমি ফেরৎ দেবে জানতাম। যদি একটি কথা রাখো, ওর ছোটো বোনের বিয়ে আর দু মাস বাদে, সব ঠিক হয়ে গেছে, শুধু এই কটা দিন কথাটা প্রকাশ কোরো না। মামলা তারপর দায়ের কোরো। আমি কথা দিচ্ছি, মামলা আমরা লড়বো না।

অঞ্জলি ফেরৎ গেল বিয়ের দশ দিনের মাথায়। দু মাস অপেক্ষা করে মামলা আনে মন্দার। অঞ্জলি লড়ল না, ছেড়ে দিল। অঞ্জলির সঙ্গে আর দেখা হয় নি। বিয়ের পর আট মাস কি ন' মাস কেটে গেছে। মন্দার এখনও কেমন বেকুবের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশ ফিরে শুতেই দেখা যায়, বইয়ের আলমারি। আলমারির ওপরেই উইপোকার আঁকাবাঁকা বাসা। সেদিকে চেয়ে থেকে সে স্বপ্নটা কেন দেখল তা মনে মনে নাড়াচাড়া করল একটু। আসলে স্বপ্নের তো মানে থাকে না। আর এ তো ঠিকই যে অঞ্জলির কথা সে এখনো ভুলে যায়নি। এসব কি ভোলা যায়?

আজ মঙ্গলবার। আজই তার দুটো ক্লাশ। একটা সেকেণ্ড পিরিয়ডে গিয়েছে, আর একটা ফিফথ্ পিরিয়ডে নেওয়ার কথা। এ সময়টায় কলেজে ক্লাশ বেশি থাকে না। পি. ইউ-তে এখনো ছেলে ভর্তি হয়নি, পার্ট টু বেরিয়ে

গেছে। সপ্তাহে দু দিন ছুটি থাকে তার, অন্য দিন একটা দুটো ক্লাশ নেয়, বাকি সময়টা শুয়ে থাকে। কেউ কিছু বলে না। সকলেই জেনে গেছে, মন্দার চ্যাটার্জির ডিভোর্স হয়ে গেছে, তার মন ভাল না, সে একটু অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে কলেজে আসে। এসব ক্ষেত্রে একটু আধটু স্বেচ্ছাচার সবাই মেনে নেয়। মন্দার টেবিলে উঠে শুয়ে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। থার্ড পিরিয়ড চলছে, ঘরে কেউ নেই, মন্দার একা। আবার ঘুমোতে তার ইচ্ছে করছিল না। ঐ ঘটনার পর কয়েকটা দিন খুবই অস্বাভাবিক বোধ করেছিল ঠিকই। বোধ হয় তার সাময়িক একটা মাথা খারাপের লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। সময়, সময়ের মতো এমন সান্ত্বনাকারী আর কেউ নেই। মন্দারের মনে সময়ের স্রোত তার পলির আস্তরণ দিয়ে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ ঐ দুঃস্বপ্ন।

বেয়ারাকে ডেকে এক পেয়ালা চা আনিয়ে খেল মন্দার। তারপর ছেলেদের খবর পাঠাল, ফিফ্‌থ পিরিয়ডের ক্লাশটা আজ সে করবে না। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই, বাইরে একটা চমকানো রোদ স্থির জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে মন্দারের জন্য কিছু নেই। সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এতদিনে তার একটা বাচ্চা হতে পারত। আর তাহলে এখন মন্দার এই ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সেই শিশুটির কাছেই ফিরে যেত হয়তো বা সেই শিশুশরীরের গন্ধটি শ্বাসে টেনে নিতে।

এতবড় জোচ্চুরি যে টেঁকে না, তা কি অঞ্জলি জানত না? তার বাবাও কি জানত না? তবে তারা খামোখা কেন ঐ কাণ্ড করল? কেবল একটু সিঁদুরের জন্য কেউ কি একটা লোকের সারাজীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে? কীরকম বোকামি এটা? দু মাসের বাচ্চা পেটে লুকিয়ে রেখে বিয়ে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

স্বপ্নে দেখা অঞ্জলির অসহায় ব্যথাতুর মুখখানার প্রতি যে সমবেদনা জন্মলাভ করেছিল তা ঝরে গেল। জাগ্রত মন্দারের ভিতরটা হঠাৎ আক্রোশে রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রামে বাসে অচল আধুলি পেয়ে ঠকে যাওয়ার মতোই ঘটনা। কিছু করার থাকে না। অঞ্জলি আজও তার নামে সিঁদুর পরে কিনা কে জানে।

মন্দার বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। গরমের দুপুর বলে রাস্তা ফাঁকা। সে ট্যাক্সিটায় বসে যাড় এলিয়ে স্বপ্নটার কথা না ভেবে পারে না। ভিড়ের ভিতর একটা ডবলডেকার থেকে নামতে পারছে না অঞ্জলি, কোলের বাচ্চাটা

তার সারা শরীর ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজের শরীরের আভ্যন্তরীণ ময়লায়, কাথে। নিষ্ঠুর মানুষেরা অঞ্জলিকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গাল এবং অভিশাপ দিচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো মানে হয় না। অঞ্জলির সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। দেখা হওয়ার কথাও নয়। এখন সে কি তার প্রেমিকের ঘর করছে? কে জানে! স্বপ্নে মন্দার অঞ্জলিকে সেই ভীড় থেকে, অপমান লাঞ্ছনা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। পারে নি। জাগ্রত মন্দার কোনোদিনই সেই চেষ্টা করবে না।

ট্যাক্সিওয়ালাটা খোঁচর। কেবলই ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবেন?

মন্দার বিরক্ত হয়ে বলে—সোজা চলুন, বলে দেবো।

কিছুক্ষণ দিক ঠিক করতে সময় গেল। কলকাতার কত অল্প জায়গা চেনে মন্দার! তার চেনা মানুষের সংখ্যাও কত কম! এখন এই ট্যাক্সিতে বসে কারো কথাই তার মনে পড়ে না যার কাছে যাওয়া যায়। কোনো জায়গাও ভেবে পায় না সে যেখানে গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসে থাকবে। বাসায় ফেরার কোনো অর্থ নেই। সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সর গাদাগুচ্ছের বইতে আকীর্ণ ঘরখানা বড্ড রসকষহীন। গত কয়েকমাস সে বই প্রায় ছোঁয় নি। থিসিসের কিছু পাতা লেখা হয়েছিল, পড়ে আছে। ঘরে কেবল বিছানাটাই মন্দারের প্রিয়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, শুয়েই থাকে মন্দার। ঘুমোয়, ভাবে, সিগারেট খায়। আজকাল কেউ ঘরে ঢোকে না ভয়ে।

ট্যাক্সিটা কিছুক্ষণ ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘোরালো সে। তারপর অচেনা রাস্তায় এসে পড়ায় চিন্তিতভাবে এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে গেল।

কোথায় নেমেছে তা বুঝতে পারল না, তবু এ তো কলকাতাই! ঘুরেফিরে ডেরায় ফিরে যাওয়া যাবে। ভয় নেই। কিছুক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় ভালই লাগবে।

অচেনা রাস্তা ধরে আন্দাজে সে হাঁটে। বুঝতে পারে, চৌরঙ্গীর কাছাকাছি অঞ্চল। নির্জন পাড়া, গাছের ছায়া পড়ে আছে, বাড়িগুলো নিঃঝুম। কয়েকটা দামী বিদেশী গাড়ি এধারে-ওধারে পড়ে আছে। মন্দার চম্‌কী রোদে কিছুক্ষণ হাঁটে। ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না, তা বুঝতে পারে না। রোদ বড্ড বেশি। গরম লাগে, ঘাম হয়। শরীরের শ্রম মনের ভার লাঘবে কাজ করে না। মন জিনিসটা বড় ভয়ানক।

আসলে সে বুঝতে পারে, একবার অঞ্জলির সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। গত ছ মাস ধরে বন্ধনমুক্ত মন্দার সুখী নয়। এই সুখী না হওয়ার কারণ সে খুঁজে পায় না, পাচ্ছে না। সে ঠকে গিয়েছিল বলে আক্রোশ? তাকে একটা চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঘৃণা? সে অঞ্জলিকে ছুঁয়েছিল, ভালবেসেছিল বলে বিবমিষা? উত্তরটা অঞ্জলির কাছে আর একবার না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডবলডেকারের পা-দানির ভিড়ে অঞ্জলিকে স্বপ্নে দেখার কোন মানে না থাক্, গত ছ মাস মন্দার যে সুখী নয় এটা সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। বিস্মৃতির পলি পড়েছে মনে, ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে সে, এবং এই ভাবেই একদিন হয়তো বা সে দার্শনিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান নেই। সে আবার বিয়ে করবে ঠিকই। মেয়ে দেখা হয়েছে। সামনের শ্রাবণে সে খুবই অনাড়ম্বর একটি অনুষ্ঠান থেকে তার নতুন স্ত্রীকে তুলে আনবে। কিন্তু তবু অসুখীই থেকে যাবে মন্দার। অঞ্জলির কাছে একটা রহস্য গোপন রয়ে গেছে।

অঞ্জলি দেখতে ভাল, অন্যদিকে খুবই সাধারণ। বি-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। খালি গলায় গাইতে পারত। রঙ চাপা, মাথায় গভীর চুল, ভীরু চাউনি ছিল। আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বিয়ের সাতদিন বাদে এক রাত্রিতে প্রায় উন্মাদ মন্দার জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি প্রেগন্যান্ট?

অঞ্জলি ভীষণ ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য দুটো হাত সামনে তুলে, ভীরু, খুব ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিল—আমার বাবা এই বিয়ে জোর ক'রে দিয়েছেন, আমি চাই নি—

—তুমি প্রেগন্যান্ট কিনা বলো।

—হ্যাঁ।

—মাই গুডনেস্!

অঞ্জলি তবু কাঁদে নি, কেবল ভয় পেয়েছিল। কী হবে তা অঞ্জলি বোধ হয় জানত। মন্দার যখন অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল তখন ঘরে অঞ্জলির বাক্স গোছানোর শব্দ পেয়েছিল। অর্থাৎ অঞ্জলি ধরেই নিয়েছিল চলে যেতে হবে। মানুষ বরাবর এই সয়ে-যাওয়াটা বিশ্বাস করে।

ক্লান্ত মন্দার আবার একটা ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা খায়। গাছের তলায় কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপর অন্যমনে বসে সে ভাঁড়টা শেষ করে। অঞ্জলির কাছে যাওয়াটা ভারি বিশ্রী হবে। ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। অঞ্জলিদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।

আবার একটা ট্যাক্সি নেয় মন্দার। এবার সে উত্তর কলকাতার একটা কলেজের ঠিকানা বলে ড্রাইভারকে। তারপর চোখ বুজে পড়ে থাকে। নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো মানে নেই। তবু এখন একটা কিছু বড় দরকার মন্দারের। কী যে দরকার তা ঠিক জানে না। নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নেই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে পারিবারিক যোগাযোগে।

নন্দিনীকে পেতে একটুও কষ্ট হল না। ক্লাশ ছিল না বলে কমনরুমে আড্ডা দিচ্ছিল। বেয়ারা ডেকে দিয়ে গেল।

মন্দারকে দেখে নন্দিনী ভীষণ অবাক। লোকটা কী ভীষণ নির্লজ্জ! সামনের শ্রাবণে বিয়ে, তবু দেখ তার আগেই কেমন দেখা করতে এসেছে!

—আপনি?

—আমি মন্দার···

—জানি তো!

—একটু দরকারে এলাম, কটা কথা বলতে।

—কী কথা?

—আমার প্রথমা স্ত্রীর সম্পর্কে।

—সেও তো জানি।

—ওঃ।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়। ভেবেছিলাম বুঝি তোমাকে আমাদের বাসা থেকে কিছু জানানো হয় নি।

—আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমি ভাবি না।

মন্দার নন্দিনীকে একটু দেখে। চোখা চেহারার মেয়ে। খুব বুদ্ধি আছে মনে হয়। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো জলুষ নেই। রঙ ফর্সা, লম্বাটে মুখ, ছোটো নাক। আলগা সৌন্দর্য কিছু নেই।

মন্দার বলল—কিছু মনে করলে না তো!

নন্দিনী হাসে—এই কথা বলার জন্য আসার কোনো দরকার ছিল না। আজকাল চড়া রোদ হয়।

—ট্যাক্সিতে এসেছি।

—অযথা খরচ।

—আমার খুব একা লাগছিল।

নন্দিনী একটু মাথা নিচু করে ভাবল। নন্দিনীর সঙ্গে মন্দারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল পাত্রী দেখতে গিয়ে। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে, তবু এতদূর মন্দার না করলেও পারত। তার লজ্জা করছিল।

নন্দিনী মুখ তুলে আস্তে বলল—আমায় এখন অফ্ পিরিয়ড চলছে, শেষ ক্লাশটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের—ওটা তো না করলেও চলবে।

—না করলেও চলবে কেন?

নন্দিনী একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফেল করব না।

মন্দারও একটু হাসে। বলে—তাহলে তো তোমার ছুটিই এখন?

মনে করলেই ছুটি।

কোথায় যাবে?

—আমি কি জানি। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায়।

খুবই চালু মেয়ে তার ভাবী বৌ। এত চালু মন্দার ভাবে নি। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ও খুব কথা বলে। বেশ বুদ্ধির কথা, চটপট কথার জবাব দিতে পারে, রসিকতা করতে জানে, সাধারণ লজ্জা সংকোচ ওর নেই। পাত্রী দেখতে গিয়ে এতটা লক্ষ্য করে নি মন্দার। তখন অভিভাবকদের সামনে হয়তো অন্যরকম হয়ে ছিল। একে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করছিল না মন্দারের। কথা নয়, চুপচাপ পাশে বসে থাকবে, এমন একজন সঙ্গী দরকার তার। যার মন খুব গভীর, যার স্পর্শ-কাতরতা খুব প্রখর। যে কথা ছাড়াই মানুষকে বুঝতে পারে।

মন্দার ঘড়িটা দেখে—বলল—আমার চারটের একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। আজ থাক। কোনো দিন আসবো।

একটু হতাশ হয় নন্দিনী। বলে—আসার তো দরকার ছিল না।

—ছিল। সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝবো না কেন?

আমি নিজেই বুঝি না।

বলে মন্দার কলেজ থেকে বেরিয়ে এল।

মাত্র গোটা চারেক টাকা পকেটে আছে। তবু মন্দার আবার ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। খানিকদূর হেঁটে পেয়েও গেল একটা। দক্ষিণ দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে আবার ঘাড় এলিয়ে চোখ বোজে সে। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা দেখতে পায়। সেই ডবলডেকারের পা-দানি, ভিড়, টাল-মাটাল অঞ্জলি, কোলে শিশু।

অঞ্জলিদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল মন্দার। ভাড়া দিতে গিয়ে পকেট সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। টাকা আর খুচরো যা ছিল সব দিয়েও পনেরো পয়সা কম হল। ট্যাক্সিওয়ালা হেসে সেটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

দরজা খুললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ। অঞ্জলির বাবা। খুলে ভারি অবাক হলেন।

—বাবাজীবন, তুমি?

—আমিই।

—এসো এসো।

মন্দার ঘরে ঢোকে। অঞ্জলির মা নেই। ভাইরা বৌ নিয়ে আলাদা থাকে। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িটা একটু অগোছাল।

—বসবে না? বুড়ো তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মন্দার বসে। জিজ্ঞেস করে—কী খবর?

—খবর আর কি? কোনোরকম। বুড়ো গলা খাঁকারি দেয়।

—আমি অঞ্জলির খবর জানতে চাইছি।

বুড়োর ঠিক বিশ্বাস হয় না। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়। বলে—সে ভিতরের ঘরে আছে।

মন্দার চুপ করে থাকে।

বুড়ো খুব সাবধানে জিজ্ঞেস করেন—কী চাও মন্দার? ওকে কিছু বলবে?

—হুঁ।

—যাও না, নিজেই চলে যাও ভিতরে। ডাকলেই সাড়া পাবে।

সাত দিনের জন্য এ বাড়িটা তার শ্বশুরবাড়ি ছিল, এই সুন্দর বৃদ্ধটি ছিলেন তার শ্বশুর। বাড়িটা মন্দারের চেনা। একটু সংকোচ হচ্ছিল, তবু মন্দার উঠল।

বৃদ্ধ বলে—ভিতরে বাঁ দিকের ঘরে আছে।

মন্দার যায়।

দরজা খোলা। অঞ্জলি শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে একটা পুঁটলির মতো বাচ্চা তুলতুল করে। সে ঘুমোচ্ছে।

মন্দার ঘরে পা দিতেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চমকে উঠল কিনা কে জানে! অবাক হল খুব। উঠে বসল খুব ধীরে। কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল বাচ্চাটাকে একটা হাত বাড়িয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। চোখে ভয়। মন্দার হাসে। জিজ্ঞেস করে—কবে হল?

—আজ আট দিন।

—ভাল আছো?

—না। খুব কষ্ট গেছে।

—আমার শরীরে রক্ত ছিল না। বলে শ্বাস ফেলল অঞ্জলি—খুব কষ্ট গেছে। বিকারের মতো হয়েছিল। তুমি বোসো। ঐ চেয়ার টেনে নাও। কিছু বলবে?

—বলব।

—কী?

—আমি ভীষণ অসুখী।

—হওয়ার কথাই। এখন কী করতে চাও?

—কয়েকটা ভাইটাল প্রশ্ন করব।

—করো।

—তোমার প্রেমিকটি কে?

বিস্ময়ে চোখ বড় ক'রে অঞ্জলি বলে—প্রেমিক?

—ঐ বাচ্চাটার বাবার কথা বলছি।

—সে আমার প্রেমিক হবে কেন? তাকে তো আমি ভালবাসতাম না, সেও আমাকে বাসত না।

—তাহলে এটা কী ক'রে হল?

—হয়ে গেল। কত কিছু এমনিই হয়ে যায় যা ঠিক বুঝতেই পারা যায় না।

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল। ভুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সে করতে চায়নি। এই প্রশ্ন করতে সে আসে নি? তবে কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?

সে বলল—তুমি ওর বাবাকে বিয়ে করবে না?

—বিয়ে! ভারি অবাক হয় অঞ্জলি, বলে—তা কি সম্ভব? সে কোথায় চলে গেছে! তা ছাড়া আমি তা করতে যাবো কেন? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

এও ভুল প্রশ্ন। মন্দার বুঝতে পারে। এবং তারপর সে আবার একটা ভুল প্রশ্ন করে—তুমি কি আমার কাছে কিছু চাও?

—না। তুমি অনেক দিয়েছো।

—কী দিয়েছি?

—এই বাচ্চাটার একটা পরিচয়।

মন্দার বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি আমার বাচ্চা হিসেবেই চালু থাকবে নাকি?

যদি তুমি অনুমতি দাও।

মন্দার একটু ভেবে বলে—থাকুক।

অঞ্জলি খুশি হল। বলল—আমি জানতাম, তুমি আপত্তি করবে না।

আমি বিয়ে করছি অঞ্জলি।

—জানি। করাই উচিত।

তবু সঠিক প্রসঙ্গটা খুঁজে পাচ্ছে না মন্দার। এসব কথা নয়, এর চেয়ে জরুরী কী একটা বলবার আছে তার। বুঝতে পারছে না। খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাই সে বেকুবের মতো বসে থাকে।

—তোমার শরীরে রক্ত নেই?

—না। কিছু খেতে পারতাম না গত কয়েকমাস। বাচ্চাটা তখন আমার শরীর শুষে খেয়েছে। ওর দোষ নেই। বাঁচতে তো ওকেও হবে। শরীরটা তাই গেছে।

—তোমার অসুখটা কেমন?

—বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ দুর্বল।

—তুমি শুয়ে থাকো বরং। শুয়ে শুয়ে কথা বলো।

—তাই কি হয়! বলে বসে বসে অঞ্জলি একটু কাঁদে, বলে শ্বশুরবাড়িতে এসেছো, তোমাকে কেউ আদরযত্ন করার নেই। দেখ তো কী কাণ্ডটা!

মন্দার চুপ ক'রে থাকে।

অঞ্জলি তক্ষুনি নিজের ভুল সংশোধন ক'রে বলে—অবশ্য এখন তো আর শ্বশুরবাড়ি এটা নয়, আমারই ভুল।

মন্দার একটু দুঃখ পায়। অঞ্জলির মুখটা ফোলা ফোলা, শরীরও তাই। বোধহয় শরীরে জল এসে গেছে ওর।

মন্দার জিজ্ঞেস করে—তোমার বাচ্চাটা কেমন হয়েছে?

—ভাল আর কী। আমার শরীর থেকেই তো ওর শরীর! একটা খারাপ হলে আর একটা ভাল হবে কী ক'রে?

কিন্তু কী কথা বলতে এসেছে মন্দার? মনে পড়ছে না, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এসব সাধারণ কথা নয়; এ ছাড়া আর একটা কী কথা যেন! মন্দার চুপ ক'রে বসে থাকে। ভাবে। অঞ্জলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সেই ভীতু ভাব। বোধহয় সবসময়ে নিজের অপরাধের কথা ভাবে ও, আর সবসময়ে ভয় পায় তার অপরাধের প্রতিফল কোনো না কোনো দিক থেকে আসবেই।

মন্দার জিজ্ঞেস করল—এ সব জানাজানির পর তোমার অবস্থা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ ?

অঞ্জলি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—তা জেনে কী হবে ?

মন্দার একটা শ্বাস ফেলল মাত্র।

সেই শ্বাসের শব্দে অঞ্জলি তার দিকে তাকাল, জলভরা চোখ। বলল—আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।

—জানি।

—তুমি ভীষণ দয়ালু। তোমার তুলনা নেই। তুমি আমার ওপর রাগ করতে চাইছো, কিন্তু পারছো না।

মন্দার একটু চমকায়। কথাটা সত্য। সে অঞ্জলির ওপর রাগ ঘৃণা সবই প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু তার মনের মধ্যে কিছুতেই রাগের সেই ঝড়টা ওঠে না। উঠলে ভাল হতো বোধহয়। মন্দার আবার একটা শ্বাস ফেলে।

বাইরে থেকে অঞ্জলির বাবার গলা পাওয়া যায়—মন্দার !

মন্দার মুখ ফিরিয়ে ভারি অবাক হয়। সুন্দর বৃদ্ধটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। মন্দারের চোখে চোখ পড়তেই লাজুক মুখে বলে—বাড়িতে কাজের লোক নেই তাই···

মন্দার বিস্মিতভাবে বলে—নিজেই করলেন ?

—আমার অভ্যাস আছে। আঁতুড় ঘরে বসে খেতে ঘেন্না করে না তো বাবা ! তুমি না হয় বাইরের ঘরে এসো।

আমি কিছু খাবো না।

—খাবে না ? বলে বুড়োমানুষ ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। সাধাসাধি করতে বোধহয় তারা ভয় পায়। মন্দারকে তাদের ভীষণ ভয়।

যেন বা বুড়ো জানত যে মন্দার এবাড়ির খাবার খাবে না, তাই মাথা নিচু ক'রে বলে—আচ্ছা, তাহলে বরং থাক্।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তার বাবার দিকে চেয়ে ছিল। মন্দারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—কলেজ থেকে ।তো ?

হুঁ।

—খিদে পায় নি ?

অঞ্জলি চুপ করে থাকে। কিছু বলার নেই। তারা অপরাধীর মত মন্দারের দিকে চেয়ে আছে। জোর করে খাওয়াবে এমন সম্পর্ক নয়।

অসহ্য। মন্দার উঠে গিয়ে বুড়োর হাত থেকে প্লেট আর কাপ নিয়ে বলে—ঠিক আছে। খাচ্ছি।

বাপ বেটিতে খুব অবাক হয়। তারা একটুও আশা করে নি এটা।

বুড়ো চলে গেল। মন্দার অঞ্জলিকে বলে—এসব ফর্মালিটির দরকার ছিল না। অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডিভোর্স জিনিষটা বাবা বোঝেন না। সেকেলে মানুষ। ওঁর কাছে এখনও তুমি জামাই, বরাবর তাই থাকবে। ওঁদের মন থেকে এসব সংস্কার ভুলে ফেলা ভারি মুস্কিল।

মন্দার উত্তর দেয়না।

অঞ্জলি নিজে থেকেই আবার বলে – বাবার আর দোষ কী! আমি নিজেও মন থেকে সম্পর্ক তুলে দিতে পারি নি। স্বামী জিনিষটা যে মেয়েদের কাছে কী!

—ওসব কথা থাক।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বলে—থাকবে কেন! এখন তো আর আমার ভয় নেই! এইবেলা বলতে সুবিধে। আমি হয়তো আর বেশীদিন বাঁচবও না।

কী বলতে চাও?

সংস্কারের কথা। মেয়েলী সংস্কার। মন্ত্র, সিঁদুর, যজ্ঞ—এসব কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না। তুমি আমার কেউ না, তবু মনে হয়, কেবলই মনে হয়···অঞ্জলি চুপ ক'রে থাকে। একটু কাঁদে বুঝি!

মন্দার তাড়াতাড়ি বলে—অঞ্জলি, তোমাকে আমি কি একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ কথাটা খুবই জরুরী।

—বলো।

—বললাম তো মনে পড়ছে না।

—একটু বসে থাকো, মনে পড়বে। যদি ঘেন্না না করে তবে খাবারটা খেয়ে নাও। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে মনে পড়ে যাবে।

মন্দার অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। অঞ্জলি তার দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে যেন বুঝবার চেষ্টা করে।

মন্দার একটু আধটু খুঁটে খায়, চায়ে চুমুক দেয়। মনে পড়ে না।

—তুমি কি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাবো? অঞ্জলি আচমকা জিজ্ঞেস করে।

—ভাবি।

—কেন ভাবো?

তুমি আমায় ওপর বড্ড অন্যায় করেছিলে যে।

—সে তো ঠিকই।

—তাই ভুলতে পারি না। মানুষ ভালবাসার কথা সহজে ভোলে; প্রতিশোধের কথাটা ভুলতে পারে না।

—আমি এত অসহায় যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কিছু নেই তোমার! আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

—কিন্তু আমার তো শোধ নেওয়া হয় নি!

—কি শোধ নেবে বলো?

—কি জানি ভেবেই তো পাচ্ছি না।

—হায় গো, কি কষ্ট!

—খুব কষ্ট। দুপুরে কলেজে একটু ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। তখন তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

—কিরকম দুঃস্বপ্ন?

—ভীষণ খারাপ। বলে মন্দার চুপ ক'রে স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে মনে দেখে। ডহল-ডেবারে পা-দানিতে অঞ্জলি, কোলে বাচ্চা, চারিদিকে আক্রমণকারী মানুষ। কিছুতেই অঞ্জলির কাছে পৌছোতে পরেছে না মন্দার।

—বলবে না? অঞ্জলি বলে।

মন্দার শ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—অঞ্জলি, আমি হয়ত শ্রাবণে বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। তাতে কি তুমি দুঃখ পাবে?

—পাবো। তবে এটা আশা করছিলাম বলে সয়ে নেওয়া যাবে।

—শোন, আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসবো, এরকম বসে থাকবো এ চ দূরে কথা বলবো। কিছু মনে করবে না তো?

—মনে রবো! কী যে বলো! তুমি আসবে ভাবতেই কি ভীষণ ভালো লাগছে!

—আসবো। কী তোমাকে বলতে চাই তা যতদিন না মনে পড়ছে ততদিন আসতেই হবে।

এসো। যখন খুশি।

আসবো। অঞ্জলি, ততদিন তুমি ভাল থেকো, সাব ধানে থেকো।

অঞ্জলি চুপ করে থাকে।

—চারিদিকে বিশ্রী মানুষ-জন, তারা তোমাকে ঠেলবে, ধাক্কাবে, ফেলে দেবে, চারিদিকে বিপদ।

কী বলছো ?

—খুব বিপদ তোমার। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি তুমি বাস থেকে নামতে পারবে ! আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারছি না !

—তুমি কি বলছো ?

—সেইটাই তো বুঝতে পারছি না অঞ্জলি ! একটু সময় লাগবে। তোমার বাচ্চাটা কি ছেলে না মেয়ে ?

—ছেলে।

অকারণ প্রশ্ন। মন্দারের জেনে কোন লাভ নেই। সে বসে রইল। মনে পড়ছে না। কতদিনে মনে পড়বে তার কোন ঠিক নেই।

যতদিন না পড়ে ততদিন বসে থাকা ছাড়া, অপেক্ষা করা ছাড়া, পরস্পরের মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে ?

সমাপ্ত